শ্রীশ্রীললিতা-সখী

(সখী মা)

তৃতীয় সংস্করণ



শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গীতরত্ন বিরচিত

শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম

বরাহনগর, কলকাতা-৭০০০৩৫

শ্রীশ্রীললিতা সখী (সখী মা)

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
গীতরত্ন বিরচিত

প্রকাশক
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ট্রাস্ট
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলকাতা-৩৫

লেখকের ঠিকানা ঃ
মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ—আন্দুলমৌড়ী
জেলা—হাওড়া

প্রকাশকাল ঃ
রাস পূর্ণিমা ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫
ফোন ঃ ০৩৩ ২৫৭৭-০১৩৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র মান্না
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং
১৯ই/এইচ/১৯ গোয়াবাগান স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৬

ভিক্ষা ঃ ১০০.০০

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

সমর্পণ পত্র

পরমারাধ্য

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেব

(বড়বাবাজী মহারাজ)

দেব!

তোমারই অপার করুণায় জয়গোপাল 'সখী ললিতা দাসী' হইয়াছিল। আত্মসুখ-বিবর্জিত ব্রজগোপীর নিষ্কাম সাধনার পথ তুমিই তাহাকে দেখাইয়াছিলে। তুমিই শিখাইয়াছিলে প্রাণীমাত্রকেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রকাশ জ্ঞানে সেবা করিতে। সেই ললিতা সখীর জীবন-কাহিনী গ্রন্থকারে গ্রথিত করিয়া তোমাকেই সমর্পন করিলাম। তোমার ললিতাকে তুমি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাস

দীনেশ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

নিবেদন

জয় নিতাই,

পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীরাধারমণচরণদাস দেবের অপার করুণায় "শ্রীশ্রীললিতা সখী" তৃতীয় সংস্করণ পুনঃ প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থের লেখক পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীললিতা সখী মায়েরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার প্রথম প্রকাশক। তিনি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে প্রথম খণ্ড ও ১৩৬২ বঙ্গাব্দের শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিতে দ্বিতীয় খণ্ড, এইরূপে দুই খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

বর্তমান উক্ত খণ্ডদ্বয় সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় ভক্তসমাজে ইহার নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং অনেকেই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও এতদিন সফল মনোরথ হইতে পারি নাই। কারণ, ইচ্ছা থাকিলেও সকল কাজ সকল সময় হইয়া উঠে না। পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা ও ভক্তগণের অধীর আগ্রহের ফলে গ্রন্থটি পুনঃ প্রকাশিত হইলেন। এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই, ভৃত্যবৎ প্রচেষ্টা মাত্র।

পাঠকগণের সুবিধার্থে পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থের খন্ডদ্বয়কে একত্র সংযোজন করিয়া একখণ্ড করা হইয়াছে এবং গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য উক্ত খণ্ডদ্বয়ে লেখকের নিবেদিত গ্রন্থের বিষয়ীভূতে প্রবন্ধাদির প্রার্থনা মূলক কিছু কিছু বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনাদিকার্য্যে অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদের ভুলত্রুটি যাহা পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা তাঁহারা নিজগুণে ক্ষমা পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন—এই প্রার্থনা।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী
প্রকাশক পক্ষে
দীন-মাধবানন্দ দাস

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালো বিজয়তে

ভূমিকা

মাননীয় গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে,পূজ্যপাত শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহারাজ এই সর্ব্বথা অযোগ্য জনকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ মনে করেন যে, এই কাঙ্গাল জন শ্রীসখীজীর অনেক অন্তরঙ্গ সংবাদ রাখে। মনে পড়ে, পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক জননীর ক্রোড়ে সমাজবাড়ীতে যাইত। জানিনা, কিসের আকর্ষণে স্নেহসিক্ত জননীর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া সে দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ ব্রজমায়ীদের মত কাপড় পরা এক মহিলার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িত। সেই মহিলাও ঐ বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শত শত চুম্বনে তাহার ছোট মুখখানি ভরিয়া দিতেন। স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়া ঠাকুরকে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ লাগাইয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ লইয়া সেই বালকের মুখে তুলিয়া দিতেন। বালক তাহার ক্ষুদ্র বাহুতে সখীজীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"আপনি আমার কে?" সখীজী সহাস্যবদনে উত্তর দিতেন—"গৌরগোপাল! আমি তোমার দিদি হই, আমাকে তুমি 'দিদি' বলেই ডেকো।" এই সব ঘটনা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি। সেই স্নেহের স্পন্দন বুকের যে তন্ত্রীতে বাজিতেছে, সেখানে ভাষা পৌঁছায় না। সখীজী চিদ্‌রাজ্যের অভিমানমঞ্চে একইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বালকের কৈশোর যৌবনাদির অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। স্কুল ছাড়িয়া সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশ, সংস্কৃত অধ্যয়ন প্রভৃতি শ্রীল গোবর্দ্ধন দাস বাবাজী মহারাজের প্রমুখাৎ সমস্ত খোঁজ খবরই রাখিতেন। তারপর কোন এক অজ্ঞাত শুভলগ্নে বৃন্দারণ্যবাসী ভাগবত পরমহংস শ্রীগুরু বিষ্ণুপাদপদ্মের দর্শন লাভ এবং বৈষ্ণবদর্শন অধ্যাপনার ছলে নিরন্তর সান্নিধ্যদান। এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই শ্রীমতী সখীজীর শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিতাম। ভক্তিশাস্ত্রের সমুজ্জ্বলে পংক্তিসকল সখীজীর ভিতরে দেদীপ্যমান দেখিতাম। আগে শাস্ত্র জানিতাম না, তথাপিও অনুভূত মহনীয়তম সখীজীর কৃপাকর্ষণ অনুভব করিতাম। শ্রীগুরুকৃপালাভের পর শ্রীমতী সখীজীকে নূতন করিয়া দেখিলাম। শ্রীগুরুনিষ্ঠার জ্বলন্ত বিগ্রহ এমন দ্বিতীয়টি আজ পর্য্যন্ত আর আমার নয়নে পড়ে নাই। 'জয়গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিতে দুই চক্ষু, অরুণবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে সুশোভিত হইত।

সর্ব্বপ্রথম কথা—সখীজীর শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে যে জাতীয় বেশ প্রদান

করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রসম্মত কি না? কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে বিষয়ের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। থাকিলেও তিনি প্রকটাবস্থায় শত শত জনের এইভাবের কৌতুক মিশ্রিত প্রশ্নের উত্তরে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাই আমি এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। আমি একদিন তাঁহার কোলের কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"দিদি! আপনি এইরকম বেশ গ্রহণ করিয়াছেন কেন?" উত্তরে মৃদু, হাসিয়া বলিয়াছিলেন— "তুমি পণ্ডিত হয়েও এই প্রশ্ন করলে? তবে শোন কিছু বলি। আচার্য্য দুই প্রকার— সন্নিহিত আচার্য্য ও অসন্নিহিত আচার্য্য। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি আচার্যগণ অসন্নিহিত আচার্য্যগণ। শ্রীগুরুদেবই সন্নিহিত আচার্য্য। এই সন্নিহিত আচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদের আত্মসমর্পণ করলে সাধকব্যক্তি কৃতকৃতার্থ হয়। সাধকের ব্যক্তিগত জীবন শ্রীগুরুদেবই নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকেন। শ্রীগুরুদের বৈধ আদেশ করলেন কি অবৈধ আদেশ করলেন, তা আশ্রিত শিষ্যের বিচারের অতীত। দীক্ষার তাৎপর্য্য শুধু মন্ত্রলাভ নয়। কারণ, মন্ত্র যেকোন স্থান হতেই লাভ করা যেতে পারে। দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ। নির্হেতু কৃপাকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ হলে সাধকব্যক্তির সর্ব্ব-দুর্ভাগ্য নাশ হয়ে সর্ব্ব-সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাঁর যাতে সুখ, তাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে আমাকে শাড়ী পরাতে, তাই আমি শাড়ী পরেছি। যদি তাঁর ইচ্ছা হত আমাকে উলঙ্গ রাখতে, আমি তাতেও কোনরূপে আপত্তি করতাম না।

পরবর্ত্তিকালে যখন ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করা হয়, তখন দেখা যায় যে, শ্রীল কবি কর্ণপুর গোস্বামী কৃত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্প্' গ্রন্থে মাধব-মহোৎসব-লীলার শ্রীবৃন্দাবদেবী-আবির্ভাবিত ত্রিভুবনের সঙ্গীতাচার্য্যা গন্ধর্ব্ব-রাজকন্যা শ্রীমাতঙ্গীদেবী সপর্ষদে আগমন করিয়াছিলেন। মাতঙ্গী দেবীর সঙ্গে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনী, সপ্ত স্বরাদি সকলেই আসিয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে তাঁহার পাদপীঠের নিকটে বসন্তরাগ উপবেশন করেন। কোন একসময়ে শ্রীবৃন্দাদেবী অনুরোধ করিয়াছিলেন, "হে বৃষভানু-দুলালি! নিজ পাদপীঠ সমীপে উপবিষ্ট বসন্তরাগের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। আপনি কোন পুরুষের মুখদর্শন করেন না বলিয়া তাহাকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া আনাইয়াছি।' এই কথা শুনিয়া শ্রীবৃষভানু-রাজকুমারী চরণোপান্তে উপবিষ্ট বসন্তরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাগরাজ বসন্ত পরমানন্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ইহাতে কবি কর্ণপুরপাদ প্রসঙ্গক্রমে দেখাইলেন যে, শ্রীরাধারাণী অন্য পুরুষ দেহধারীর মুখদর্শন করেন না। যদি কোন প্রয়োজন বশতঃ কোন পুরুষকে

তাঁহার সম্মুখে লইতে হয়, তবে তাহাকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়াই লইতে হইবে। পূজ্যপাদ বড় বাবাজী মহারাজ সখীজীকে বাহ্যতঃ যে বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক রাগানুগীয় সাধকের অন্তররূপে বাহ্যাভিব্যক্তি। সাধকের বাহ্য ও আন্তর দুই সাধন বিদ্যমান থাকে। বাহ্যদেহাবেশে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ যাজন করেন এবং আন্তরদেহাবেশে নিজেকে গোপকিশোরী ধ্যান করিয়া মানসে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের প্রিয় সেবা করিয়া থাকেন। সখীজীর শ্রীগুরুদেব সখীজীর বৈধীমূলক সাধকোচিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিয়া সিদ্ধোচিত বেশভূষা ও অভিমান দিয়াছিলেন। ইহা অপূর্ব্ব হইলেও অবৈধ নহে। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—"পুরাণে শ্রুয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্।" পদ্মপরাণে শুনা যায়—পুরুষেরও এই রাগানুগা ভক্তি হয়। শ্লোকাংশে 'অপি' শব্দের অর্থের তাৎপর্য্যে বুঝা যায়—স্ত্রীজাতিরই এই ভক্তিতে মুখ্যাধিকার। স্ত্রী বা পুরুষের অভিমানই তজ্জাতীয়ত্বের কারণ। শ্রীল বড়বাবাজী মহারাজ সখীজীর পুরুষ অভিমানকে কায়বাক্যমন হইতে নির্বাসিত করিয়া অপাকৃত নারী অভিমান দান করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—বাহ্যতঃ গোপকিশোরী স্বরূপে অঙ্গীকার করিলে সেই প্রকার বাহ্যতঃ ব্রজযুগল শ্রীরাধারমণের অবস্থিতি থাকা চাই। তাহা না হইলে উক্ত বেশ সেবাহীন হইয়া পড়ে। আমার এই হতভাগ্য জীবনে যে দুই একদিন তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি—শ্রীমন্দিরে সেবিত রাধারমণে তাঁহার সাক্ষাৎবুদ্ধি দেদীপ্যমান। শ্রীধাম নবদ্বীপের সমাজবাড়ীকে শ্রীবৃন্দাবনের অনঙ্গমঞ্জরী দেবীর কুঞ্জ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। এবং তিনি নিজেকে সেই কুঞ্জের একজন সেবিকা বলিয়াই অভিমান করিতেন।

সমাজবাড়ীর প্রতি তরুলতাকে কল্পলতা বলিয়া তিনি ধারণা করিতেন। কোন তরু, বা লতা উপমর্দ্দিত বা ছিন্ন হইলে সখীজীর দুঃখের অন্ত থাকিত না। নয়নের জলে বুকে ভাসিয়া যাইত। ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেন "জয় রাধারমণ, জয় রাধারমণ"। উক্ত মঠের প্রতিটি ধূলিকণাও সখীজীর প্রাণপ্রিয় ছিল।

অনেক সময় কথা-প্রসঙ্গে বলিতাম—"দিদি! দীনেশ দাদার সঙ্গে মেদিনীপুর ইত্যাদি কোন স্থানে গিয়াছিলাম কিংবা তিনুর সঙ্গে ট্রামে দেখা হইয়াছিল, সে বড় অশান্তিতে আছে" ইত্যাদি। এই সকল কথা শ্রবণে তাঁহার কোনপ্রকার আগ্রহ বা উল্লাস কখনও দেখি নাই। প্রায়শঃ কোন কথাই বলিতেন না। বলিলেও বলিতেন— "তাঁরা ব্রাহ্মণ, গুরু, গোঁসাই লোক, এই গোয়ালিনীকেও একটু-আধটু কৃপা ক'রে থাকেন।' এই প্রকার ভাবা শুনিয়া বুঝিতাম—দিদি আমাকে ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেন যে, প্রাকৃত সংসারকে একেবারে না ভুলিলে অপ্রাকৃত জগতে

প্রবেশ হয় না। বৈশেষিকগণ বলেন — "পূর্বসিদ্ধের ত্যাগ ব্যতীত আগন্তুকের গ্রহণ অসম্ভব।" শ্রীগুরুদেব তাঁহার পরম-দাতৃত্বগুণে গৌর-গোবিন্দ-প্রেমমণি দিতে গেলেও মাদৃশজন পূর্বসিদ্ধ প্রাকৃত বিষয়াসক্তি জাগাইয়া রাখিয়াই অপ্রাকৃত প্রেমধনে ধনী হইতে বাসনা করে। ফলে শ্রীগুরুদেব সিদ্ধই হউন আর সাধকই হউন, তাঁহার কৃপাশক্তি আমাতে প্রবেশ করিতে পারে না।

এখন আর একটি আলোচ্য বিষয় হইতেছে—শ্রীমতী সখীজী কেন বহু দেবদেবীর অর্চনা করিতেন? সাধারণ জনগণ এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে না। আমি একদিন সাক্ষাৎ শ্রীসখীজীকে 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র পংক্তি উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলাম—'দিদি! 'না পূজিব দেবী দেবা, এই ভক্তি পরম কারণ' এই পয়ারটি একবার ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।" তিনি মৃদু হাসিয়া আমার চাতুর্য্য যে বুঝিয়াছেন তাহারই ইঙ্গিত করিলেন। তারপর বলিলেন— "সাধকব্যক্তি সর্ব্বদা মনে রাখবে যে, একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই সর্ব্বদেবতার সেবা করা হয়। তারপর কথা স্বতন্ত্র।" নিজের শাড়ী দেখাইয়া বলিলেন—"আমাকে শ্রীগুরুদেব এজগতে রেখেই সে জগতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোয়ালারা আপনাদের অত শাস্ত্রটাস্ত্র বোঝে না। নন্দদুলাল তাঁদের প্রাণের প্রাণ, ভগবান নয়। তাই নন্দদুলালের মঙ্গলের জন্য তাঁরা সর্ব্বদেবতারই আরাধনা ক'রে থাকেন। দেখাই তো যাচ্ছে যে, বাবা নন্দ শ্রীনারায়ণের বিগ্রহের সেবক, অম্বিকাবনের শিবের উপাসক। মা যশোদা নিজ পুত্রের বনগমন সময় পূজিত হরপার্ব্বতীর নিৰ্ম্মাল্য জবা ও বিল্বদল পুত্রের হাতে বেঁধে দিচ্ছেন। শ্রীরাধারাণীর সূর্য্যপূজা, শ্রীচন্দ্রাবলীর চণ্ডীকার আরাধনা, অধিক কথা কি কাত্যায়নীব্রতপরা অগণিত ব্রজবালিকাই ইহার সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

গোপগোপীগণের এই সকল দেব আরাধনা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরই বাহ্যাভিব্যক্তি। এই দেব আরাধনার বলে তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় নাই, তাঁহাদের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপক।

সখীজীর সেবার পরিপাটি বিশ্ববিদিত। গৃহনির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন পর্যন্ত সমস্ত সেবা তাঁহাকে স্বহস্তে করিতে দেখিয়াছি। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে পুষ্পচয়ন মানসে সমাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতাম। প্রায়শই দেখিতাম শ্রীমতী সখীজী শ্রীগুরুপ্রণাম করিতেছেন আর বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছেন। একদিন দেখিলাম মঠের নির্ম্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচশতাধিক জমায়েত সাধু, ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। সখীজী শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন। প্রণামের শেষে ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে নিজ গুরুদেবকে বলিতেছেন,

"সাধু তো নিয়ে এলেন, কিন্তু সেবার উপকরণ কোথায়? আমার হাতে মাত্র সাততি টাকা আছে। যা হয় ব্যবস্থা করুন। আমি তো আর শাড়ী পরে টাকা উপায় করতে যেতে পারি না!" চাহিয়া দেখিলাম, দুই চোখের জলে সখীজীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "দেখছ ব্যাপার, যাঁর মঠ তাঁকে জানিয়ে দিলুম। এখন চল ঐ ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসি।' প্রায় দশ মিনিট পরে দেখিলাম—চারজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক আসিয়া সখীজীকে বলিলেন, "মাইজী! আমরা ভজন আশ্রম থেকে শুনলাম বহু সাধু এখানে এসেছেন, তাই আমরা ছুটে এলাম একটু সাধুসেবা করবার মানসে। আপনি যদি কৃপা ক'রে গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হই। এই টাকা কয়টা এনেছি, গ্রহণ করতে মর্জি হোক্। ঘি, আটা আনাজপত্র গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাদের নিজ সন্তান জ্ঞানে অসঙ্কোচে আদেশ করবেন। এদিকে সখীজী করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন আর মুখে 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলিতেছেন। নয়নের জলে যেন বান ডাকিয়াছে। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! ঐ মন্দিরে এক মহাত্মা বসে আছেন, তাঁরই এই মঠ। টাকা দিতে হলে তাঁকেই দেওয়া হোক্। আমি সামান্য দাসী মাত্র। ঝি-চাকরের হাতে কি টাকা দিতে আছে?" ভদ্রলোকগণ কোথায় কোন্ মন্দির ভাল বুঝিতে না পারায় আমিই সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের লইয়া গেলাম বড় বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দিরে। দেখিলাম একগোছা নোট্ মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা বড় বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তারপর আমাকে মঠের লোক মনে করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমরা যাচ্ছি, অন্যান্য জিনিস শীগ্গীরই গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দেব।" আমি নোটগুলি লইয়া দিদির কাছে গেলাম। এবং গণনা করিয়া দেখিলাম পাঁচ হাজার টাকা। দিদি একইভাবে বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম—"উঠুন, টাকাগুলি বাক্সে রাখুন।" আমাকে চাবিটা ফেলিয়া দিয়া দিদি বলিলেন—"ঐ সাতটা টাকাও এর মধ্যে মিশিয়ে রেখো। কারণ, কর্তার আদেশ আছে, কেউ বৈষ্ণবসেবা দিলে সেই টাকার মধ্যে নিজের কিছু মিশিয়ে দেবে। পরিপূর্ণের সেবা করতে তোমার যোগত্য নেই, তবু, যেটুকু সেবায় লাগে। তাই যতটুকু বৈষ্ণবসেবায় লাগে তার সুযোগ ত্যাগ ক'র না।"

সর্ব্বোপরি শ্রীমতী সখীজীর অলঙ্কার শাস্ত্র ও লীলাগ্রন্থের জ্ঞান অপরিসীম। বহুদিন তাঁহার কাছে বসিয়া লীলাগ্রন্থ আস্বাদনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। শব্দের মুখ্যা-গৌণী ভেদে প্রধান বৃত্তি থাকিলেও রস ব্যাঞ্জনাবৃত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি ধারণ করা খুবই কঠিন। অপরিসীম মেধাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিছাড়া

বিশেষতঃ পারমার্থিকশাস্ত্রে প্রবল শ্রীগুরুপাদপদ্ম-করুণা ছাড়া অন্যের পক্ষে ব্যঞ্জনা ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন করিলে রান্না করিতে করিতে যা পূজার ফল আমানি করিতে করিতেই সখীজী আমাকে শত শত ব্যঞ্জনাবৃত্তি দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তি সাধারণ ভক্তগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন কিনা আমি জানি না। আমার শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা নাকি শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের কৃপা-প্রসূতো।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের ধারণা আমি সখীজীর অন্তর সঙ্গী। ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। বহুদিন লোক পাঠাইয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে ডাকিয়া আনাইয়া তিনি তাঁহার প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীশ্রীরাধারমণের লীলাকথা এই গৃহমেধীজনকে শুনাইয়াছেন। পাঠকগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, লীলাকথা আলোচনার ব্যাকুলতা কিরূপে প্রবল হইলে তাদৃশ মহাপুরুষ মাদৃশজনকে স্মরণ করিতে পারেন। কৃপা কাহাকে বলে তাহা দেখিয়াছি এবং কিছু কিছু, অনুভবও করিয়াছি, কিন্তু অনাদি দুৰ্দ্দৈব বশে প্রাকৃত বিষয়বিষ পান করিয়া নিজের চপল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার দ্বারা সব হারাইয়া ফেলিয়াছি। আজ শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপার গন্ধমাত্রও আর আমাতে নাই।

গ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য্য মহাশয় শ্রীসখীজীর পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠভ্রাতা। তিনি এই গ্রন্থে শ্রীসখীজীর পূর্ব্বাপর জীবনের লীলা-কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। কোন মহাপুরুষের চরিত্র সমালোচনার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা অপরাধ; ইহা নিজের সুদীর্ঘ সংসারপথের পাথেয়রূপে গ্রহণ করাই শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্ত সদাচার। আমি আশা করি এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীসখীজীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি বলিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। তারপর ভূমিকা লিখিতে বসিয়া গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গেলে ভূমিকার কলেবর সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণ স্মরণ করিয়া এইখানেই প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

গুরুগৌবরানন্দ স্বামী

শ্রীশ্রীললিতা সখী সম্বন্ধে দু'টি কথা

মাতৃসাধক ভক্তকবি শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"মন তুমি কৃষি কাজ জান না। এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফ'লত সোনা। যাঁরা আবাদ করিতে জানেন, তাঁহারা মানবজমিতে সত্য সত্যই সোনা ফলাইতে পারেন। কেমন করিয়া সোনা ফলাইতে হয় ভক্তকবি তাহাও জীবজগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন—গুরুদত্ত বীজ রোপন ক'রে ভক্তিবারি তায় সেচনা।"

যাঁহার জীবনকাহিনী এই গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে, আমাদের সেই 'গোপালকৃষ্ণ' দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। মনুষ্যজন্ম যে অর্থদ, তাহা তিনি আপন জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্যসত্যই গুরুদত্ত বীজ রোপণ করিয়া ভক্তিবারি সিঞ্চনের দ্বারা মানব-জমিতে সোনা ফলাইয়াছিলেন। গোপালকৃষ্ণের গোপীভাবসিদ্ধি, শুধু ভাবসিদ্ধি নহে, শ্রীগুরুকৃপার ভজনপ্রভাবে প্রাকৃত দেহের অনু-পরমাণু শোধন করিয়া অপ্রাকৃত গোপীদেহও লাভ করিয়াছিলেন।

ভজনপ্রভাবে যে প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হইতে পারে, মহাজনানুভবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে উল্লেখ আছে—তীব্র সাধনপ্রভাবে দেহের অনু-পরমাণু, সংশোধিত হইয়া সাধকদেহ সিদ্ধরূপে পরিণত হয়। ভাবই দেহ ও মনের সংগঠনকারক। অন্তরে শুদ্ধভাবের আবির্ভাব হইলে দেহও তদনুরূপে সংগঠিত হয়। গোপালকৃষ্ণ মহাশক্তিশালী শ্রীগুরুদেবের কৃপায় গোপীভাবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তদনুরূপ স্বরূপও লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাহার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা জানেন যে, চলন-বলন, বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার সকল দিক দিয়াই গোপালকৃষ্ণ সত্যিকারের ললিতাদাসী হইয়াছিলেন। কোনদিন যে তাঁহার পুরুষদেহ ছিল তাহা তাঁহার স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছিল। তাঁহার হাব-ভাব চলন-বলন যে সম্পূর্ণ স্ত্রীজনোচিত, তাহা দর্শকমাত্রেরই উপলব্ধি হইত। অনেক স্ত্রীলোক স্পষ্টই বলিতেন—"পুরুষলোক স্ত্রীলোকের বেশে সাজিয়া থাকিলেও আমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারি। কারণ, পরে সান্নিধ্যে আমাদের স্ত্রীজাতির

স্বাভাবিক যে সঙ্কোচ, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহার নিকটে আমাদের মনে আদৌ কোনরূপে সঙ্কোচভাব আসে না। ইনি যে আমাদেরই মত একজন স্ত্রীলোক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাতে আছে—"কবে যাব ব্রজপুরে, আহেরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব। যাবটে আমার কবে, এ পাণি গ্রহণ হবে, সখীমাঝে বসতি করিব।।" কালিন্দির কূলে কেলি কদম্বের বন। রতনবেদীর উপর বসার দুজন।। দুঁহু অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর চুলাব করে হেরি মুখচন্দ্র।।" 'গুরুরূপা সখী বামে, ললিত ত্রিভঙ্গঠামে, চামরের বাতাস করিব।' ইত্যাদি—

ইহাই বৈষ্ণবীয় সাধনার চরম সাধ্য। সাধক শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন এবং স্মরণ মননে গোপীভাব সাধন করিয়া ভাবসিদ্ধি হইলে জন্মান্তরে সেবাযোগ্য দেহ লাভ করে, ইহাই সাধারণ রীতি। কিন্তু মহাশক্তিধর শ্রীগরুদেবের কৃপায় ইহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। যথাবস্থিত প্রাকৃত সাধকদেহ যে সিদ্ধস্বরূপে পরিণত হইতে পারে, ইহারই অনন্য সাধারণ নিদর্শন আমাদের এই 'সখী ললিতাদাসী'। শ্রীল ধ্রুব মহারাজের যথাবস্থিত দেহে ধ্রুবলোকে গমন প্রসঙ্গও ইহার পরিপোষক।

অন্তরে গোপীভাবের প্রবলতায় সেই ভাবের অনুরূপে দেহের বেশভূষার পরিবর্তন হয়। মহাজনগণ যে তদ্ভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, চৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীল দাস গদাধরের আচরণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোপীভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময়।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকেন কে কিনিবে গো-রস।।
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে।।

এইসকল প্রমাণের দ্বারা আমাদের গোপালকৃষ্ণের শ্রীগুরুকৃপালব্ধ গোপী ভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি মহাজনানুমোদিত, ইহাই সূচিত হইতেছে।

শ্রীগুরুকৃপায় গোপালকৃষ্ণ গোপীভাবে ললিতাদাসী হইয়া যে সকল অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আচরণ করিয়াছেন, সৌভাগ্যবশে তাহার কিছু, কিছু, দর্শন করিবার

সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। শ্রীরাসলীলা, শ্রীঝুলনলীলা, শ্রীহোলীলীলা প্রভৃতি কীর্ত্তনকালে তাঁহার সুমুধুর পদ-পদাবলী সহ সময়োচিত ভাবানুযায়ী নৃত্যরঙ্গ দর্শন করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীব্রজলীলার প্রত্যক্ষানুভূতি দর্শকগণের চিত্তে চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার সেই সকল যাজন এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবার আদর্শ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইলে জীবজগতের অশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়াই আমার মনে হয়।

এই গ্রন্থের লেখক বা সংগ্রাহক গোপালকৃষ্ণের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বাল্যকালে তাঁহার সঙ্গ পাইয়া যথেষ্ট কৃপা লাভ করিয়াছেন। তারপর গোপালকৃষ্ণের জন্ম হইতে গৃহত্যাগ ও সখীবেশ ধারণাদি পূর্ব্বাপর জীবন-কাহিনী এরূপ নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া রাখা যায় না। পাছে সত্যের অপলাপ হয়, সেইজন্য তিনি অতি সন্তর্পণে লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ যৎসামান্য যাহা জীবনী হিসাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা পাঠ করিয়া তাহা যে অতিশয় ভ্রমপূর্ণ' তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বৃদ্ধবয়সে শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার দুর্ব্বিপাকের মধ্যেও ইনি এমন পূত জীবনচরিত পাঠের সুযোগ করিয়া দিয়া পথভ্রান্ত পথিককে সৎপথের সন্ধানদানে ধন্য করিয়াছেন। এরূপ সৎগ্রন্থের প্রচার জনসমাজে যত বেশী হইবে ততই জগতের কল্যাণ হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী

লেখকের বক্তব্য

যে কোন জীবনালেখ্য বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার অলৌকিক ঘটনাবলীপূর্ণ কোন পূত মহান চরিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত করা যে খুব দুরুহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বোধ হয় কেহ দ্বিমত পোষণ করেন না। তাহার উপর যদি আলোচ্য ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়া যায় অথবা কোন প্রামাণ্য বিবরণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো কথা নাই। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া চরিত্র আলোচনা করিলে বহু ক্ষেত্রেই কিছু কিছু, অসামঞ্জস্য সাধারণতঃ থাকিয়াই যায়। তখন প্রবীণ সমালোচকের দৃষ্টিতে ঐ সকল অসামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা সত্য-সত্যই একটি অতি দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

এক্ষেত্রে যদিও আমি বর্তমান আলোচ্য চরিত্রের সমগ্র ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নই, তথাপি আমি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া পরিচয় দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহারই ফলে সংসার-আশ্রমের কিয়দ্দিনের ও তৎপরবর্তী জীবনের কিছু কিছু, ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তবে কোনদিন একথা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাকেই একদিন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিল; শেষে আমাকেই লেখনী ধারণ করিতে হইল। আমি তো ভালভাবেই জানি যে, এইরূপ একটি সাধক-চরিত্র যথাযথরূপে অঙ্কিত করার কোনরূপ যোগ্যতাই আমার নাই। তবুও কেন এ প্রচেষ্টা, তাহাই বলিতেছি।

'ভক্তি' মাসিক পত্রিকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে হইত। কিন্তু বাংলা ১৩৩৯ সাল হইতে 'ভক্তি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কেবলমাত্র বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট দুই-একখানা পত্র লেখা ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য আমার লেখনী ধারণ করিবার আবশ্যক হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অশান্তি, বিশেষতঃ দৃষ্টিশক্তির গোলযোগের জন্য আর কিছু লিখিব না, ইহাই ছিল আমার সঙ্কল্প। কিন্তু ললিতা সখীর নিত্যলীলা-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অপ্রীতিকর ও অত্যদ্ভুত কাহিনী প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় আমাদেরই

কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধু বহু, নিষেধ সত্ত্বে কতকগুলি অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রমপূর্ণ উদ্ভট কাহিনী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত গুজব শ্রবণে ও প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে সন্দিগ্ধ হইয়া বিভিন্ন মহল হইতে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার নিকট আসিতে থাকে, আমি তাতে বিব্রত হইয়া পড়ি। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা সম্ভব বা উচিৎ কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় পূজনীয় শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয় আমাকে সখীজীর সঠিক জীবনী প্রকাশের আদেশ করিলেন। আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আমি মহা চিন্তায় পড়িলাম। নানাভাবে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়াও যখন নিষ্কৃতি পাইলাম না, তখন ভাবিলাম এতবড় গুরুদায়িত্ব আমার অক্ষম স্কন্ধে স্থাপন করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। শেষে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম, আমার বিষয়দুষ্ট চঞ্চল মনকে শান্ত করার জন্য এই মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানেরই মঙ্গল ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে বন্ধুগণের প্রদত্ত এই গুরুদায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়, তাঁহার কৃপা হইলে আমার বাসনাও অপূর্ণ থাকিবে না।

মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনা সমূহ ঘটিতে থাকে। কিন্তু জাতকের অলৌকিকত্ব সে সময় সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না; ফলে মহাপুরুষদিগের শেষ-জীবনের কার্য্যাবলী দর্শনেই সাধারণতঃ মানুষের মনে তাঁহাদিগের গত জীবনের অতীত কাহিনী অবগত হইবার কৌতূহল জাগে এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। সে আলোচনাও আবার এই ভাবের নহে। বিভিন্ন ভাবের লোক বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনের সঠিক ঘটনাবলী প্রকাশ করা সহজ বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কেন এ দূরহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম তাহার কারণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তাহা ছাড়া সখীজী যতদিন পূর্ব্বাশ্রমে ছিলেন, তন্মধ্যে যে কায়টা দিন তাঁহার মধুময় সঙ্গলাভের সংযোগ ও সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিটুকু গ্রন্থাকারে রাখিয়া দিতে আগ্রহ হওয়া আমার পক্ষে অস্বাভাবিক তো নয়ই বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং লোভনীয়। তাই সংযোগ যখন মিলিল, তখন নিজ প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সহিত তাঁহার মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, কাকা-কাকিমা প্রভৃতি ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে এবং তাঁহার সহাধ্যায়ী দুই-চার জন বিশিষ্ট বন্ধু নিকট যাহা শুনিয়াছি ও তাঁহাদের রোজনামচায় পাইয়াছি, তাহাই আমি সাধ্যমত সাজাইয়া প্রকাশ করিলাম। তথাপি

অনেক ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়া গেল।

যে মহাপুরুষের পবিত্র চরিত-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি মাত্র তেইশ বৎসর সংসারাশ্রমে ছিলেন। ইহার মধ্যে বাল্যকাল বাদ দিয়া যে কয় বৎসর থাকে, তাহার মধ্যেই বিদ্যাভ্যাসাদির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার যৌগিক প্রক্রিয়া এবং শারীরিক শক্তিচর্চা ও নিয়ম-নিষ্ঠাদির সহিত ধর্ম্মালোচনা দ্বারা দেশের ও দশের জন্য যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য-সতাই অপরিমেয়। বাল্যক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভূত কার্যাবলী দর্শন করিয়া আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেন, "এ কে ?" অনেকে বলিতেনও "নিশ্চয় কোন দৈবশক্তি ইহার ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে।" মাতা-পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয় জনগণ অনেক সময় এজন্য যোগ্য লোকের সহিত আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনধারার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইয়া কেমন যেন আত্মবিস্মৃত অবস্থায় তাঁহার কোন কার্যে বাধা না দিয়া সহানভূতিই দেখাইয়াছেন। বাল্যসঙ্গী ও যৌবনের সঙ্গীগণ ইহার সংসারাশ্রম ত্যাগের সংবাদে মর্ম্মাহিত হইয়াছিলেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, "গোপালের ন্যায় শক্তিশালী, নিরহঙ্কার, সদাচারী, নিরবকর্ম্মী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহার সঙ্গ পাইয়া ধন্য হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষেই গোপালের প্রতিটি কার্য্যের জন্য তাহার নিকট আমরা ঋণী; একথা অস্বীকার করিলে আমাদিগকে অকৃজ্ঞতাদোষদুষ্ট হইতে হইবে।"

গোপাল প্রথমে শক্তিমন্ত্র সাধনা করিয়াছিলেন—একথা গ্রন্থমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারকার্য্যে বা নিজ আচরণের মধ্যে কোথাও অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়া কিছু করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাই নাই। গ্রন্থমধ্যে উপদেশাদি বা আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারারই পরিচয় বিশেষ লক্ষিত হয়। সংসার ত্যাগের পর তিনি যেভাবে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হন এবং বেশাদি পরিবর্তন করিয়া সখীজীবন যাপন করেন, তাহা যথাযথস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বাশ্রমে থাকাকালীন কথাবার্ত্তা বা বক্তৃতাদি যাহা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন পদ বা শ্লোকের কিয়দংশ উল্লেখ ছিল। আমি রসপুষ্টিমানসে মূলগ্রন্থ হইতে তাহার অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। অনেক স্থলে নকলের গোলযোগে ভাষারও কিছু কিছু অপূর্ণতা ছিল। মূল বক্তব্য বজায় রাখিয়া ভাবের কোনরূপে পরিবর্তন না করিয়া সেগুলিও পূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশাকরি পাঠকগণ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

একটি কথা এখানে পাঠকগণকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। কারণ,

এই বিষয় লইয়া কয়েক স্থানে বিশেষ অপ্রিয় আলোচনা শুনিয়াছি। "ললিতা সখীর পুর্ব্বাশ্রম-কাহিনী" শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন। যে, ললিতা সখী একেবারে সখী হইয়াই জগতে প্রকট হইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে সাধারণ মানুষের মতই তিনি আদরের দুলালরূপে দেখা দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুকৃপায় নিজ কঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারাই পরবর্তীকালে সখীবেশ লাভ করিয়া 'ললিতা সখী' এই নামে পরিচিত হন। বেশধারণের সহিত কুল মান বিদ্যা এমন কি পুরুষোচিত সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে শ্রীগুরু সেবার এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন। তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত সেই আদর্শের ধারা অনুসরণ করিয়া এখনও চতুর্দ্দিকে প্রেম-নামপ্রচারের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে মনে হয় তাঁহার পবিত্র আদর্শ সত্য-সত্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সখীবেশ ধারণের পর সংগৃহীত ঘটনাবলীর সহিত দিদির স্বহস্তলিখিত লীলা-তত্ত্বাদিপূর্ণ পত্রের অপূর্ব উপদেশাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হইল এবং গ্রন্থশেষে দিদির জন্মপত্রিকা ও বংশতালিকা দেওয়া হইল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে কেহ তাঁহার সংগৃহীত ঘটনা দিয়া কেহ তাঁহার সমস্ত রক্ষিত রোজ নামচা হইতে বক্তৃতাদির অংশবিশেষ প্রদান করিয়া, কেহ মৌখিক উপদেশ দিয়া, আবার কেহ বা কোথায় কি পাওয়া যাইবে তাহার সন্ধান দিয়া নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সকলের নিকটই সেইজন্য কৃতজ্ঞ। সর্ব্বমঙ্গলাধার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের উপর কৃপামৃত বর্ষণ করুন—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট আমার করজোরে বিনীত নিবেদন—আমার বর্ণনার ভঙ্গী বা ভাষার দোষে যদি কেহ কোনরূপে মনে ব্যথা পান, তজ্জন্য আমাকেই দোষী করিবেন। আমার বর্ণিত মহাত্মার উপর কোনরূপ কটাক্ষ না করিয়া আমারই অযোগ্যতা জানিবেন। অলমিতি।

মাসিলা 'ভক্তি-নিকেতন'
পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া
১৩৫৯ সাল বৈশাখ।

বিনীত নিবেদক
শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-দাসানুদাস
দীনেশচন্দ্র শর্ম্মা

বিষয় সূচী

—::—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

শ্রীশ্রীললিতা সখী

মঙ্গলাচরণম

বন্দে বৃন্দাবনগুরুং কৃষ্ণং কমললোচনম।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং বনমালাবিরাজিতম্।।
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মমমন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।

অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাসমূহে বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সময় সময় ভবিষ্যতের কিছু কিছু আভাস তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় অন্যান্য বহু ঘটনার মধ্যে এমন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহা সতত সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণদেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে কিংবা দৃষ্টিগোচর হইলেও চিত্তে কোনরূপে গুরুত্বের ছাপ দিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। এই ভাবেরই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বাংলা ১২৮০ সালের ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। সেদিন ছিল শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা। এর ঘটনাটির ফল পরবর্তীকালে যাঁহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই অশেষ প্রকারে সেই শুভদিনের শুভক্ষণটির গুণকীর্ত্তন করিতে যাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৌরনদী থানার অধীন হরিসেনা নামক গ্রামে একটি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় পাশ্চত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহার নাম ছিল কালিকান্ত ভট্টাচার্য্য। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুঁড়েঘরেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত শুভদিনে শুভক্ষণে ঘটনাটির সূত্রপাত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃতই একজন নিষ্ঠাবান, ভগবদ্বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। শত বাধা-বিঘ্নেও ইঁনি আপন কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হন নাই। জাতিবিরোধ, দারিদ্রের কঠোর পীড়ন, পারিবারিক ও শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে সময় সময় তাঁহাকে অনেক বিপদের মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি কোনরূপে চঞ্চল না হইয়া আপন ইস্টদেবকে স্মরণ করিয়া হাসিমুখেই সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

পিতামাতার বিশেষ আগ্রহে অল্পবয়সেই ফরিদপুরে জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে সাড়ে আটআনি-র আনন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা গৌরসুন্দরী দেবীর সহিত উক্ত কালিকান্ত ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হয়। ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সাংসারিক অবস্থা তৎকালে খুব সচ্ছল ছিল না, তাই বিবাহে বিশেষ জাঁকজমক হয় নাই। কিন্তু নববধূকে পাইয়া কালীকান্তের পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। গৌরসুন্দরী দেবী আপন চরিত্রগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে বিবাহের দিন হইতেই সকলের অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি পতিকে জগৎপতির সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জ্ঞানে সেবা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ও মনের মত পত্নী লাভ করিয়া পরম সুখী হন এবং সাধনভজন ও সেবাকার্য্যের নানাবিধ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সহধর্ম্মিনীরূপে গড়িয়া তুলিতে থাকেন। উভয়ে মিলিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত কুলদেবতা ও পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এক আদর্শ ব্রাহ্মণ-দম্পতিরূপে পরিগণিত হন।

অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও ইঁহাদের ব্যবস্থায় ও সুমধুর ব্যবহারে বাহিরের লোক বুঝিতে পারিত না যে, কিভাবে কি হইতেছে। তাহাদের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই ছিল; দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি কোন পর্ব্বই ইঁহাদের বাদ যাইত না। দেবসেবাদি নিজেরাই করিতেন, অপরকে দিয়া সেবা করাইয়া ইহাদের তৃপ্তি হইত না। অতিথিসেবা ছিল ইঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। গ্রামে ইঁহাদের অপেক্ষা বহু ধনী পরিবার থাকিলেও কোনদিন কোন অতিথিকে ইঁহাদের বাড়ী হইতে বিমুখ হইয়া যাইতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই। বরং কোনদিন অতিথিসেবার সংযোগ না পাইলে ইঁহারা মনে মনে বিশেষ দুঃখিতই হইতেন।

এইভাবে উভয়ে মিলিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিতই সংসার ও দেবসেবাদির কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার ভিতর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল যে, এইরূপে নানা পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও গৌরসুন্দরী দেবী নারীর ভূষণ লজ্জাকে বা মাতৃজীবনের পবিত্র গাম্ভীর্য্যকে কোনদিনের জন্যও বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হইতে দেন নাই। সকলপ্রকার যশ, মান বা প্রতিষ্ঠার ভাব ভূলিয়া সম্পূর্ণ নীরবেই অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে উভয়ে সকল কার্য করিয়া যাইতেন। পিতামাতা গত হইলে যখন সংসারের সমস্ত ভার কালিকান্তের উপর পড়িল, তখনও তিনি কোনরূপে চঞ্চল না হইয়া সহধর্ম্মিনীর সহযোগিতা ধীরভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। কোনদিন ইহার বাতিক্রম হয় নাই। পিতার মৃত্যুর সময় কালিকান্ত দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদের ৯৬ বৎসর বয়সে

দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা এবং অবসর সময়ে সৎ-গ্রন্থাদি পাঠ ও জনসেবাদিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সময় অতিবাহিত হইত। ব্রাহ্মণ এমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, অসৎ-লোক ধর্ম্মের নাম করিয়া তাঁহাকে অনেক সময় প্রতারিত করিত। সময় সময় বুঝিতে পারিয়াও তিনি প্রতারককে কিছু বলিতেন না; যেহেতু ধর্ম্মের নাম করিয়াছে। অধিক তিরস্কার করিলে হয়ত উহার মনে কষ্ট হইবে; তাই কেবল হাসিমুখে একটু সাবধান করিয়া দিয়াই ছাড়িয়া দিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চারি পুত্র ও তিন কন্যা। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বিশেষ বিবরণ শেষে বংশ তালিকায় দেওয়া হইল। এখন আমরা ভট্টাচার্য্য-গৃহিনী গৌরসুন্দরী দেবীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে কিছু আলোচনা করিব। কারণ, যে মহাত্মার বাল্যজীবন কাহিনী আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার আদর্শ জীবন এই ভক্তিমতী, সেবা পরায়ণা, পরদুঃখকাতরা রমণীর সুশিক্ষার দ্বারাই বিশেষভাবে গঠিত হইয়াছিল।

গৌরসুন্দরী দেবী স্নেহবাৎসল্যে যেমন কোমলস্বভাব ছিলেন, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তেমনি কঠোর স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। একহাতে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, অপর হাতে কর্ত্তব্যে অবহেলাকারীকে কঠোর শাসন করিয়াছেন। এক হাতে দীনদরিদ্রকে বুকে তুলিয়া স্নেহের অঞ্চলে তাহাদের অশ্রু মুছাইয়াছেন, অপর হাতে কঠোর শাসনদণ্ড ধরিয়া দুষ্টের দমন করিয়াছেন। তদানীন্তন গ্রামের বর্ষীয়সী মহিলাগণ নিজ নিজ বধূ বা কন্যাকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহার নাম ধরিয়া তাঁহার আদর্শে নিজ চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ দিতেন। তাঁহার দেবদ্বিজে ভক্তি, পতিসেবা, অতিথি-অভ্যাগতের সমাদর সত্য-সত্যই ছিল সকলের অনুকরণযোগ্য। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" এই প্রচলিত বচনের আদর্শ ইঁনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই মনে হয়, মাতৃদেবীর এইরূপে শিক্ষা, মধুময় উপদেশ এবং সেবার আদর্শ বাল্যজীবনে পাইয়াই বুঝি আমাদের আলোচ্য মহাত্মার জীবন এমন মধুরতম হইয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিয়ম ছিল—প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিজে সমগ্র চণ্ডীপাঠ করিবেন। সেদিন পূর্ণিমা, কাজেই দ্বিপ্রহরে যথানিয়মে চণ্ডীপাঠ শেষ করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী গৌরসুন্দরী দেবীও অন্যান্য বারের ন্যায় স্থির ধীরভাবে বসিয়া ভক্তিপূতচিত্তে চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রন্থ বগলে করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে চলিয়া গেলেন। এদিকে

অন্যান্য সকলের আহারাদি শেষ হইলে গৌরসুন্দরী দেবী জ্যেষ্ঠা কন্যা সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাকিয়া খুব সন্তর্পণে চুপিচুপি বলিলেন—"মা সর্ব্বমঙ্গলা! আমার শরীরটা আজ যেন কেমন অসুস্থবোধ হচ্ছে, তুই সময় থাকতে কিছু ছোঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে রাখ আর যুদর মাকে (দাইমা) একটা খবর দে।" সর্ব্বমঙ্গলা মাতৃদেবীর আদেশে সব ঠিক করিয়া রাখিয়া যদুর মাকে খবর দিয়া আসিল।

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, এখনও যদুর মা আসিল না দেখিয়া পুনরায় তাহাকে ডাকিতে লোক গেল। কিন্তু সে লোক ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শুভক্ষণে গৌরসুন্দরী দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। প্রতিবেশিনী প্রবীণারা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বৃদ্ধা যদুর মাও এতক্ষণে আসিয়া সদ্যপ্রসূত শিশুকে তুলিয়া লইয়া সময়োপযোগী সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। শিশুর কাকীমা (বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী) সূতিকাগারের দরজায় দাঁড়াইয়া শিশুর মুখখানি দেখিয়াই বলিলেন—"আহা রে, ছাওয়ালটা ত' দেখি লাডুগোপালের মতই হইছে। ছাওয়ালের কোলে ছাওয়াল, এখন লক্ষেশ্বর হঞ্যা বাঁচিয়া থাক। তোরা জোকার দে, জোকার দে।' (বরিশাল জেলায় উলু দেওয়াকে 'জোকার দেওয়া' বলে) শিশুর জ্যেষ্ঠা ভগনি সর্ব্ব মঙ্গলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'ওরে ও সর্ব্বমঙ্গলা! তুই তামাসা দেখিস নাকি শঙ্খটা একবার বাজা না রে।" সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি উঠিল। যাহারা এতক্ষণ সংবাদ পায় নাই, তাহারাও এই ধ্বনি শুনিয়া একে একে আসিয়া সমবেত হইল। সর্ব্বত্র যেমন হয়, এখানেও সেইমত প্রবীণাদের নির্দ্দেশানুসারে সূতিকাগারের দৈনন্দিন কার্যগুলি যথাযথভাবে সমাধা হইতে লাগিল। শিশুর সেবার জন্য যদুর মা সর্ব্বদার জন্যই নিযুক্ত রহিল।

শিশুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধু ও মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু সূতিকাগারে ঢুকিয়া ভাইটিকে ধরিতে না পারায়, ও দাইমা দুইজনের উপর বিরক্তিপূণ বক্রদৃষ্টি দিয়া বাহির হইতেই 'আয় না, আয় না' বলিয়া শিশুকে ডাকিতে থাকে। উহাদের এই রঙ্গ দেখিয়া অন্তরাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ হাসিয়া উঠিলে দুইজনেই ছুটিয়া চলিয়া যায়। শিশুর পিতা কালিকান্তও নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া সেখান হইতে ডাকিয়া আনিয়া বাহিরে বেড়াইতে লইয়া যান। এদিকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা সাধ্যমত সংসারের কাজকর্ম্ম করে আর অবসর পাইলেই ছুটিয়া আসিয়া ভাইটিকে দেখিয়া যায়। এইভাবে একদিন দুইদিন করিয়া পাঁচদিন গত হইল। দেশের প্রচলিত প্রথামত প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করাইয়া সূতিকাগার হইতে ঘরে তুলিয়া লওয়া হইল। এখন অবসর সময় ভাইকে কোলে

করিয়া বসিয়া মায়ের সঙ্গে নানাপ্রকার আলোচনায় সময় কাটায়। জগদ্বন্ধু ও দীনবন্ধু, এখন আর ভাইয়ের কাছে যাইতে কাহারও বাধা-নিষেধ মানে না। মোট কথা, নবজাত শিশুকে লইয়াই এখন সকলের হৈহৈ।

গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি ক্ষীণস্রোতা খাল, ঐ খালের পশ্চিম পাড়ে সর্ব্বজ্ঞ বাড়ী। সর্ব্বজ্ঞ নাম হওয়ার একটি কাহিনী প্রবীণ প্রবীণাদের মনে বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি। ইহাদের পূর্ব পুরুষ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম পূজো-আহ্নিক শেষ করিয়া ভোজনে বসিবেন, এমন সময় একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাণেশ্বর সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া কি জানি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের আহার্য্য তাঁহাকে দিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইলেন। সন্ন্যাসী ভোজনান্তে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আজ দুই দিন উপবাসী ছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দিয়া প্রাণরক্ষা করিলে, আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই; বল, তোমার কি চাই?" বাণেশ্বর বিনীতভাবে সন্ন্যাসীকে জানাইলেন যে, তিনি ত' বিশেষ কিছু করেন নাই, যাহা করা মানুষ মাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং যাহা না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়—শুধু তাহাই তিনি করিয়াছেন, এজন্য কিছু পাইবার প্রত্যাশী তিনি নন। সন্ন্যাসী শুনিলেন না, তিনি উচ্ছিষ্ট হস্তেই বাণেশ্বরের হাতের উপর কি যেন লিখিয়া দিয়া বলিলেন—আজ হইতে তুমি যাহাকে যাহা বলিবে সবই সত্য হইবে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন কালের কথাই তুমি বলিতে পারিবে। এক কথায় আজ হইতে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলে। ইচ্ছা করিলে এই সর্ব্বজ্ঞ উপাধি তুমি তোমার নামের শেষে ব্যবহারও করিতে পারিবে।" সেই হইতে বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামের শেষে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। জনসমাজে তাঁহার বাড়ী "সর্ব্বজ্ঞবাড়ী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। বলা বাহুল্য তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাবধি বিনা বাধায় উক্ত সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

এই সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীতেই গৌরকিশোর সর্ব্বজ্ঞ নামে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ। ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তখন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কালিকান্ত তাঁহার নিকট হইতেই অন্যান্য পুত্র-কন্যাগণের ঠিকুজি বা কোষ্ঠী করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠ রাতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। কালিকান্তও সেই ষষ্ঠ রাত্রে অন্যান্য সকলের সঙ্গে উক্ত রামচন্দ্র

সর্ব্বজ্ঞকেও আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, উদ্দেশ্য—অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে পুত্রের জন্মলগ্নাদির মোটামুটি একটু বিচার করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইবেন। কালিকান্ত নিজে পঞ্জিকার যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে একটু গোলমাল বোধ হইয়াছে। রামচন্দ্র সর্বজ্ঞ কালিকান্তকে কাকা সম্বোধন করিতেন, কাজেই কাকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। যথাকালে আসিয়া অন্যানের সহিত সঘৃত বকুলপত্র পোড়াইয়া, বিপ্রপদরজাদি দান করিয়া বসিলে কালিকান্ত বলিলেন—"রাম! ছেলেটার জন্মসময়টা পঞ্জিকায় দেখিতে গিয়া কেমন যেন একটু সন্দেহ মনে জাগিয়াছে, তুমি একবার পত্রিকাটা দেখিয়া একটু গণনা করিয়া দেখ দেখি!" এই বলিয়া পঞ্জিকাখানি হাতে দিলে সর্বজ্ঞ মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন—"কাকা আমার আর দেরী সইছে না, বেশ তো আঁতুড়টা যাক না, ভাল করে গুণে গেঁথে দেখা যাবে।' কালিকান্ত বলিলেন—'দেখ রামচন্দ্র। এর জন্মদিনে চণ্ডীপাঠের পর অন্যান্য দিনের মত দেবীকে প্রণাম করে উঠে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তাতে আমার মন খুবই চঞ্চল হয়েছিল, তারপর আবার লগ্নটা দেখতে গিয়ে কেমন যেন খটকা লাগল। কিছুই স্থির করতে পারছি না। তুমি মোটামুটি বিচার করে ফলটা যদি একটু আমাকে জানিয়ে দাও, তাহলে মনে হয় চিত্তটা একটু শান্ত হবে।"

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় কালিকান্তের স্বনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পঞ্জিকা লইয়া বিচার করিতে বসিলেন। কিছু সময় পরে বলিলেন, "কাকা! এখন মোটমুটি যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে জাতকের পরমায়ু ত' সুদীর্ঘ। তারপর বাল্যকাল হতেই জাতক জনপ্রিয় হবে এবং কালে যে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হবে, তা ত' বিচারে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা লক্ষণে একটু গোলমাল দেখছি কিন্তু ভাল করে বিচার না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না।" কালিকান্ত বিশেষ ব্যস্তভাবেই বলিলেন, "সে লক্ষণটা কি ?' সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সবে মাত্র ছয় দিনের শিশু, এখনই এর ভবিষ্যৎ জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা বিশেষ হাস্যকর নয় কি?" উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে শিবনাথ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তা হোক, ওর যখন এতই জানবার আগ্রহ, আর তুমিও যখন একটু ইঙ্গিত দিয়েছ, তখন সংক্ষেপেই না হয় কিছু বলে ওর কৌতূহল নিবৃত্তি কর।" সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর পুনরায় ধীরভাবে গণনা আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী সকলেই নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ পরেই সর্বজ্ঞা ঠাকুর বলিলেন, "সংসারের সুখভোগ ক্ষেত্রটা এর যেন কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। অবশ্য এখন মোটামুটি বিচারে এই পাচ্ছি, সূক্ষ্মভাবে বিচারের

সময় এখন নয়, পরে যা হয় করা যাবে। আর আনন্দের দিনে ওভাবের অপ্রিয় আলোচনা না হয় না-ই হল।" এই বলিয়া পঞ্জিকাখানি তুলিয়া রাখিলেন।

শিশুর পিতা কালিকান্ত ব্যতীত কাকা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, জ্যেষ্ঠা মহাশয়ের জোষ্ঠপুত্র অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মধ্যম পুত্র চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, পূর্বের বাড়ীর শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমের বাড়ীর তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য, সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আনন্দোৎসবের দিনে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কথাটা কাহারও ভাল লাগিল না। তথাপি কথায় কথায় যদি ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু, বাহির হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় কেহই কোন কথা বলিলেন না বা আর কোন প্রশ্ন তুলিলেন না; কেবল বিশ্বেশ্বর কাকা বলিলেন, "সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর। ভবিতব্য যা আছে তা হবেই। এখন আপনি আশীর্ব্বাদ করুন ও বেঁচে থাক।" উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তা ত' ঠিকই। আগে বাঁচা, তারপর ফলাফল।" ঠাকুরও বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।" অন্যান্য কথার পর সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় কালিকান্তকে বলিলেন, "কাকা আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি সময়মত লগ্নাদি ভালরূপে বিচার করে এর কোষ্ঠী প্রস্তুত করে দিব। আমিই আপনার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়ের কোষ্ঠী করেছি, যতদূর স্মরণ হয় যেন তাদের অপেক্ষা এর কোন কোন ফল বিশেষ শুভ-জনক। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।"

কালিকান্ত আর কিছু না বলিয়া যথাযোগ্য উপঢৌকনাদি দিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। বলা বাহুল যথাসময়ে সর্ব্বজ্ঞ শিশুর বিস্তৃত কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া কালিকান্তকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "কাকা। এই পুত্রের প্রভাবে আপনার বংশের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এ এমন একটি শুভগ্রহের যোগ পাইয়াছে, যাহার ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইহার বাধ্য থাকিবে। পরমায়ু ইহার সুদীর্ঘ।" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, কালিকান্ত ও শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া কোষ্ঠীখানি তুলিয়া রাখিলেন। এদিন আর শিশুর সংসার সুখ-ভোগাদি সম্বন্ধে ষষ্ঠ রাত্রে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার কোন কথাই কেহ তুলিলেন না।

এইভাবে একদিন দুইদিন করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ হইতেই সকলে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বসিল, খুব ঘটা করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ গরীব হইলেও প্রকৃতি ছিল তাঁর অত্যন্ত উদার, তাই একটি ভাল দিন দেখিয়া পিতৃপুরুষের যথাযথ অর্চ্চনান্তে শুভ সময়ে শিশুর মুখে ভাত দিলেন। বলিতে কি, সামর্থ্যের অতীত হইলেও আত্মীয়-বান্ধবগণের আগ্রহে ঘটা মন্দ হইল না। ভট্টাচার্য্য গৃহিণী চিরকালই অনাথ দরিদ্রকে ভালবাসেন। তাঁহার আগ্রহে সেই

দিনই অপরাহ্নে কিছু দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোথা হইতে যে এই খরচপত্র আসিল আর কেই যে অগ্রণী হইয়া এই সব কার্য করিল কিছুই বুঝা গেল না, কিন্তু সকল কাজটিই খুব সুশৃঙ্খলভাবে হইয়া গেল। অন্নপ্রাশনের সময় পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের নির্দেশমত। রাশ্যাশ্রিত নাম হইল 'ধনকৃষ্ণ'; কিন্তু পিতা মাতা ও আত্মীয়-বন্ধুগণ নাম রাখিলেন 'গোপালকৃষ্ণ'। ইতিমধ্যেই সকলে 'গোপাল আমার, গোপাল আমার" বলিয়া আদর করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই গোপাল নামই পাকাপাকি হইয়া গেল, ধনকৃষ্ণ নাম কোষ্ঠীতেই লেখা থাকিল। আমরাও এখন হইতে শিশুর গোপাল নামেই পরিচয় দিব।

গোপালের বয়সও যেমন একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল, চঞ্চলতাও যেন কোথা হইতে আসিয়া উহাতে ভর করিয়া বসিল। সকলেই গোপালের চঞ্চলতায় বিব্রত। পাড়াপ্রতিবেশীরাও সময় সময় অস্থির হইয়া পড়েন। কিন্তু রহস্য এই যে, চঞ্চলতায় বিব্রত হইয়াও কেহ গোপালকে ছাড়ে না। পরস্পর বলাবলি করে গোপাল—নামেরই এই ধারা, ব্রজের গোপাল ব্রজবাসীদের কিরূপে বিব্রত করিত জান না ? ইত্যাদি। আবার কোন কোন রমণী শিশু গোপালকে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে চুমা খাইতে খাইতে বলে, "তুই কি সেই ব্রজের গোপাল নাকি রে?" কিছু বুঝিয়া কি না বুঝিয়া জানি না, গোপাল জোরে জোরে মাথা নাড়িতে থাকে, যেন ইঙ্গিতে বলিতে চায়—না না না। তারপরই কচি কচি হাত দুইখানি তুলিয়া আদরকারিণী রমণীর নাক মুখে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। এইভাবে নানাবিধ রঙ্গরসের অভিনব অভিনয়ের মধ্য দিয়া গোপাল একটু একটু করিয়া বড় হইতে লাগিল।

গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু এতদিন পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গেই খেলাধূলো করিত। এখন ঘরেই তার খেলার সাথী মিলিয়াছে, কাজেই আর সে বাড়ীর বাহির হয় না, ভাইকে লইয়া ঘরে বসিরাই খেলা করে। দুইটি ভাই যেন একটি বোঁটায় ফোটা দুইটি ফুল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি এত আকৃষ্ট যে, এক তিলমাত্র সময়ও কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দুইজনের প্রীতি, দুইজনের ভালবাসা, দুইজনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অপরিচিত সাধারণ পথিকও বলাবলি করে, যেন রাম লক্ষণ।" দীনবন্ধু ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আর ছোট ভাই গোপালের গায়ের রঙ ছিল অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণ। বিধাতার বিধানে দুইজনের মিলন বড়ই সুন্দর হইয়াছে। দুইটি দেহের বিভিন্নতা লক্ষ্য হয় বটে, কিন্তু তাহাদের চালচলন ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হয় প্রাণ যেন দুইজনের একটি। দীনবন্ধু গোপালকে 'ভাই' বলিয়া ডাকে, আর গোপাল দীনবন্ধুকে দাদাভাই বলে।

পরস্পরের সে মধুমাখা প্রীতির সম্বোধন একবার যাহার কানে গিয়াছে সে আর স্থির থাকিতে পারে না। ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারেই হউক পুনঃ পুনঃ দুই ভাইয়ের কথা শুনিতে ব্যস্ত হয়।

গোপালকৃষ্ণের বয়স যখন আড়াই বৎসর, দীনবন্ধু তখন পাঁচ বৎসরের। মাঘমাস, বেশ শীত পড়িয়াছে, একদিন সকালে দীনবন্ধু, গোপালকে কোলে করিয়া বহির্বাটিতে গিয়াছে। কোথাও রৌদ্র নাই দেখিয়া অদূরে বেতঝোপের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। কিছু সময় পরে হঠাৎ কি হইল, দুই ভাইই মাটিতে পড়িয়া গেল। নিকটেই নিবারণের মা ফুল তুলিছেল, আসিয়া তাড়াতাড়ি ধরিয়া তুলিলেন। গোপাল উঠিয়া বসল কিন্তু দীনবন্ধু যেন কেমন অবসন্নভাবে পুনরায় মাটিতে শুইয়া পড়িল। নিবারণের মায়ের হাঁকডাকে অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে দীনবন্ধুর মাও ছুটিয়া আসিলেন। দীনবন্ধুর ঐ অবস্থা দেখিয়া কাণের কাছে কয়েকবার 'হরিঠাকুর, হরিঠাকুর' বলিতে বলিতেই দীনবন্ধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী কেহই কিছু, স্থির করিতে পারিল না যে, হঠাৎ কেন দুই ভাই পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে গোপালের পিতাঠাকুর ও অন্যান্য দুই-চারিজন প্রতিবেশী সেখানে আসিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এইখানেই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বন্ধুকে লইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখন দীনবন্ধু দশ এগারো মাসের শিশু। আর আজ সেই দীনবন্ধুই পাঁচ বছরের হইয়া ছোট ভাই গোপালকে লইয়া ঠিক সেইখানেই পড়িয়া গেল। এখানে পুনঃ পুনঃ এরূপ হইবার কারণ কি? এই ঝোপের মধ্যে কোন কিছু আছে নাকি? এই ভাবের আলাপ-আলোচনাতেই সেদিনের কাজ শেষ হইল, কেহ কোনরূপে কিছু ব্যবস্থাই করিলেন না। পরবর্তীকালে দীনবন্ধুই কি জানি কাহার প্রেরণায় ঐ বেত-ঝোপটি পরিস্কার করিয়া একটি হরিঠাকুরের ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহার বিস্তৃত কাহিনী দীনবন্ধুর জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সামান্য একটু আলোচনা এখানে করিলাম। বালক দীনবন্ধু ঐ হরিঠাকুরের ঘটের জল দিয়া বহু দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোককে ভাল করিয়াছিল। ১২৮৮ সাল হইতে সেই হরির ঘট নিয়মিতভাবে নিত্য পূজিত হইতেছেন।

একবার দেশে খুব বসন্তের প্রকোপ হয়, বিশেষতঃ গ্রামের পার্শ্ববর্তী কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হয়। আরজান সেখের আত্মীয় তরিফুল্লার বাড়ীর একটি ছোট ছেলে ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অন্ধ হইয়া যায়। উহার মাতা একদিন উহাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে আসিয়া দীনবন্ধুর মাতাকে সকল দুঃখের কাহিনী বলিতে থাকে। করুণাময়ী জননী কাঁদিতে

কাঁদিতে দীনবন্ধুকে বলিলেন, "তোর হরিঠাকুরকে বলিয়া এই ছেলেটার চোখ ভাল করিয়া দে না ?" দীনবন্ধু সরল বিশ্বাসী, তার উপর মাতৃদেবীর আদেশ। দৃঢ়তার সহিত সে বলিল, "নিয়ে এস তোমার ছেলেকে।" তাহার কথামত ছেলের মা ছেলেকে লইয়া কাছে আসিলে দীনবন্ধু সেই ঘটের জল লইয়া 'হরিঠাকুর, দয়া কর; হরিঠাকুর, দয়া কর" বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল ছেলেটির চোখে দিয়া বলিল, "পর পর তিন দিন ওকে এখানে নিয়ে এসে এই মত ঘটের জল চোখে দিয়ে যাবে।" আশ্চর্য্য ব্যাপার, সত্য-সত্যই ছেলেটো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। এ কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার হওয়ায়, যাহার যখন সাহা কিছু হয় অমনি দীনবন্ধুর হরিঠাকুরের কাছে ছুটিয়া আসে। উপকৃত লোক হরির লুট দিতে আসিলে দীনবন্ধু ও গোপাল, অনান্য সমবয়সীদের লইয়া খুব 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া নাচিয়া হরির লুট দেয়। এই প্রকারের বহু ঘটনা এমন ঘটিয়াছে যে, যাহা দেখিয়া প্রবীণেরাও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। গোপাল সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে শেষবারের মত যেবার দেশ হইতে কলিকাতায় আসেন, সেবারও গ্রামবাসীদের লইয়া সেই হরিঠাকুরের কাছে খুব নানকীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর গোপাল দেশে যান নাই।

গোপালের জন্মের পর হইতেই ভট্টাচার্য্য-পরিবারের সাংসারিক অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। অতিথি-সমাগম ত' পূর্ব্বেও ছিল, এখন যেন সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন কিছু, বেশী বেশী হইতেছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দুই মূর্ত্তি বিভূতি-মণ্ডিত জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপেক্ষা অনেক অবস্থাপন্ন লোক মানে রহিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাসীগণ অন্য কোথাও না যাইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ীতেই আসেন। অবশ্য ইহাতে ভট্টাচার্য্য পরিবারের কেহই অসন্তুষ্ট নন বরং আনন্দের সঙ্গেই তাঁহাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া সাধ্যমত সেবা করিতে চেষ্টা করেন।

একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করিয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসিয়া সংবাদ দিল — "খালের ধারে জয়দুর্গাখোলায় একদল সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিয়া অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমিও সেখানে গিয়াছিলাম তাঁহারা বৈকালে আপনার বাড়ীতেই আসিবেন এইরূপ পরামর্শ করিতেছেন শুনিয়া আসলাম। সংখ্যায় তাঁহারা তের-চৌদ্দ মূর্ত্তি হইবেন।' ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে, সাধু-সমাগম হইবে, তবে তাঁহাদের যথাযোগ্য সেবা করিতে না পারিলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ। আমি কাঙাল, তাঁহাদের সেবার উপকরণ কোথায় পাইব—এই ভাবনা। শ্রীভগবান

যাহা করিবেন তাহাই হইবে।'

বাল্যকাল হইতে একটি প্রবাদ বাক্য শুনিয়া আসিতেছি যে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন।" এখানে আজ আমরা এই প্রবাদবাক্য প্রত্যক্ষ করিব। কিরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে সান্ন্যাসীগণের সেবার উপকরণ যথাসময় আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশরের ঘরে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ঘটনাটি প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না।

গ্রামবাসী লোকটির সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন সাধুগণের আগমন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বিল্বগ্রাম হইতে নকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর একটি ভৃত্য আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাদের বাবা, বৈকালে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিবেন, আপনি দয়া করিয়া বাড়ীতে থাকিবেন। এখানে বলিয়া রাখি, ঐ চক্রবর্ত্তী পরিবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৈত্রিক যজমান। যথাকালে নকুলবাবু দুইটির ভৃত্যের মাথায় নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ দুইটি পসরা লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ?" নকুলবাবু, বলিলেন, "মাতাঠাকুরাণী ঁকাশীধাম হইতে সাধুসেবার আদেশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমি কোথায় কখন সাধু দর্শন পাইব না পাইব ঠিক নাই। জানি, আপনার এখানে প্রায়ই সাধু-সমাগম হয়, তাই আপনার নিকট যৎসামান্য কিছু, দিলাম, আপনি যেরূপভাবে ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় করিবেন।' ভট্টাচার্য্য মহাশয় নকুলবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে যেন কেমন হইয়া গেলেন। উর্দ্ধমুখে চাহিয়া গদগদকণ্ঠে করযোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর! হতভাগার প্রতি তোমার এত দয়া, সত্যসত্যই ত' তুমি "যোগক্ষেমং বহাম্যহম" বাক্য প্রতি পদে পদে রক্ষা করিতেছ। আমরা এমনই মোহাচ্ছন্ন যে, তোমার এইসব প্রত্যক্ষলীলা দর্শন করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না।" নকুলবাবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন— "ব্যাপার কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধু সমাগণের বৃত্তান্ত যাহা আজই সকালে শুনিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। শুনিয়া নকুলবাবু, বিশেষ আনন্দের সহিতই বলিলেন—"বড়ই সুসংবাদ, আমি আমার এই দুইজন ভৃত্যকে এখানে রাখিয়া গেলাম, সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হইলে। তাঁহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, ইহাদের পাঠাইয়া দিলেই আমি ওখান হইতে দিয়া দিব। বলিতে কি, আপনি ইহাতে কোনরূপে সঙ্কোচ ভাব মনে আনিবেন না। যদি নিজের মনে করিয়া যখন যাহা প্রয়োজন আমার ওখান হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সত্যসত্যই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।"

অন্যান্য কথার পর নকুলবাবু ভৃত্য দুইজনকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট

রাখিয়া চলিল গেলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও জিনিসগুলি ঘরে তুলিয়া রাখিয়া সহধর্ম্মিণীকে একে একে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে চৌদ্দ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া বহির্ব্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁহাদের বসিবার আসনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নকুলবাবুর প্রেরিত লোক দুইটির সহায়তায় সস্ত্রীক ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্ন্যাসীগণের ধুনীর কাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সেবার যাবতীয় দ্রব্য অতি নিপুনভাবে জোগাইলেন।

পরদিন সন্ন্যাসীগণের দলপতি-মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ আমরা তোমার এইখানে ভাণ্ডারা দিতে চাই, তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিনীতভাবে সম্মতি জানাইলে দলপতি-মহারাজ পুনরার বলিলেন—"তোমাদের জিনিসপত্র কিছু জোগাড় করিতে হইবে না, তোমরা শুধু আমাদের কার্য্যে সহায়তা কর, আর আমাদের দলের দুইজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া তোমরা গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস, যেন সকলেই আসিয়া মধ্যাহ্নে এখানে প্রসাদ পায়। আজ আমার শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের তিথি। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার এই তিথিপূজোয় যোগদান কর, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় তোমাদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে।"

দলপতি সন্ন্যাসী-মহারাজের নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য চলিতে লাগিল। যথাসময় গৌরনদীর বাজার হইতে জিনিসপত্র লইয়া লোক উপস্থিত হইল। খিচুড়ী প্রসাদের সঙ্গে ভাজা, তরকারী, চাটনী ও শেষে দধি সন্দেশ দিয়া প্রায় আড়াই শত লোক পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিল। আজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে যেন এক আনন্দ মেলা বসিয়াছে। সমস্ত কার্য্য মিটিয়া গেলে দলপতি-মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! তোমার পরিবারস্থ সকলকে এখানে লইয়া আইস, আজ তোমার বাড়ীতে উৎসবানন্দ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হওয়ায় আমরা সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার পরিজনবর্গকে আজ আশীর্ব্বাদী-বিভূতি দিয়া যাইব।" তাহাই হইল, সকলকে দলপতি-মহারাজ একে একে বিভুতির ফোঁটা দিয়া দিলেন। গোপাল তখন মায়ের কোলে বসিয়া আছে, সন্ন্যাসী তাহার কপালে বিভুতির ফোঁটা দিয়া নিজের কপালস্থ সিন্দুরের ফোঁটা হইতে অঙ্গুলি দ্বারা একটু , সিন্দুর লইয়া তাহার কপালে ও মাথায় মাখাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোপালকে দেখাইয়া দলপতি-মহারাজ বলিলেন—"ঠাকুর মশাই! তুমি নিষ্ঠাবান হিন্দু,

কাজেই ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা তোমাকে আর নূতন করিয়া কি বলিব তুমি ত" জান যে, হিন্দুধর্ম্ম আত্মার অমরত্ব এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিয়া থাকে। তোমার এই পুত্রটি পূর্ব্বজন্মের বিশেষ সৌভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছে, একে সামান্য মনে করিও না। এ শুধু তোমাদের নয়, এর জীবন জগদ্ধিতায়। জগতের জন্য এর প্রাণ কাঁদিবে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এ প্রীতির চক্ষে দেখিবে। কালে এর কঠোর সাধনা এবং নানাপ্রকার পরীক্ষায় একে সুপ্রসিদ্ধ করিয়া তুলিবে। কোনরূপ ভয়-ভাবনা করিও না, যত কঠোরই এর পরীক্ষা হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ইহার জয় অনিবার্য্য। তবে একটা কথা, তোমরা একে হাজার চেষ্টাতেও ঘরে রাখিতে পারিবে না, তাহার জন্য দুঃখ করার কিছু নাই। তুমি শাস্ত্র জান, শাস্ত্র বলিয়াছেন—একটি সৎপুত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিলে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।"

দলপতি-মহারাজের কথা শুনিয়া গোপালের মা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং করজোড়ে বলিলেন—"বাবা! আমার গোপালকে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, ও যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।" সন্ন্যাসীমণ্ডলী সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জীয়ে, মাই! জীয়ে, জীয়ে"।

অযাচিতভাবে সাধুসজ্জনগণের সেবার সামগ্রী উপস্থিত হওয়া এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিষ্ঠার সহিত আপন দীনতার মধ্য দিয়াও অভি সুশৃঙ্খলভাবে সেবা করা—এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া কেবলই মনে হয়, "ঠাকুর! তুমি কি দয়াল না নিষ্ঠুর। যে সেবা করতে চায় তাকে দাও না, আর যে সেব করতে চায় না তাকে প্রচুর দিয়াছ।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আর নিষ্ঠুর বলিতে প্রাণ চায় না। বহুদিন পূর্ব্বে কোথায় যেন শুনিয়াছিলাম ঠিক মনে নাই—একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ভাবুক কবি যেন আমারই মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। পাঠকগণকে সঙ্গীতটি উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কবি বলিয়াছেন-

"তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর কোন মুখে।।
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা শরণ মাগি দুঃখের বেলা
তবু ফেলে যাও না চলে সদাই থাক সম্মুখে।।
প্রতিদিনের অশেষ যতন ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন
নিত্য থাকি ঘুমিয়ে তবু পাশরি প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পাছে মরি ঘুরে তাই তো রে সুখ পালার দূরে
সে আনন্দ ওরে অন্ধ বন্ধ মনের সিন্দুকে।।

ভুলে যাই যে সবই আমার নেই তো ভিন্ন আমি সবার
দশের মুখে হাসি দেখে কাঁদব আমি কোন্ মুখে।
ভবের মাঝে শূন্যে খালি বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে।।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আজিকার এই সাধুসেবার বিষয় আলোচনা করিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইচ্ছা যদি সৎ হয়, তাহা হইলে তাহা পূরণ হইতে বিলম্ব হয় না। "সদিচ্ছা পূর্ণকারী শ্রীভগবান" এই উক্তিটি অতি সত্য।

সন্ন্যাসীগণ চলিয়া গেলে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ এবং কথাবার্ত্তা লইয়া গ্রামের মধ্যে খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাল যাঁহারা দেখিতে পারেন না — এরূপ যাঁহারা সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ জল্পনা-কল্পনা দ্বারা প্রচার করিতেও ছাড়িলেন না যে, সাধুরা নিশ্চয়ই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে গোপনে কিছু ধনরত্ন অথবা সোনা তৈয়ারীর মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য বিচার করুন, আমি আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হই।

এইরূপ নানা ঘটনার মধ্য দিয়া চারিটি বৎসর গত হইল। ইতিমধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু সেগুলির উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। গৃহিনী যদিও গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় কিছু বলিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়—"ও কিছু নয়, মায়ের কৃপায় সব ঠিক হইয়া যাইবে, তুমি ভাবিও না' এইরূপে প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া মায়ের পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গোপালকে কোলে করিয়া দীনবন্ধু, আসিয়া বলিল, "বাবা! ভাইয়ের হাতে-খড়ি দিবেন না ?" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "যে চঞ্চল, এখন ওর হাতেখড়ি দিয়ে কি করব?" দীনবন্ধু ছাড়িল না, সে পুনরায় বলিল—"ভাই যেখানে যত চঞ্চলপনাই করুক না, আমার কাছে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা থাকে। আমি লিখতে বা পড়তে বসলে আমার দোয়াত কলম খাতা বই নিয়ে এমনভাবে পড়ার অনুকরণ করে যে, তা দেখলে মনে হয় ওর লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক আছে। তাই বলছি, এর হাতেখড়ি দিয়ে দিন, আমার সঙ্গে ও পড়াশুনায় মন দেবে, আর চঞ্চলতা করবে না।" বাবা বলিলেন, "বেশ, তবে ওকে স্নান করিয়ে দিতে বল, আমি পূজা সেরে তারপর ওর হাতেখড়ি দিয়ে দিব।" তাহাই হইল, ১২৮৪ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন যথারীতি গোপালকৃষ্ণের বিদ্যারম্ভের কার্য্য সম্পন্ন হইল। দীনবন্ধুর কথামত গোপাল ধীর স্থির ভাবে বসিয়া পিতার নির্দ্দেশমত সমস্ত কার্য্য যথাযথ করিল দেখিয়া সকলের মনেই আনন্দ হইল।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে সেনবাবুদের দীঘির পশ্চিম পাড়ে এক বৃদ্ধ গুরুমহাশয় থাকিতেন। নাম মহিমচন্দ্র সরকার। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠশালায় পড়িয়াছে—এ রকম লোক তখন হরিসেনায় অনেক ছিল। গুরুমহাশয় যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পাঠশালাটির বিশেষ কিছু পরিবর্ত্ত হয় নাই। সেই ভাঙা বেড়া, স্থানে স্থানে খড়শূন্য চাল, চেয়ার টেবিল বা বেঞ্চির কোন বালাই নাই, কেবল গুরুমহাশয়ের বসিবার জন্য একটা অতি পুরাতন বেতের মোড়াই আর ছেলেদের শাসন করিবার জন্য হাত আড়াই লম্বা একগাছি পাকা তেল-কুচ্‌কুচে বেত। যদিও সে বেতের আঘাত কাহারও পৃষ্ঠদেশে কখনও পড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই, তবুও কি জানি কেন বেতের পুনঃ পুনঃ আলোড়ন দেখিয়া এবং গুরুমহাশয়ের গুরুগম্ভীর ধম্‌কানি শুনিয়াই ছেলেরা ভয়ে আপনাপন কাজে মন দিত। বেতখানি নাড়িতে নাড়িতে গুরুমহাশয় "আজ তোকে দেখাঞ্যা দিমু" বলিয়া যে ছাত্রের দিকে অগ্রসর হইতেন, তাহার আর কিছু করিবার থাকিত না। তিনি কাছে গিয়া বামহস্তে কানটি ধরিয়া শুধু শূন্যে বেত নাড়িয়াই চলিয়া আসিতেন। তাহাতেই শাসনের চূড়ান্ত হইত। মোট কথা গুরুমহাশয়ের ভগবদ্দত্ত বপুখানি এবং বাহ্যিক আস্ফালন দেখিয়াই সকলে ভয়ে জড়সড় হইত। এই পাঠশালাতেই ১২৮৪ সালের ফাল্গুন মাসে গোপাল-কৃষ্ণকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল।

অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে পাত্‌তাড়ি বগলে করিয়া ধীর মন্থর গতিতে গোপাল যখন পাঠশালায় যাইত, তখন গোপালের মা ও অন্যান্য মহিলারা অবাক্ হইয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং গোপালকে দেখিয়া ভাবিত, এই কি সেই চঞ্চলচূড়ামণি? অল্পদিনের মধ্যেই তালপাতার লেখা শেষ করিয়া গোপাল কলাপাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল। পাঠশালার বাহিরে গোপালের চঞ্চলতা যতই থাকুক, পাঠশালার মধ্যে সে অতি সুবোধ ছেলে। লেখাপড়ার জন্য কখনও তাহাকে তাড়না বা ভর্ৎসনা পাইতে কেহ দেখে নাই। ক্রমে শ্লেট ও পরে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিতেই গোপালকে সে পাঠশালা হইতে বিদায় লইতে হইল। কারণ, তখন পর্য্যন্তও সে পাঠশালায় উহার বেশী শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এবার গোপালকে সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর কার্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞের নিকট পড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইল। এই সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় ছিলেন খুব নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণ। যেমন ছিল তাঁহার আচার-ব্যবহার, তেমনই ছিল তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা। তিনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার গান কীর্ত্তন ও-অঞ্চলের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তারপর টোট্‌কা চিকিৎসা এবং নানা প্রকার ঝাড়ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্রাদিতে একজন প্রসিদ্ধ ওঝা বলিয়া দেশব্যাপী তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি স্ব-ইচ্ছায় গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার জন্য নিজের বাড়ীতেই নিম্ন প্রাইমারী পর্যন্ত পড়াইবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোপাল পাঠশালা ছাড়িয়া এইখানে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং উক্ত সর্ব্বজ্ঞ হয় মহাশয়ের নিকটে অবসর-সময়ে একটু একটু গান কীর্ত্তন শিখিতে থাকে। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ও বিশেষ যত্নের সহিতই গোপালকে এই সকল শিক্ষা দেন।

গোপাল ও দীনবন্ধু, একসঙ্গেই খেলাধুলা, লেখাপড়া, বেড়ানো যা কিছু করে। কেহই কাহাকে ছাড়িয়া কিছু করিতে পারে না। একদিনের একটি ঘটনায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহার চিহ্ন গোপালের জীবনে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। আমরা এখানে ঘটনাটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

একদিন বিদ্যালয়ের ছুটি থাকার দ্বিপ্রহরে দুই ভাই গ্রামের জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়দিগের বাগানে জাম কুড়াইতে গিয়াছে। গাছের তলায় জাম কুড়াইতে কুড়াইতে উপরের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে গাছে উঠিয়া পাকা জাম পাড়িবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির হইল, যে কোন প্রকারেই হউক গাছে উঠিতেই হইবে। দুই ভাই-ই উঠিয়া গেল। গোপাল একটু অপেক্ষাকৃত পাতলা চেহারার, তাই সহজেই অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু হাত বাড়াইয়াও পাকা জাম ধরিতে পারিতেছে না। নীচের ডালে বাসিয়া দীনবন্ধু বলিল, "এক কাজ কর, লাফ্‌ দিয়া জাম ছিঁড়িয়া লইয়া আমার কোলের উপর পড়।" দাদার আদেশ, কাজেই অবিচারে তথাকরণ। লম্ফপ্রদান, নিম্ন চালে অবস্থিত দাদার ক্রোড়ে পতন এবং দুই ভাই সহ সে ডালটিও ভাঙ্গিয়া বৃক্ষতলে প্রপাত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। দীনবন্ধু, মাটি ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল কিন্তু গোপাল উঠিতে পারিল না। ধরিতে গিয়া দেখা গেল, গোপালের বাম উরুদেশের হাড়খানি একেবারে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং উপরের চামড়া পাক খাইয়া গিয়াছে। নিকটেই খাল ছিল, গোপালকে ধরাধরি করিয়া লইয়া সেই খালে ফেলিয়া বলিল, "সাঁতার দে, সাঁতার দে, ভাল হয়ে যাবে।"

হরিবোল হরি। সাঁতার দিবে কে? গোপালের পা নড়বড়্‌ করিতে লাগিল, উপরন্তু জলে হাবুডুবু খাইতে আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া আবার তাহাকে ধরিয়া উপরে উঠাইয়া বাড়ীতে সংবাদ দিল। অল্পকাল মধ্যেই বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য গোপালকে বাড়ীতে লইয়া

গেল। সংবাদ ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য।

অনেক চিকিৎসায় ভাঙ্গা পা-টি জোড়া লাগিল বটে কিন্তু বাম পদটি একটু ছোট হইয়াই থাকিল। চলিতে গেলে একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিত। সখীবেশ ধারণের পর কাপড়ে ঢাকা থাকিত বলিয়া সহজে উহা বুঝিতে পারা যাইত না, অত্যন্ত অন্তরঙ্গজনই উহা জানিতেন।

গোপালের রসিকতার পরিচয় একটু এখানে না দিয়া পারিলাম না। এই ঘটনার পর গোপাল খোঁড়াইয়া চলিত, তাহা দেখিয়া বিদ্রূপে করিয়া কেহ কেহ তাহাকে বলিত, "খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং, কার বাড়ীতে হাঁড়ি খেয়েছিস্, কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং?" গোপাল তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই পদ্যাকারে তার জবাব দিত।

"খাই নাই হাঁড়ি কারও ভাগে নাই কেউ ঠ্যাং।
ডাং ড্যাং ড্যাং ডেডাং ড্যাং।।
চুরি করা বড় দোষ শুনিয়াছি চিরকাল।
জাম চুরি করিয়াই ঘটিয়াছে এ জঞ্জাল।।
বলিও না আর কিছু, দিও না কো শাপ ব্যাং।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডেডাং ডেডাং ড্যাং।।"

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় রসিকতা বটে কিন্তু নিজ দোষ ঢাকা দিবার কোনরূপে প্রচেষ্টাই ইহার মধ্যে নাই। চুরি করা যে বড় দোষ এবং নিজে যে চুরি করিয়া দোষ করিয়াছে, তাহা অকপটে স্বীকার করিয়া অপরকে যেন চুরি কর হইতে সাবধানই করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক, এই ঘটনার জন্য কিছুদিন গোপালের পাঠ বন্ধ ছিল। পুনরায় সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের নিকট পড়িতে আরম্ভ করিয়া একদিন কথায় কথায় সংস্কৃত পড়িবার বাসনা জানাইলে সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বলিলেন, "বেশ তো, বামুনের ছেলে সংস্কৃত পড়্‌বি সে তো আনন্দের কথা। তবে আর কিছুদিন আমার এখানে থাক, তারপর আমিই তোর সংস্কৃত পড়বার ব্যবস্থা করে দিব।" গোপাল আর কিছু না বলিয়া তাঁহার নিকটেই পড়িতে থাকিল। কিছুদিন পরে গোপালের পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সর্বজ্ঞ মহাশয় গৈলা গ্রামে কবীন্দ্রবাড়ীতে ললিত মোহন কবিশেখরের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোলে গোপালের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ও এত অল্প বয়সে সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া অতি যত্ন সহকারে গোপালকে কলাপ-ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সংস্কৃত শিক্ষার স্থানটিই পরবর্ত্তীকালে "কবীন্দ্র কলেজ" নামে বিখ্যাত

হইয়াছিল। এইখানেই গোপালের নিয়মিত ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়।

গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু, এই সময় উজিরপুরের সন্নিকটে নারায়ণপুরে বিশ্বম্ভর কাব্যতীর্থ মহাশয়ের টোলে পড়িতেছিল। ছোট ভাই গোপালকে যেন আর দূরে রাখিতে মন চাহে না। তাই পরামর্শ করিয়া-কোঠায় প্রসন্ন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোলে তাহার পড়িবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। নারায়ণপুর ও খলিসাকোঠা উভয় গ্রামই উজিরপুরের নিকটবর্ত্তী। উজিরপুর ইহাদের পিসিমার বাড়ী। দুই ভাই-ই অবসর সময়ে আসিয়া এখানে মিলিত হইয়া আনন্দ করিয়া যাইত, তাহাতে তাঁহারাও আনন্দ পাইতেন। এই ভাবে দুই ভাই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে থাকিলেও পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কোন অসুবিধা না থাকার উভয়েই পরমানন্দে নিজ নিজ পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিল।

পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া একবার গোপালকে দেশে যাইতে হইয়াছিল। যথাসময় ফিরিতে না পারায় সে বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। কিন্তু গোপাল সেজন্য পড়া বন্ধ করিল না, দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িয়া পরের বৎসর যথাকালে ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষা দিয়া খুব ভালভাবেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এদিকে দীনবন্ধু নারায়ণপুরের টোলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বরিশাল চলিয়া গিয়াছে, এদিকে গোপালও ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে যাইয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত কিছুদিন দেশের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

এইবার গোপালকে কর্ম্ম-বীররূপে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইলাম। দেশে থাকাকালীন বহু জনহিতকর কার্য্য গোপালকৃষ্ণের সহযোগিতায় হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন, একটি অনাথাভাণ্ডার ও একটি গ্রাম্যহিতকারী সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার করা, অসুস্থ ব্যক্তি সেবাশুশ্রূষা করা, বিপন্নকে রক্ষা করা। তখন গ্রাম্য হিতকারী সমিতির প্রধান কার্য্য ছিল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গোপাল এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সঙ্গীগণের সহযোগিতায় দেশের মধ্যে এক মহা আলোড়ন তুলিয়াছিল। ছোট বড় বিচার ছিল না। ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেই গোপালের নিকট সমান সেবা পাইত। পরবর্ত্তীকালে গোপালের দেশত্যাগের পর যদিও এইভাবে সমিতির কাজ চলে নাই তথাপি শোনা গিয়াছে, সেই ধারার অনুসরণে বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রামে সেবাকার্য্য চলিয়াছিল।

গ্রামে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের অভাব অনেকের মত গোপালও অনুভব করিতেছিল। কিন্তু এতদিন বাহিরে বাহিরে থাকার দরুণ বিশেষ কিছু

করিতে পারে নাই। এবার বাড়ীতে আসিয়াই গোপাল বন্ধুগণের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। বাটাজোড়ে সেজ ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। ভগ্নীপতির ছোট ভাই হরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই গোপালের সহিত মেলামেশা করিতেন। বিবাহের পর সম্বন্ধটা আরও পাকাপাকি হইল। এই হরিচরণ ভট্টাচার্য্যই পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাকে ডাকা হইল এবং গ্রামের মোহিনীকুমার সেন, বিপিনবিহারী সেন (ইনি পরে নয়মনসিংহে ডাক্তারি করিতেন এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন), যদুনাথ সেন, তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ মত শুভদিনে শুভক্ষণে জমিদার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে বিদ্যালয় স্থাপন হইল। ছাত্রের অভাব হইল না, অভাব হইল শিক্ষকের। শেষে স্থির হইল যে, যতদিন উপযুক্ত শিক্ষক না পাওয়া যাইবে, ততদিন মোহিনীকুমার সেনকে লইয়া গোপালকৃষ্ণই শিক্ষকের কাজ চালাইয়া যাইবেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্যও কলেজের ছুটি পাইলেই গোপালের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে স্কুলের কার্য্য ভালভাবে চলে তাহার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিষ্ণুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মোহিনীবাবু তাঁহাদের কাছারী বাড়ীতে তিন-চারখানা ঘর দিয়া সেইখানে বিদ্যালয়টি উঠাইয়া অনিলেন। এক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল সেখানেও সঙ্কুলান হচ্ছে না। তখন গোপালকৃষ্ণ বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্বোক্ত বিষ্ণুবাবুর বাটীর নিকটস্থ বহু আগাছা পরিপূর্ণ একটি বাগান পরিষ্কার করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিল। নিজেও যেমন, বন্ধু, কয়টিও মিলিয়াছে সেইরূপে। কোন কাজের কথা উঠিলে কতক্ষণে তাহা সমাধা করিবেন সকলেরই সেই চেষ্টা। কাজেই বিদ্যালয়ের জন্য স্থান পরিষ্কার করিয়া গৃহ প্রস্তুত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। গোপালকৃষ্ণের পরামর্শ মত নিজেরাই গাছ কাটিয়া, ঘর বাঁধিয়া, রাস্তা করিয়া দিয়া, এমন কি ছাত্রদের সুবিধার জন্য নিজেরাই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমিতে একটি ছোট পুকুরও কাটিয়া ফেলিলেন। চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "গোপাল করে কি?"

এই সময় গৈল-নিবাসী অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়কে প্রধান শিক্ষকরূপে পাইবার সুযোগ হইল। তাঁহার হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভার দিয়া সকলে মিলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি ভাবে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয় এবং উহার

ব্যয়ভার সহজে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

গোপালকৃষ্ণের পরামর্শে এবং প্রাণপণ চেষ্টায় ঐ সময় গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি বসানো হইল এবং কয়েকজনের উপর ভার দেওয়া হইল যে, তাঁহারা গ্রামে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তার নিকট বিদ্যালয়ের জন্য কিছু কিছু সাহায্য আদায় করিবেন। পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, ইচ্ছা সৎ হইলে ভগবান তাহা অপূর্ণ রাখেন না। এখানেও আমরা তাহা বেশ উপলব্ধি করিলাম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই গোপালের নির্দ্দেশিত পথে চলিয়া দেখা গেল যে, সংগৃহীত চাউল দ্বারা বিদ্যালয়ের খরচ চালাইয়াও অনাথ ভাণ্ডারের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। এখানেও গোপালের বুদ্ধির প্রশংসার সকলেই পঞ্চমুখে।

কিছুদিন চলিবার পর বিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যাপারে গোপালকৃষ্ণকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামবাসী এবং পূর্ব্বোক্ত হরিচরণবাবুর সমবেত চেষ্টায় শেষে সমস্ত গোলমালই মিটিয়া গিয়াছিল; কেবল একটি অসুবিধা ছিল বিদ্যালয়ের জমির স্বত্ব লইয়া। যখন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয়, তখন জমির মালিক কোন আপত্তি করেন নাই; কিন্তু বন জঙ্গল পরিস্কার হইবার পর তিনি জমি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলের সমবেত চেষ্টায় তিনি বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তবে গোপালকে এজন্য বড়ই মনঃকষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ে ছেলেদের নানাপ্রকার অশিষ্ট ব্যবহারে অনেক সময় এমন বিভ্রাট ঘটিত যে, তাহার সুমীমাংসা করিতে গোপালকে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। ছেলেদের শাসন করিতে যাইয়া শিক্ষকগণ এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেন যে, হিতে বিপরীত হইয়া যাইত। কাজেই উভয় দিক সামঞ্জস্য করিয়া সুমীমাংসা গোপালকৃষ্ণ যেমন করিতে পারিত, এমনটি আর কাহারও দ্বারা হইত না। পুনঃ পুনঃ এই ভাবে বিরত হইয়া শেষে গোপালকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি নিয়ম লিখিয়া বিদ্যালরের গৃহে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। হতভাগ্য দীন লেখক যখন ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ছিল, তখন পর্য্যন্ত সে নিয়মগুলি দেখিয়াছে। শুনা যায়, ১৩২০ কি ২১ সালে পূজার পূর্ব্বে যে ঝড় হয়, তাহাতে নাকি ঘরখানি পড়িয়া গেলে অন্যান্য জিনিষের সহিত লেখাগুলোও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিয়মগুলি ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক তিনের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার নকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ছাত্রগণের প্রতি ঃ- প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া উত্তমরূপে দন্তধাবনাদি করিবে, পরে নিজ নিজ পাঠে বসিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ কিছু, কিছু, শারীরিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন। নিয়মিত আহার, নিয়মিত নিদ্রা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ, চিত্তচঞ্চলকারী বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বদা বিরত থাকা, নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিছু সময় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চিন্তা, পরোপকার সাধনে যত্ন, বিপন্নকে সাহায্য করা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কোনরূপে হঠকারিতা না করিয়া শিক্ষকগণের নির্দেশমত চলিবে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, এরূপ কোন ভাষা কেহ করিবে না বা কাহাকেও করতে দিবে না। আর একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, ছাত্রজীবনে বিলাসিতা বর্জ্জন এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন একান্ত প্রয়োজন। নিজের আচরণ সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে, তোমার ব্যবহারে যেন কখনও কেহ দুঃখ না পায়।”

শিক্ষকগণের প্রতি ঃ— ছাত্রগণকে কেবল তাড়ন বা ভর্ৎসন করিলেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাহাদের অভাব অভিযোগগুলি অত্যন্ত সন্তর্পণে বিচার করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। ছাত্রগণ যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে যে, শিক্ষকগণ আমাদের ব্যথ্যার ব্যথী, তাহা হইলে সহজেই তাহারা আনুগত্য গ্রহণ করিবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই চরম বিদ্যা দান করিলাম মনে করিয়া শিক্ষকগণ ক্ষান্ত হইবেন না। তাহার উপরেও ছাত্রগণ যাহাতে অধিক কিছু, অনুধ্যান করিয়া শাশ্বত তৃপ্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ কিছু কিছু উপদেশ দিবেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিনও সকল ছাত্রকে একত্র করিয়া নানা দেশ-বিদেশের কথা ভিন্ন ভিন্ন মনীষীর জীবনী আলোচনা এবং নতূন নতূন আবিষ্কৃত বা যতদূর সম্ভব সহজ ও সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। ছাত্রদের প্রতি এমন ব্যবহার করা চাই, যাহাতে তাহারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রাণ-ঢাল ভালবাসা দিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসাই মানুষের জীবনে বিশ্বাস জাগাইয়া জন্ম-জন্মান্তরের মধুমেয় অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে কখনও অবিশ্বাস আসিতে পারে না। এইভাবের শিক্ষা না দিয়া কেবল তাড়ন বা ভর্ৎসন দ্বারা ছাত্রগণকে ভীত করিয়া তুলিলে তাহারা শিক্ষকগণকে এক একটি হিংস্র জীব মনে করিয়া সর্ব্বদা দূরে দূরেই থাকিবে। ইহাতে শিক্ষকের শিক্ষা মোটেই কার্যকরী হইবে না। তারপর ছাত্রগণের প্রাণে এই ভাব জাগাইয়া দিতে হইবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র নিজে বড় হওয়া নয়, সকলকে বড় করিয়া তোলা এবং যাহারা মিথ্যার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া সমাজে অনাদৃত হইয়া

রহিয়াছে, তাহাদিগের বন্ধন মোচন করা।”

অভিভাবকগণের প্রতি ঃ—“বিদ্যালয়-ঘটিত কোনও ব্যাপার বিশেষভাবে অনুসন্ধান না করিয়া অভিভাবকগণ যেন কোনরূপে অভিমত প্রকাশ না করেন। তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে শিক্ষকগণ ছাত্রদের উন্নতির জন্যই নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি কোন সময় কোনরূপে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সন্তর্পণে তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। শিক্ষকগণ যেন অভিভাবকের দ্বারা কখনও কোনরূপে মনোকষ্ট না পান। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। কোন শিক্ষককে কোন কিছু, বলিবার থাকিলে প্রকাশ্যে না বলিয়া ধীরভাবে গোপনে বলা উচিত। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা অমূল্যে জ্ঞান-সম্পদ ছাত্রদের দিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞান দান করিতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু মান দিতে কোন মতেই রাজী নন। যাহাতে বিদ্যালয়টি স্থায়ী হয় এবং সকল বিষয়ই আদর্শস্থনীয় হয় তজ্জন্য সকলেরই আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন। বিদ্যালয় কোন ব্যক্তিবিশেষের মনে করিলে ভুল করা হইবে। সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয় দেশের জন্য, দশের জন্য। পল্লীরাণীর অলংকার স্বরূপ এই সকল শিক্ষায়তন যাহাতে দিন দিন উন্নত হয়, তাহার জন্য সকলেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।’

যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা অকপটে বলিব যে, গোপালকৃষ্ণের এইরূপে আন্তরিক চেষ্টা ও আগ্রহ না থাকিলে দেশে কোন মতেই বিদ্যালয়টি স্থায়ী হইতে পারিত না। গোপালের দেশত্যাগের পর বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরেই আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, “গোপাল যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা পারিতেছি না; ভবিষ্যতে পারিব কি না তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।’

বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালে আষাঢ় মাসে এগার বৎসর বয়সে গোপালকৃষ্ণের উপনয়ন-সংস্কার হয়। সেদিন প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে সোনালী আলো ঢালিয়া দিবার পূর্ব্ব হইতেই ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসী-গণের আগমন আরম্ভ হইল। দেশাচার মতে শেষরাত্রে দধিমঙ্গল করাইবার জন্য পুরমহিলাগণ গোপালকে লইয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহকারে গান করিতে করিতে পুকুরঘাটে চলিয়াছেন। এদিকে উপনয়নের সময় বেলা এক প্রহরের মধ্যে। কাজেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সকাল সকাল স্নানাহ্নিক সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

বৈদিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি সমাপনান্তে যথাসময়ে আচার্য্যদেব গোপালকৃষ্ণের

কর্ণমূলে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। চারিদিকে নারীগণ উলুধ্বনি দ্বারা ও উপস্থিত জনগণ জয়ধ্বনি দ্বারা উৎসবক্ষেত্র মুখেরিত করিয়া তুলিলেন। মুণ্ডিতমস্তকে অরুণ-বসন পরিধান করিয়া স্কন্ধে নবমেঘলা সহ যজ্ঞসূত্র দোলাইয়া নবীন ব্রহ্মচারীবেশে গোপাল যখন দণ্ড হাতে লইয়া আসনের উপর দাঁড়াইল, তখন সেই নবীন তাপসরূপের মাধুরী দর্শনে অনেককেই বলিতে হইয়াছিল, "এ ছেলে তো সাধারণ ছেলে নয়!" সত্যসত্যই গোপালের তখনকার লোক-চিত্তাকর্ষী মূর্ত্তিটি দর্শকগণের চিত্তে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। এ কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুলগুরু, নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব হইতেই গোপালকৃষ্ণের দেব দ্বিজ ও সাধুসন্ন্যাসীতে ভক্তি, শিক্ষকগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সঙ্গীগণের প্রতি অতুলনীয় প্রীতি এবং কনিষ্ঠগণের উপর প্রগাঢ় স্নেহ পরিলক্ষিত হইত। এখন উপনয়ন-সংস্কারের পর হইতে সেই সকল আচরণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যানুকুল যাবতীয় আচরণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচস্নানাদি সমাপনান্তে দীর্ঘ সময় ধরিয়া জপ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীভাবে চলিতে লাগিল। কেহ কোনরূপে আপত্তি তো করেই না, বরং তাহার প্রত্যেকটি কার্য্যে সাধ্যমত সকলেই সাহায্য করেন। কাজেই গোপাল নির্ব্বিবাদে নিজের কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুদিন এইভাবে চলিল।

কাব্যপাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী গোপালকৃষ্ণের জপ, তপ, পূজো, আহ্নিক বাড়িয়াই চলিল : তাহাতে যে তাহার পাঠের কোনরূপে বিঘ্ন হইত তাহা নহে। আমারা যেমন পড়াশুনোর অজুহাতে সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়িয়া দিই; গোপালের তাহা ছিল না; গোপাল যথা নিয়মে সকল কার্য করিয়াও পাঠের যথেষ্ট সময় করিয়া লইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল যে, ইচ্ছা থাকিলে কোন কাজই আটকায় না।

গোপালকৃষ্ণের সাত্ত্বিকভাবপূর্ণ দেহের গঠন, পরিধানে গৈরিকবসন, পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু, হাসিমাখা প্রশান্ত বদনে নাম-গান করিতে করিতে গোপাল চলিয়াছে, কেশরাশি পৃষ্ঠোপরি দুলিতেছে তাহা দেখিয়া পথচারী অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। গোপালের কিন্তু অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না, তার দৃষ্টি থাকিত সর্ব্বদা নিম্নদিকে পথের উপর। স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে গোপালকে কেহ কখনও দেখে নাই। এই সময় আর একটি কঠোর নিয়ম গোপালকে পালন করিতে দেখিয়া ছোটবড় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোক যে ঘাট ব্যবহার করে। গোপাল সে ঘাটে কিছুতেই নামিত

না, বিশেষ অসুবিধা হইলেও অঘাটে নামিয়া স্নানাদি করিত, অথবা দূরে কোন নূতন জলাশয়ে যাইয়া নিজকৃত করিত। আচারব্যবহারে সর্বপ্রকারেই ছিল তাহার পবিত্র ভাব পরবর্ত্তী সখী জীবনেও যাঁহারা তাহার সুখময় পবিত্র সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

গোপাল আর যাহাই করুক না কেন, মাতৃ-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করে নাই। একদিন মা তাহাকে বলিলেন, "ওরে গোপাল! নমঃশূদ্রপাড়ার বিপিনের বাবা বহুদিন রোগভোগ করছে, একে বুড়ো মানুষ, তাতে রোগে ভুগে ভুগে এখন একেবারে নাকি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কাল নফরের মা বল্‌লে, সে নাকি আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে চায়। তুই কি তাকে প্রসাদ দিয়ে আসতে পারবি?" গোপাল বিশেষ কাজে বাটাজোড় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, মায়ের কথা শুনিয়া উল্লাসভরে বলিল, "হ্যাঁ মা, কেন পারব না? তুমি ঠাকুরের ভোগ হলে আমাকে প্রসাদ সাজিয়ে দিও, আমি গিয়ে তাকে খাইয়ে আসব।" সেদিন আর তাহার বাটাজোড় যাওয়া হইল। না। যথাসময়ে প্রসাদ লইয়া গিয়া তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিল এবং নিজে আহার করিল।

পাঠশালার গুরুমহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তবুও সংসারের অভাব মিটাইতে তাঁহাকে অনেক কিছু, করিতে হয়। একদিন মাছ ধরিবার জন্য সেনবাবুদের দীঘিতে জাল ফেলিয়াছেন, কিন্তু টানিতে গিয়া দেখেন জাল আসে না, কিসে যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছে। গোপাল সেই পথে একটি রোগীর জন্য পথ্যাদি লইয়া যাইতেছিল; গুরুমহাশয়কে ঐভাবে জাল টানাটানি করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গুরুমহাশয়?" গুরুমহাশয় যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এই দেখ না বাবা, জালটা যেন কিসে আট্‌কে গেছে। বুড়ো মানুষ, অবেলায় জলে নামতেও কেমন ভয় হচ্ছে, কি করি এখন বল দেখি ?" গোপাল বলিল, "আপনি ভাববেন না আর টানাটানিও করবেন না, ছিঁড়ে যাবে; আমি জলে নেমে আপনার জাল তুলে দিচ্ছি।" গুরুমহাশয় জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "সে কি বাবা, তুমি বামুনের ছেলে, তাতে আবার আমাদের ঠাকুরবংশ; তুমি কেন আমার জন্য অবেলায় জলে নামবে।" গোপাল আর বিলম্ব না করিয়া হাতের জিনিষগুলি উপরে রাখিয়া জলে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল, "তাতে কি হয়েছে গুরুমশাই! আপনি একে বৃদ্ধ, তাতে আমার প্রথম জ্ঞানদাতা গুরুমশাই, আপনার একটু কাজ করলে আমার কি গতর ক্ষয়ে যাবে? আপনি কিছু মনে করবেন না।" এই বলিয়া প্রায় পনের মিনিটকাল চেষ্টা করিয়া জাল

তুলিয়া দিল। গুরুমহাশয় খুবই যেন লজ্জিত হইলেন। গোপাল নানাপ্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কেবলই বলেন, "হায়, হায়, বামুনের ছেলেকে দিয়ে জাল তুলিয়ে নিলুম! এ পাপের আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। না জানি বাবা, তোমার জ্ঞাতিগুষ্ঠীরা তোমাকে কত কি বলবে।" গোপাল গুরুমহাশয়কে অভয় দিয়া বলিল, "আপনি কিছু, ভাববেন না, ওসব জাতের নামে বজ্জাতি যারা করে করুক ; আপনি এই আশীর্বাদ করুন, আমি যেন বিনা দ্বিধায় সকল জীবের সেবা করে ধন্য হতে পারি।" বলিতে কি, সমাজের গোঁড়া কেহ কেহ এজন্য গোপালকে দুই এক কথা বলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতে এরূপে কার্য করিলে সামাজিক শাসন করা হইবে বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিল; কিন্তু নির্ভীক, পরোপকারী, উদারপ্রাণ গোপালকৃষ্ণ সেসব কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সেবাধর্ম্মে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল।

একবার কার্ত্তিকমাসে দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন সকলে ঠাকুর বিজয়া দেখিতে সেনাবাবুদের দীঘির পাড়ে গিয়াছে, গোপালও যাইতেছিলেন। পথের ধারেই যদুনাথ সেন মহাশয়দিগের পুষ্করিণী। পুকুর-ধারে উপস্থিত হইতেই দেখিলেন, পুকুরের মধ্যখানে যেন কি একটা একবার উঠিতেছে ও একবার ডুবিতেছে। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, মানুষ। তাই তো এখন কি হইবে, কেমন করিয়া লোকটাকে তোলা যায়, কেহই তো এখানে নাই। এইরূপে চিন্তা করিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে দুই-একটা হাঁক দিয়াই গোপাল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সাঁতার দিয়া যেখানে লোকটা হাবুডুবু, খাইতেছিল, সেইখানে গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। লোকটি ভয়েই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, গোপালের গলা এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে, তাহাকে লইয়া গোপাল কোন মতেই সাঁতার দিয়া কিনারায় আসিতে পারিতেছে না। এদিকে এতক্ষণে গোপালের হাঁকডাক শুনিয়া দুই চারিজন যাহারা পুকুরধারে আসিয়াছিল, তাহারাও চীৎকার করিতে থাকায় অল্পক্ষণের মধ্যেই বহু লোক সেখানে জমা হইয়া গেল। গোপাল দুই-চারবার লোকটির সহিত ডুবিয়াও গিয়াছিল, অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে তিন-চারজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উভয়কে জল হইতে তুলিয়া উপরে উঠাইল। গোপাল যদিও জল খাইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ ক্লান্ত হয় নাই। অপর লোকটি একেবারে মড়ার মত এলাইয়া পড়িল। সমবেত জনগণের সেবায় লোকটি একটু সুস্থ হইলে তাহার পরিচয় ও কি ভাবে কি হইয়াছিল জানিতে চাহিলে সে বলিল, "আমি পশ্চিম পাড়ের ঘাটে একটি স্ত্রীলোককে থালা-বাসন জলে রাখিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া উহা চুরি করিবার

অভিপ্রায়ে জলে নামিয়াছিলাম কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ পা পিছলিয়া একেবারে অগাধ জলে গিয়া পড়িলাম। আমি সাঁতার জানি না, তাহার উপর চেঁচামেচি করিলে লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিবে; সেই ভয়ে চুপ করিয়া থাকিয়াই ঘাটের দিকে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু পারিলাম না; ক্রমেই অথৈ জলে গিয়া পড়িলাম। তাহার পরই এই বাবুটি আমাকে ধরিতে গেলেন, আমি প্রাণের দায়ে উঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইয়াছে জানি না, জ্ঞান হইলে দেখি, আমি উপরে।"

উপস্থিত জনমণ্ডলী নিঃশব্দে সকল কথা শুনিতেছিল পরিচয় পাইয়া নানা প্রকার গালাগালি করিয়া যখন সকলে উহাকে মারিতে উদ্যত, তখন গোপাল ধীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল, "এ অবস্থায় উহাকে শুধু মারিলে বা গালাগালি দিলেই উহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে না; এমন কিছু, করিতে হইবে, যাহাতে উহার চরিত্র নির্ম্মল হইয়া যায়। ও যদি বুঝিতে পারে যে অন্যায় করিয়াছে, তাহা হইলে আর জীবনেও এদিকে পা বাড়াইবে না। অনেক সময় দেখা যায়, অবস্থার ফেরে পড়িয়া অনেকে চরিত্রহীন হয়। সে ক্ষেত্রে সেই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার পরিবর্তনের উপায় দেখাইয়া দিতে পারিলে তখন তাহার প্রাণে যে সত্যের সাড়া জাগিবে, তাহা হইতে আর কিছুতেই সে বিচ্যুত হইবে না। আপনারা একটু শান্ত হউন, আমি নিভৃতে উহাকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

এই ভাবে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করিয়া গোপাল একে একে সকলকে বিদায় দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বকুলতলায় বসিয়া উহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। গোপালের ব্যবহার এবং অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া লোকটি গোপালের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা চাহিতে লাগিল। গোপাল তাহাকে তুলিয়া অভয় দিলে, 'আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না' এই স্বীকৃতি দিয়া সেদিনের মত সে বিদায় লইল। এ বিষয় লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। এমন কি, কেহ কেহ দুর্জ্জনকে প্রশ্রয় দিবার জন্য গোপালের উপর অনেক কটু বাক্যও প্রয়োগ করিল। গোপাল কোন কিছুর প্রতিবাদই করিল না, বরং হাসিমুখে সকলের সহিত পূর্বাপেক্ষা বেশী মেলামশা করিতে লাগিল। পরে শুনা গিয়াছে যে, গোপালের উপদেশে সেই দুস্কৃতকারী নিজের জীবনকে এমন ভাবে গঠিত করিয়াছিল যে, সকলে তাহাকে সাধুর আসনে বসাইতেও কোন আপত্তি করিত না। বাংলা ১৩১৮ সালে সেই লোকটি গোপালের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু, কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের হাওড়ার কেঁড়োরবাগানস্থিত "ভাগবত-আশ্রমে" আসে

এবং শ্রীধাম নবদ্বীপের পথ পরিচয়াদি জানিয়া লইয়া সখীজীকে দর্শন করিয়া আসে। পাঠকগণ সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করুন।

গোপালের মা ঐ লোকটির কোন পরিচয় জানিতেন না, কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে নিজের চাষের নানাবিধ ফলমূল দিয়া যাইত আর জিজ্ঞাসা করিত, "আমার পরাণদাতা ঠাকুরটি কোথায়, কেমন আছেন?" বলাবাহুল্য গোপালকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়াই সে ঐরূপে কথা বলিত। বহুলোকের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতে সে নিজের জীবনকে অতি পবিত্রভাবেই গঠন করিয়াছিল, পূর্ব্বের বন্ধুগণের বহু প্রলোভনেও আর সে পথভ্রষ্ট হয় নাই।

বাল্যকাল হইতেই গোপালের একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার ছিল, গোপাল মুখে যাহা বলিত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে, যত কষ্ট, যত বাধা-বিঘ্নই উপস্থিত হউক না কেন কিছুই সে গ্রাহ্য করিত না। অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গোপাল যাহা মনে করিত, তাহার সাধনে সে প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। আদর্শ বলিয়া একবার সে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, কোন কিছুতেই তাহাকে তাহা হইতে চ্যুত করা যায় নাই, আজীবন সে, সেই আদর্শের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময় দেশের অধিকাংশ ঘরই খড়ের। এক এক বাড়ীতে ঘরগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, এক ঘরের চাল হইতে সমগ্র বাড়ীর চাল ঘুরিয়া আসা যাইত, মাটিতে নামিতে হইত না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রায় প্রতি বৎসরই কোথাও না কোথাও আগুন লাগিত। ব্রহ্মার এ-কোপদৃষ্টি হইতে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না, যিনি যত বড় প্রভাব প্রতিপত্তিশালীই হউন না কেন। শত্রুতার জনাই হউক অথবা অসাবধানতা-বশতঃই হউক, কোন রকমে একখানি ঘরে আগুনে ধরিয়া গেলে অন্যান্য ঘরগুলি রক্ষা করা বিশেষ কষ্টকর হইত। একবার মধ্যের বাড়ীতে আগুন লাগিরা এমন বীভৎস কান্ড হইয়াছিল যে, সে বাড়ীর সমস্ত ঘরগুলি তো গিয়াছিলই, উপরন্তু নিকটবর্তী পুস্করিণীর অপর পারের এক গরীব গৃহস্থের চালেও অতিস্ফুলিঙ্গ পড়িয়া জলিতে থাকে। পুকুরের পাড় দিয়া রাস্তা ধরিয়া যাইতে একটু সময় বেশী লাগিবে বুঝিয়া গোপাল সাঁতার দিয়াই পুকুর পার হইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত। চালে উঠিবার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাত উচ্চ একটি কাঁঠাল গাছে উঠিয়া সেখান হইতে ঘরের চালে লাফ দিয়া পড়িয়া গোপাল অগ্নিনির্বাণ করেন। দেহে অসীম শক্তি, মনে অভাবনীয় সাহস এবং কর্ম্মে অনলসতা থাকায় সে যাত্রায় গরীবের সর্বনাশ না হইয়া সামান্য ক্ষতির উপর দিয়াই গেল এবং

তাহা সম্ভব হইল একমাত্র গোপালকৃষ্ণের চেষ্টায়। এই কার্য্যে ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, সকলেই শতমুখে গোপালের প্রশংসা করিয়াছিল।

হতভাগ্য লেখক, গোপালকৃষ্ণের ছোট ভাই। একদিন সমবয়স্ক তিন চারজনকে নুন্ দিয়া তেঁতুল খাইতে দেখিয়া বায়না ধরিল, সেও খাইবে। সবেমাত্র জ্বর হইতে উঠিয়াছে, সে সময় কুপথ্য করিলে আবার অসুস্থ হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই গোপাল তেঁতুল খাইতে দিলেন না। একবার নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন তাহাদের নিকট হইতে তেঁতুল লইয়া মুখে দিতে যাইবে, এমন সময় গোপাল তাহাকে একটি চড় মারিয়া হাতের তেঁতুল কাড়িয়া লইয়া পরে ফেলিয়া দিলেন। অভিমানী ভাই, বিশেষতঃ সে দাদার কাছে তাহার সব কিছু আবদার বায়না, তাঁহার কাছে এইর,প ব্যবহার পাইয়া সে একেবারে মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঐ যে শুনা যায় "বজ্রাদলি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি", এখানেও তাহাই হইল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে গোপাল যে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া ভাইকে শাসন করিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহার সে মূর্ত্তি নাই। গোপালছুটিয়া গিয়া ধুলি-ধূসরিত ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে ভুলাইতে লাগিলেন। শেষে তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে ভাল পুতুল কিনিয়া দিব এবং খেজুর আনিয়া দিব।' ভাইটি খেজুর বড় ভাল বাসিত, কাজেই প্রিয় জিনিষ পাইবার আশায় সকল দুঃখ অভিমান ভূলিয়া আনন্দের সঙ্গে বলিল, — "দাও।" গোপাল বলিলেন, "এখন কোথায় পাইব, কাল সকালে দিব।" এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন এমন স্থানে আমাদের বাস ছিল যে, খেজুর কিনিতে হইলে দুই ক্রোশ দূরে বাজারে যাইতে হইত। কাজেই গোপাল বলিলেন, কাল সকালে দিব।"

ভাইটি তো আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, খেজুর ও পুতুল পাইবার কথা তাহার মনেও রহিল না; গোপাল কিন্তু সেকথা ভোলেন নাই। শেষ রাত্রে কখন উঠিয়া বাজারে চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানেও না। সকালে উঠিয়া দেখা গেল, ভাইয়ের মাথার কাছে এক জোড়া মাটির রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও কাগজে জড়ানো কিছু খেজুর। বিষয়টি তত গুরুতর না হইলেও সামান্য সামান্য বিষয়েও গোপালের সত্যরক্ষার প্রচেষ্টা কত সুন্দর, কত গুরুত্বপূর্ণ তাহাই আলোচনা করিবার বিষয়। এরূপ ছোট ছোট বহু ঘটনা গোপালের জীবনে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সে সব আর উল্লেখ করিলাম না।

"আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু," মুখে তো অনেকেই বলে, কিন্তু কাজে দেখায় কয়জনা ? গোপালের জীবনে কিন্তু আমরা কাজে ও কথায় এক দেখিতে পাই।

সখী অবস্থায় যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা তো বিশেষভাবেই এ সকল লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশে থাকার সময়ও এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে কে আপন, কে পর কিছুই বুঝিবার অবসর হয় নাই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-কাঁঠালের সময় নিজেদের গাছে আম কাঁঠাল পাকিয়াছে, গোপাল হয়তো, চাহিয়াও দেখেন না—পাকিয়া পড়িয়া যাইতেছে, পাখিতে খাইতেছে; কেউ যদি পাড়িয়া দিবার কথা বলে, তাহা হইলে গোপাল জবাব দেন, "অনেক হইয়াছে খাক্ না ও-দুটো।' কিন্তু বাড়ীর বাহির হইয়াই অপরের গাছের দিকে চাহিয়া গৃহস্বামীকে বলেন, —"আপনাদের আমগুলি পাকিয়াছে, পাড়িয়া দিব কি?" অবাক্ কাণ্ড, বাল্যকাল হইতেই যেন গোপাল পরার্থে" জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণের স্বভাবের আর একটা বৈশিষ্ট; যদি কাহাকেও বিদ্রূপ করিতে হয় বা কাহাকেও কোন কার্য্যে নিবৃত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে গোপাল এমন মোলায়েম ভাষা ও মিষ্ঠ সম্বোধন করেন যে, লজ্জায় পড়িয়া তাহাকে নিজ ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। একবার একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক কোনও সমাজবিগর্হিত কার্য্য করিয়াও কৃতকর্ম্মের জন্য সমাজের কাছে নতি স্বীকার করেন না; তাহাতে সমাজপতি তাঁহাকে একঘরিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কোন কাজে তাঁহাকে ডাকিত না, তাঁহার বাড়ীতেও কোন কাজে কেহ যাইত না। পথে-ঘাটে দেখা হইলে সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার ঠাট্টা-তামাসা করিত। এ ভাবের সমাজ-শাসন এখন কিছু, কিছু, শিথিল হইলেও সে সময়ে খুব কড়া ছিল। যাহা হউক, সেই লোকটি একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, ছেলেরা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছে। গোপাল তখন বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যে সেখানে উপস্থিত। পুর্ব্ব হইতে ভদ্রলোকের বিষয় কিছু কিছু গোপালের জানা ছিল; কিন্তু সুযোগ অভাবে তাঁহাকে কোন দিন কিছু বলা হয় নাই। আজ সুযোগ পাইয়া ব্যঙ্গকারী ছেলেদের প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং ভদ্রলোকের কাছে গিয়া খুব বিনীতভাবে বলিলেন,"বাবু! আপনারা সমাজের মাথা, আপনারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে আপনাদের কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু আপনাদের কৃতকর্ম দ্বারা অপরকে নিন্দা করিবার সুযোগ-সুবিধা দিয়া তাহাদিগকে অপরাধী করেন কেন? যাহা করিয়াছেন প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করিয়া ফেলুন না? আর 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', যদি ভুলক্রমে একটা কাজ করিয়াই থাকেন, তাহাতে হইয়াছে কি ? তারপর আজ যদি আপনি অকপটে দোষ স্বীকার করেন এবং সমাজের ব্যবস্থা মানিয়া লন, তাহা হইলে আপনি তো একটা আদর্শ হইয়া রহিলেন। অপর কেহ কিছু অন্যায় করিলে আপনার মত সম্মানী লোকের

নজীর দেখাইয়া তাহাদেরও শাসন করা যাইবে। গোলমাল মিটাইয়া ফেলুন, আপনার একার জন্য আর দশজনকে অপরাধী করিবেন না।' এই ভাবের অনেক কথা বেশ মোলায়েম করিয়া সেদিন তাঁহাকে বলায় দুই-তিন দিনের মধ্যেই সেই লোক কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সমাজপতির নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ফলে আবার সকলের সহিত মিলিত হইতে পারিলেন। একদিন প্রকাশ্য সভায় অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে সেই লোকই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন — "আমাদের গ্রামের সৌভাগ্য যে, গোপাল ঠাকুরের মত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী লোক এখনও এখানে রহিয়াছেন। তাহার মিষ্টমধুর বাক্যবাণ আমার মর্ম্মে এমনভাবে আঘাত না করিলে হয়তো আমি অভিমানের চাপে দিন দিন কোন্ অতল তলে তলাইয়া যাইতাম। সত্য বলিতে কি, এ ভাবের চাবুক মারিবার লোক সমাজে যত বৃদ্ধি পাইবে ততই সমাজের মঙ্গল। যে যাহাই বলুন, আমি এজন্য গোপাল ঠাকুরের কাছে চির ঋণী।' সমাবেশাশ্রয়ের পরেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার অপরাধীকে মিষ্টমধুর অথচ যাহাকে বলে "আতে ঘা দিয়া" কথা বলার ভঙ্গী কত কার্য্যকরী হইয়াছিল।

গোপাল বিবাহ করিতে চাহেন না, তবুও তখনকার প্রবীণ প্রবীণারা মধ্যে মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ তোলেন। মা কিংবা বড় ভাই বোন বিশেষ কিছু আর বলেন না ; শুধু বলেন, "গোপাল যদি রাজী হয়, তবে আমাদের আপত্তি কি?' একদিন একজন গ্রামবাসী আসিয়া গোপালকে বিবাহের জন্য ধরিয়াছে। এই লোকটি অল্পদিন হইল ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া খুবই গোলমাল করিতেছে। গোপাল এতদিন তাহাকে কিছু বলিবার সংযোগ পান নাই। আজ বিবাহের কথা তুলিতেই গোপাল বলিলেন, 'হ্যা'। বিয়ে করতে হবে বৈ কি ? তা নইলে যা দু-চারটে পৈতৃক থালা ঘটি বাটি আছে সেগুলো ভাগ্‌বাট্‌রা করে খান খান করব কি করে? লোকটি আশ্চর্য ভাব দেখাইয়া বলিল, 'কেন?' গোপাল বলিলেন, "কেন আবার কি, তোমরাই তো পথ দেখাচ্ছ। গত বৎসরে তোমার দাদা তাঁর স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ করে তোমার বিয়ে দিলেন, আর এক বৎসর যেতে না যেতেই তুমি সেই দাদার মাথায় লাঠি মেরে বিষয় ভাগ করে নিয়ে তাকে পথে বসাতে চাও। তোমাদের এই সব দেখে শুনে এমন আক্কেল হচ্ছে যে, বিয়ের জন্য বেশ ভাল ভাবেই আমরা তৈরী হচ্ছি।" লোকটি আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। গোপালের এই ভাবের স্পষ্টবাদিতার সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।

গোপালের কাকীমা, বড় বৌদিদি বা গ্রামের অন্য কোন মহিলা বিবাহের

প্রস্তাব করিলে গোপাল খুব নম্রভাবে তাঁহাদের বলিতেন, "কেন আপনারা আমাকে পুনঃ পুনঃ বিবাহের কথা বলেন? কার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন বলুন তো! স্ত্রীলোক মাত্রেই যে আমার মাতৃস্থানীয়া।" ইহার পর আর কেহ বিবাহের প্রসঙ্গই তোলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল ! একদিন একজন ভাল জ্যোতিষি আসিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে হাত দেখাইতেছেন। ঠিকুজী, কোষ্ঠী যাহার যাহা আছে তাহাই তিনি দেখিয়া.ফলা-ফল বলিয়া দিতেছেন। গোপালের মা এক প্রকার জোর করিয়াই গোপালের হাতখানি জ্যোতিষী ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন। জ্যোতিষী ঠাকুর খুব নিবিষ্টচিত্তে হাতের এবং কপালের দুই চারটি চিহ্ন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ উহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। গোপাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি দেখলেন ঠাকুর বলুন না।' জ্যোতিষী ঠাকুর বলিলেন, 'হাত তো জীবনে অনেক দেখেছি কিন্তু এমনটিতো কোথাও পাই নাই।" সকলেই বিশেষতঃ গোপালের মা, বিশেষভাবে জানিতে চাহিলে গোপালের নিষেধ সত্ত্বেও এই কটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন—"ইহার পরমায়ু পঁচাত্তরের কাছাকাছি, খুবই ভাগ্যবান, স্পষ্টবাদী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সময়মত এমন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুলাভ করিবে যে, তাঁহার কৃপাশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক হইবে। সংসারে থাকা ইহার কোনমতেই সম্ভব নয়। কতকগুলি রেখা ও চিহ্নের দ্বারা ইহার মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভজনসাধনে বহু, বাধাবিঘ্ন ঘটিবে, কিন্তু কিছুতেই ইহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আর একটি কথা বলিতে সঙ্কোচ আসিতেছে কিন্তু না বলিয়াও পারিতেছি না। ইহার হস্তস্থিত রেখার সহিত এমন একটি অপূর্ব্ব চিহ্নের সংযোগ হইয়াছে, যাহার ফলে ইহাকে কোনও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, এইরূপে লক্ষ্মণেই সূচিত হইতেছে।"

গোপাল এতক্ষণ জ্যোতিষী ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। এবার একটু জোর করিয়াই হাতখানি টানিয়া তাঁহাকে কিছু, বলিতে না দিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিল,—ঠাকুর! ডাকাতের সর্দ্দার হব, বুঝলেন? শেষে ধরা পড়ার ভয়ে গায়ে ভস্মটস্ম মেখে সন্ন্যাসী সেজে বেড়াব। তাতেও যদি না হয়, তবে শেষটায় ঘোমটা দিয়ে ঘরের কোণে বসে আত্মগোপন করব।" পাঠকগণ! পরবর্তীকালে যাহা ঘটিয়াছিল, গোপালের তখনকার উক্তিতে কি তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? তখন কিন্তু এই সকল কথা শুনিয়া ইহার উপর কেহ কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই, বরং রহস্য মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। গোপালের পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ঘটনার সহিত মিলাইয়া জ্যোতিষী ঠাকুরের ভবিষ্যৎ বাণীগুলি

যে কিরূপ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

এই জ্যোতিষী ঠাকুরের একটু পরিচয় এখানে দিতেছি। ইঁহার নিবাস ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত জয়শীরকাঠি গ্রামে। নাম কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নিষ্ঠাবান ছিলেন। তদানীন্তন সময়ে এ অঞ্চলে ইঁহার সমকক্ষ জ্যোতিষী কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। হস্তরেখাদি দেখিয়া অতি অদ্ভুতভাবে ইঁনি ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেন। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র অনন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পিতার অনেকগুণ পাইয়াছেন। পূর্বে ইনি বরিশাল শহরের উপরেই থাকিতেন, কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গোপাল কি শীত কি গ্রীষ্ম বারমাসই ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন? পিতার মৃত্যুর পর শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া যে কাপড়খানি পরিধান করিয়াছিন, দশ দিন পর্য্যন্ত আর সে কাপড় ত্যাগ করে নাই। স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রেই থাকত, আবার সন্ধ্যার সময় উহা পরিধান করিয়াই স্নান করিয়া সমস্ত রাত সেই বস্ত্রে কাটাইত। দুই চারখানা কুশাসন বিছাইয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়াই রাতে নিদ্রা যাইত, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে নিজের গামছাখানি ভাঁজ করিয়া মাথায় দিত। এত কঠোরতা, এত অনিয়ম তবুও গোপাল হাসিমুখে সুস্থ শরীরে দিন কাটাইয়াছে। সকলের সঙ্গে থাকিলে অনুরোধ উপরোধে পাছে নিয়মভঙ্গ করিতে হয়, সেই ভয়ে গোপাল নিজের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছিল বাড়ীর পশ্চিমের ভীটায় একখানি ছোট খড়ের ঘরে। সে ঘরে অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের। তা তিনি যে কেহই হউন না কেন ঐ বাহিরে দাঁড়াইয়াই যাহা বলিবার বলিতে হইত। কি জানি কোন্ সুকৃতি বলে বর্ত্তমান জীবনী লেখকের সেই গৃহে প্রবেশের কোন বাঁধা নিষেধ ছিলনা। বরং কোন সময় যোগের ক্রিয়া করিতে যাইয়া কোন কিছু, প্রয়োজন হইলে গোপাল লেখকের নাম ধরিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইত। অল্প বয়স হইলেও সেই সকল ক্রিয়াদর্শনের সৌভাগ্য পাইয়া নিজেকে ধন্য মানিত। গোপালকে চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার করিতে কখনও কেহ দেখিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। যতদূর পথ হউক না কেন কাষ্ঠ-পাদুকা, নচেৎ খালিপা। সমবয়সী সকলকেই সে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কিছু, কিছু হঠযোগের ক্রিয়া করিবার অনুরোধ করিত, গোপাল অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। অনেকেই গোপালের নির্দেশ মত কার্য্য করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। একদিন আহারান্তে ভুক্তদ্রব্যের পরিতাজ্য অংশ জলের সহিত বমন ভঙ্গিতে তুলিতেছিল, এমন সময় প্রতিবেশী একজন অসুস্থ ভাবিয়া গোপালকে ধরিতে গেলেন, গোপাল হস্তসঞ্চালনে নিষেধ করিলেও

তিনি তাহা না শুনিয়া মস্তকটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। গোপালের ক্রিয়া শেষ হইলে লোকটি একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন,—“বাঃ রে, এ যে শুধু জলের সঙ্গে ফোড়ন বিচিগলিই উঠল ভাত ডাল তো কই উঠল না ?” গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিল, “ভাই! আমি তো বমি করি নাই, কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই বাহির করিয়া দিয়াছি, এগুলি পেটে থাকিলে উপকার তো কিছুই হইত না, বরং অম্ল বৃদ্ধি করিয়া দেহকে অসুস্থই করিত। বলা-বাহুল্য, সেই লোকটি অতি আগ্রহ সহকারে গোপালের নিকট হইতে সেই ক্রিয়া শিক্ষা করিয়া নিয়মিত ব্যবহারে তাঁহার বহুদিনের অম্লরোগ হইতে নিঃস্কৃতি পাইয়াছিলেন। একদিন পশ্চিম দিগস্থ বাড়ীর আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ব্যস্তভাবে আসিয়া গোপালের মাকে বলিলেন,—গোপাল ঘাটের ধারে তেঁতুল তলায় অমন ক'রে পড়ে আছে কেন?” মা বলিলেন, “কিভাবে পড়ে আছে, তা তো জানি না।” আনন্দ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “গায়ে কোন আঘাত লাগলে আমরা যে ভাবে পা টান করে থাকি, সেই ভাবে দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে একবার পায়ের আঙুলগুলি ধরে টানছে আবার সোজা হয়ে উঠছে।” মা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, ওর কোন কিছু, অসুখ-বিসুখ হয় নাই, মধ্যে মধ্যে বসেও গোপাল ওরূপ করে। গোপাল বলে, ও এক প্রকার হঠযোগের ক্রিয়া।' শুনিয়া আনন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধীরে ধীরে সেই গাছতলায় যাইয়া একটু দূরে থাকিয়া গোপালের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াটি দেখিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে গোপাল উঠিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ওটি একটি হঠযোগের ক্রিয়া উহা দ্বারা দেহের জড়তা দূর হয়। এমনকি নিয়মিত ভাবে ঐ ক্রিয়া করিলে কখনও দেহে বাত আশ্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ পরীক্ষা করিতে চায়, মাত্র একপক্ষকাল উপযুক্ত লোকের নিকট শিক্ষা করিয়া দেখিতে পারে বাতের পক্ষে বিশেষ উপকারী কিনা। এইভাবের নানা ক্রিয়া, নানা আসন গোপালকে গভীর রাতে মুক্ত বায়ুতে বসিয়া করিতে আমরাও বহুদিন দেখিয়াছি।

উপনয়ন সংস্কারের পর হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপালের উপর দেবদেবীর সেবাপুজোর ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে ছিলেন। গোপালও বিনা বাধায় ও বিনা আপত্তিতে নিজ সৌভাগ্য মনে করিয়াই যথাসাধ্য সেবা করিত। গোপালের এই সেবাপূজায় সকলেই পরম পরিতুষ্ট। ঠাকুরের বেশবিন্যাসও মনোহর সাজসজ্জার মধ্য দিয়া অকপট সেবা-সৌকর্য্য সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করে। আত্মীয়স্বজনের তো কথাই নাই, পাড়াপ্রতিবেশী পর্যন্ত গোপালের দেবসেবার সুশৃঙ্খল পরিপাট্য দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করে, “গোপালের হাতে সেবা

পেয়ে ঠাকুর যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।" পরবর্তীকালে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণবাগে অষ্টকালীয় সেবার সুসংবদ্ধ প্রণালী এবং সেবকগণের উপর সকল বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

একদিন ঠাকুর ঘরে পূজায় বসিয়া গোপাল আর উঠে না। তাহার খুড়ীমা শিবপূজার আয়োজন করিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গোপাল কি করিতেছে দেখিবার জন্য বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে খুড়ীমা তো অবাক্। দেখিলেন যে, গোপাল পদ্মাসনে বসিয়া আসন হইতে প্রায় এক হাত উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি গোপালের মাকে গিয়া সমস্ত বলিলেন। মা উহাতে কোনরূপে চঞ্চল না হইয়া উঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা খারাপ কিছু নয়, প্রাণায়ামের ক্রিয়া দ্বারা ওরূপে হয়। তারপর বিশেষ করিয়া এ কথাও মা তাঁহাকে বলিলেন যে, ঐরূপ অবস্থায় যেন কেহ কোনরূপে গোলমাল না করে, কারণ কোনরূপে প্রতিকূল কারণে শ্বাসের গোলমাল হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

গোপালের ব্যবহারে ছোট ছোট ছেলেরাও তাহার সহিত মিলিত হইতে কোনরূপে সঙ্কোচ বোধ করিত না। গোপাল নানা প্রকার আলোচনার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিত। অনেক সময় গোপালের হেঁয়ালী সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না। একদিন সেনেদের কাছারী বাড়ীতে ছেলেদের মুখপাত্ররূপে ডাঃ যদুনাথ সেন ছেলেদের সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিবার জন্য গোপালকে ধরিলে গোপাল বলিল, "চাইবে কম নিবে বেশী, দিবে কম রাখবে বেশী। তবেই জীবন সুখের হবে।" পুনরায় বলিল, এখন যা সঞ্চয় করে রাখতে পারবে তা-ই হবে শেষ জীবনের সম্বল।" আমরা তো কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, অপরে কে কিভাবে এ সকল মর্ম্ম গ্রহণ করিতেন জানি না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "বুঝবি বুঝবি আর একটু বড় হ' আর একটু জ্ঞান হোক, তা হলেই সব বুঝতে পারবি। এখন এইটুকু জেনে রাখ্ যে, দেবার আগে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিলে যত খুসি দিতে পারবি, অভাব হবার ভয় থাকবে না। এসব হেঁয়ালীর অর্থ তখন সত্যসত্যই কিছু, বুঝিতে পারি নাই, এখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ অবস্থার পরিবেশে ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি দ্বারা এক এক সময় এক এক ভাবে এক এক রকম সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তৃপ্ত হই মাত্র।

দেশে অবস্থানকালে গোপালের ভক্তিভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। বা সমস্ত

কথাবার্ত্তা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, উহারই মধ্যে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করিব, আশা করি উহা দ্বারাই পাঠকগণ সমগ্র বিষয় ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

ভট্টাচার্য্য পরিবারের কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষীজনার্দ্দন ও নারায়ণশিলার প্রতি বৎসরই দোল, জন্মাষ্টমী, রাস প্রভৃতি উৎসব হয়। দেশাচারমতে দোলের সময় দোলায় করিয়া শ্রীবিগ্রহকে লইয়া আবীর খেলিতে খেলিতে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়সহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তন্মধ্যে কোনও বাড়ীতে গৃহস্বামীর আগ্রহে দোলাসহ ঠাকুর নামাইয়া কীর্ত্তন হয় এবং গৃহস্বামীর ইচ্ছামত ভোগরাগ দেওয়া হয়। এক বৎসর দোলের সময় গোপাল পূর্ব্বোল্লেখিত কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কীর্ত্তন-সম্প্রদারের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় গোপালকে পাইয়া খুবই আবেগভরে হোলির নানাবিধ পদ-গান করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিকে আবীরের ছড়াছড়ি, হরিবোল ধ্বনি। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় যেন কি ভাবিয়া গোপালকে গান করিবার ইঙ্গিত করিলেন। গোপাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুরকণ্ঠে গান ধরিল—

'আজ হোলি খেলবে শ্যাম তোমার সনে।
একেলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে।।'

সঙ্গের দোহারগণ যখন গান ধরে, গোপাল তখন নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করেন ও আবীর ছড়ায়। কিছু সময় এই ভাবের গান ও নৃত্য চলিবার পর গোপাল হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের হাত দুইটি নিজ হাতে চাপিয়া ধরিয়া গানের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল—"সেদিন বড় পালিয়েছিলে, আজ শাস্তি পাবে নিঠুর কালা"।

চতুর্দ্দিকে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি, আনন্দ কোলাহল। কীর্ত্তনমণ্ডলী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের কম্পমান দেহটি ভাবাবেশে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আর না জানি কোন ভাবাবেশে গোপালের আরক্ত বদন-কমল হইতে সোহাগপূর্ণ বচনে কেবল ঐ কথাই উচ্চারিত হইতে লাগিল—'সেদিন বড় পালিয়েছিলে' আজ শাস্তি পাবে নিঠুর কালা।"

ইহারা পরস্পর কিভাবে বিভোর হইয়া যে এইরূপে করিতেছেন অনেকেই হয়তো বুঝিতে পারিল না; কিন্তু ভাবুক মরমী ভক্ত যে কেহ ছিলেন না, এ কথা বলা যায় না। মোহিনীকুমার সেন এক পাশে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তনে দোহারকি করিতেছিলেন, হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া এক মুঠা আবীর লইয়া দুইজনের মুখে মাখাইয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় অমনি আবেশভরে বাম হস্তে গোপালের কটি

বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তটি অপূর্ব ভঙ্গিতে নাড়িয়া নাড়িয়া নাচিতে লাগিলেন। ঘন ঘন হরিধ্বনি পুরমহিলাগণের আনন্দসূচক উলুধ্বনি কীর্ত্তনস্থলীকে এক অপূর্ব্ব ভাবস্রোতে ভাসাইয়া দিল। সেদিনের সে নৃত্য কীর্ত্তনলীলা দর্শকগণের প্রাণে বহুদিন ব্রজলীলার স্মৃতিকে জাগরূক রাখিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে একদিন সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্যকারী গোপালকে যেন একটি ব্রজ-বালিকা বলিয়া মনে হইতেছিল। প্রায়ই কীর্ত্তনাবেশে গোপালের ভাবান্তর ঘটিত, যাঁহারা ভাবুক তাহারাই উহা লক্ষ্য করিতেন। গোপাল সহজে কাহাকেও কিছু জানিতে বা বুঝিতে দিতেন না।

আর একবার রাসের সময় গোপালের বিশেষ ভাবান্তর সকলকেই বিস্মিত করিয়াছিল। দেশে তখন নিয়ম ছিল, প্রতি বৎসর বাঁশের দ্বারা গোলাকৃতি রাসমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঠাকুর বসাইয়া ঘুরান হইবে। সেই ব্যবস্থামত এক-মানুষ-সমান একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল। তাহার পর যথানিয়মে পূজাদি করিয়া সেই মঞ্চের উপর ঠাকুর বসানো হইল। সকলে জয়ধ্বনিসহকারে গান করিতে লাগিল আর পূজক সেই মঞ্চের দড়ি ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। এবার পুরোহিত ঠাকুর কোন কারণে আসিতে পারেন নাই, তাই গোপালের খুল্লতাত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই পূজা করিতে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ; তাই নিয়ম রক্ষার্থ দুই-একবার ঘুরাইয়া গোপালের উপরই ভার দিলেন। গোপাল খুব আনন্দের সহিতই এই সেবা গ্রহণ করিলেন। ধীরে ধীরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে গোপাল যেন কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িল। এমনভাবে ঘুরাইতে লাগিলেন যে, সকলেই ভয় পাইলেন, পাছে ঠাকুর পড়িয়া যায়। গোপালের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, সেই সময় গোপাল সুর করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের রাসের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিল : ঘুরাইবার নিয়মিত সময় অতীত হইলেও গোপালের মুখে লালীবর্ণন শ্লোকগুলি এত মিষ্ট শুনাইতেছিল যে, কেহ তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিতেও পারিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে খুড়া মহাশয় এক প্রকার জোর করিয়াই গোপালের হাত ধরিয়া থামাইয়া দিয়া ঠাকুরকে নামাইয়া যথানিয়মে একশত আট কলসী জলে স্নান ও অভিষেক প্রভৃতি করিয়া পূজোর অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিলেন।

এদিকে গোপাল আবিষ্ট ভাবে রাসলীলার ব্যাখ্যা করিতে করিতে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নানাপ্রকার শুশ্রুষার কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে — কথায় কথায় তাহাকে ঐরূপে করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। গোপাল ধীরভাবে বলিল, "আমি যেন কোথার কোন্ এক সুসজ্জিত উদ্যান মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের

নৃত্যবিহার দেখিতেছিলাম; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গোপীনৃত্য করিতে করিতে যুগলকে ঘিরিয়া মহানন্দে হর্ষধ্বনি করিতেছে, গান করিতেছে। তারপর হঠাৎ সে লীলা অন্তর্দ্ধান হওয়ায় আমি যেন কেমন অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। অতঃপর যে কি ঘটিয়াছে তাহা কিছুই আমি বলিতে পারিব না।'

একবার জন্মাষ্টমীতে গোপাল উপবাসী ছিল, রাতে পুরোহিত ঠাকুর পূজা করিতেছেন আর গোপাল একবারে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া পূজা দর্শন করিতেছে। পূজা হইয়া গেল, ঠাকুর মহাশয় ব্রতের কথা শুনিবার জন্য সকলকে ডাকিলেন। পুরুষ ও বালকগণ একদিকে বসিল, স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ পূজোর ঘরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় সারিবদ্ধ ভাবে বসিল। পুরোহিত ঠাকুর ব্রতের কথা বলিয়া মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন। যেখানে কংসের কারাগারে দেবকীকে আশ্রয় করিয়া শ্রী ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন, এই প্রসঙ্গ আসিল। সেই সময় সকলেই লক্ষ্য করিল যে, গোপাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে পাশে পড়িয়া গেল। অনেকেই মনে করিলেন, বুঝি সারাদিন উপবাসী থাকায় ক্লান্ত হইয়া গোপাল ঘুমাইয়া ঐ ভাবে পড়িয়া গেল। কিন্তু কিছু সময় পরেই কান্না শুনিয়া এবং গড়াগড়ি দিতেছে দেখিয়া একজন ছুড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। গোপালের বাহ্যস্মৃতি নাই, কেবল "তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারিবসুদেবজঃ" এই কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ বলিতেছে। পুরোহিত মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলা বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোপাল যতই লীলাগুণ শুনিতেছে, ততই আনন্দভরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধ বলিতেছে। বৃদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, "গোপাল সাক্ষাৎ লীলা দর্শন করিতেছে, ধন্য ওর জীবন।" বহু সময় এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগবন্ধুর চেষ্টায় গোপাল প্রকৃতিস্থ হলে পুরোহিত ঠাকুর অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই বৎসরেই শিবরাত্রির সময় গোপাল উপবাসী থাকিয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে "হর হর বোম্ বোম্"। এই কথা কয়টি বলিত। খুলতাত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিতেছেন। গোপাল নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঐ ধ্বনি "হর হর বোম্ বোম্"। খুড়া মহাশয়ের সহিত একাসনে বসিয়াই গোপাল সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। উপবাস এবং রাত্রিজাগরণেও সকাল বেলায় তাহার মুখশ্রী মলিন দেখাইল না। বরং মুখে চোখে এমন উজ্জ্বল জোতি প্রকাশন পাইল যে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কোন দেবদেবীর উপরই গোপালের অশ্রদ্ধার ভাব ছিল

না। পরবর্তী সখী-জীবনেও এ ভাব সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গোপালের বাল্য-জীবনের প্রতিটি কার্য এই ভাবেরই ছিল। পরবর্তীকালে নবদ্বীপে বাগান বাড়ীতেও সকল দেবদেবীর অর্চ্চনা উপযুক্ত লোকের দ্বারা করাইত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—

"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্টভক্তি বর।।

এই বাক্যের আদর্শ গোপাল কি পূর্ব্বাশ্রমে, কি পরবর্ত্তী সখী-জীবনে নিজে আচরণ করিয়া দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ গোপালের এই সর্ব্বদেব-আরাধনায় আপত্তি করিয়া বলিতেন, উহাতে প্রেম লাভ হয় না। ইঁহারা ঠাকুর মহাশরের উক্তি "সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্ট ভক্তি বর" এই পংক্তিটির কিরূপ ব্যাখ্যা করিবেন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভাব ও প্রেম কাহারও একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি না, আমরা তো ইহাই জানি। ছোট বড়, উত্তম অধম, উচ্চ নীচ, কোন বিচারই তাহার কাছে নাই, "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম' শুদ্ধ চিত্ত পাইলেই প্রকাশ পায়। কোথায় কোন ভাগ্যবান কি ভাবে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, কে বলিতে পারে? ভক্তকবি গাহিয়াছেন—

'প্রেম কি সকল ধাতে সয়।
প্রেমের গড়ন মন না হলে
প্রেম কি তাতে বয়

প্রেম যুক্তি জানে না, প্রেম মুক্তি মানে না
প্রেম নিক্তি ধরে ছোট বড় ওজন করে না;—
প্রেমে পাপ পূণ্য সমান গণ্য
করে দুঃখে সুখে সমন্বয়।।
প্রেমের ধর্ম্ম চমৎকার
প্রেমের মর্ম্ম বোঝা ভার
প্রেম জড়েতে চৈতন্য দেখে আলোকে আঁধার;
প্রেম নিরাকারের আকার দেখে
আবার সাকার দেখে শূন্যময়।।"

তবুও যেন রসিক কবির আশা মিটিতেছে না, তাই আবার বলিলেন—

'প্রেমের জন্ম ধরাতে
ধরা দেয় না ধরাতে

প্রেম বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখে ধূলিমুঠিতে;
প্রেম বিন্দু, মাঝে সিন্ধু, দেখে
বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময়।।"

সুকণ্ঠ গায়ক শচীনন্দন দাস বাবাজী মহাশয়ের মুখে একবার একটি গান শুনিয়াছিলাম—

"প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তার থাকে না জ্ঞান আত্মপর।।
প্রেম এমন রত্নধন কিছু, নাইক তার মতন
ইন্দ্রপদও তুচ্ছ করে প্রেমিক হয় যে জন,
থাকে আত্মানন্দে সদাই মগন
তার হৃদয় জুড়ে সুধাকর।
প্রেমিক চায় না কো জাতি চায় না সুখ্যাতি
ভাবে, হৃদয় পূর্ণ হয় না ক্ষুন্ন রট্‌লে অখ্যাতি,
ও তার হস্তগত সুখের চাবি
আর থাকবে কেন অন্য ডর।।
প্রেমিকের চাল্‌টি বেয়াড়া যত বেদবিধি ছাড়া
আঁধার কোণে চাঁদ গেলেও তার মুখে নাই সাড়া;
ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও
আস্‌মানেতে বানায় ঘর।।"

প্রেমিকের মহান চরিত্র আলোচনা করিতে হইলে একটা বিশিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া করিতে হয়। শাস্ত্রের ভাষায় ইহাকে তত্ত্বতঃ দেখা বলে। এই তত্ত্বতঃ দেখা সকল বিষয়ে না ঘাটিলেও মহতের চরিত্র আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন; কারণ মহতের জীবন-চরিতের মধ্যে সত্য, শিব ও সন্দুরের শাশ্বত মূর্ত্তি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত। তাহা দেখিতে, বুঝিতে এবং অনুভব করিতে হইলে একটা বিশিষ্ট প্রেক্ষণভূমি বা বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা তাহা করি না, তাই মহাত্মাগণের বাহ্যিক আচরণ দেখিয়াই তাহার সমালোচনা আরম্ভ করি।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় অল্প কিছু, সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইলেই সে উতলা হইয়া উঠে। গোপালের কিন্তু তাহা ছিল না। গোপাল ছিল অত্যন্ত চাপা স্বভাবের। তাহার মনোগত ভাব সহজে প্রকাশ করিত না, ভাবের কথা তো নয়ই। সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ দেখিয়া সঙ্গীগণ যদি বিশেষ কিছু জানিতে চাহিত, তাহা হইলে গোপাল তাহাদিগকে অতি সহজ কথায় বলিয়া দিত,

"ও সব কিছু নয়, ও আমার চিত্তের দূর্ব্বলতা।" যদি কোন ক্ষেত্রে ইহার বেশী কিছু বলিতে হইত, তাহা হইলে ভঙ্গী করিয়া বলিত—

"পুতুলবাজির পুতুল আমি।
যেমন নাচায় হৃদয়স্বামী।।
তেমনি নাচি তেমনি গাই।
(ও সব) আমার কিছু জানতে নাই।।' ইত্যাদি

এই ভাবের কত কথাই যে কতদিন গোপালের মুখে দিয়া বাহির হইয়াছিল তাহার অন্ত নাই। সবগুলি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয় নাই, জানি না ভবিষ্যতে কেহ এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন কিনা!

এ তো গেল ভাবের কথা : তর্কে ও গোপালকে পরাস্ত করা বড় সহজ ছিল না। গোপাল তর্কস্থলে যেটিতে 'হাঁ' বলিবে সেটিকে 'না' করিবার সাধ্য অনেকেরই ছিল না। অনেক সময় তর্কে পরাস্ত হইয়া কেহ কেহ তাহাকে বলিত "তর্কভুড়্ভূড়ি।" গোপাল তাহাতে কোনরূপে অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "তবু ভাল, বিনা পরিশ্রমে পড়াশুনো না করিয়াই একটা এতবড় উপাধি লাভ হইল।" কলিকাতায় থাকিবার কালে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর সহিত এক-একদিন পাঠ্য বিষয় লইয়া তর্ক উঠিত। দীনবন্ধুর সহধর্ম্মিণী উভয় ভ্রাতার আহার্য্য দ্রব্য সাজাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কে আহার করিতে আসিবে? দুইজনেই তর্ক" সমুদ্রে মগ্ন। ক্রমে রাত্র অধিক হইতেছে দেখিয়া আহার্য্য দ্রবা ঢাকা দিয়া সেই স্থানেই পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিতেন। এমনও অনেক দিন হইয়াছে, যখন দীনবন্ধুর স্ত্রী নিদ্রাভঙ্গ হইত, তখন পূর্বদিক প্রভাতের অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুই ভাইয়ের তর্ক তখনও থামে নাই, সমান ভাবেই চলিয়াছে। কোনরূপে ইঙ্গিতে রাত্রি-প্রভাতের সংবাদ জানাইলে আলো নির্ব্বাণ করিয়া দুই ভাই বাহিরে আসিত। ভবানীপুরে চক্রবেড় রোডে, কানাইলাল সেনের বাগানে অবস্থানের সময় এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

গোপালের বেশভূষা, আচার ব্যবহার, আহারাদি সমস্তের ভিতরই বৈরাগ্য ভাব মিশ্রিত ছিল। তথাপি কাহারও সে কথা মুখে বলিবার উপায় ছিল না। বলিলেই অমনি নিজের ভোগবিলাসের মত বড় ফৰ্দ্দ দিয়া বলিত, "একে কি আর বৈরাগা বলে ? যার প্রতিটি কার্য্যে বৈরাগ্য ভাব লক্ষিত হয়, সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, শুধু কথায় বৈরাগ্য অবৈরাগ্যের লক্ষণ।' এই বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণের বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে ভুলাইয়া দিত। মোট

কথা, গোপাল নিজ আচরণকে প্রকাশ করিতে মোটেই উৎসুক ছিল না।

একবার গ্রামের সকলে মিলিয়া পুরাণো বাড়ীর আটচালার একটি আলোচনা-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী দুই-একটি গ্রাম হইতেও অনেকে সভার যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর উমেশচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মালোচনার কালাকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উপস্থিত জনগণ প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় নবাগত এক ভদ্রলোক উঠিয়া অনেক কিছু, বলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার আলোচনায় কেহই সন্তুষ্ট নয় দেখিয়া গোপাল ধীরে ধীরে উঠিয়া সেই ভদ্রলোককে বলিল, ''বাল্যকাল হইতে এই যে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ শুনিয়া আসিতেছি — 'ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ' এটা কি মিথ্যা?'' ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়া একেবারে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন, 'ধর্ম্মালোচনার কোন প্রয়োজনই নাই, তার আবার কালাকাল কি?' সভামধ্যে খুবই গোলমাল উপস্থিত হইল। কয়েকজন প্রবীণ লোকের চেষ্টায় লোকটিকে বসাইয়া দেওয়া হইল; অনুসন্ধানে জানা গেল অত্যধিক গঞ্জিকা সেবনে লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে এইরূপে যাহা খুশি বলিয়া বেড়ায়।

যাহা হউক; গোপালকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য কয়েকজন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় গোপাল উঠিয়া বলিল, ''ধর্মালোচনা অবশ্যকর্তব্য এবং সেজন্য কালাকালের বিচার করিলে চলিবে না। কাহার কখন ডাক আসিবে, কেহ কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? কাজেই, 'গৃহীত ইব কেশেষু, মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ'।'' সভামধ্য হইতে ''ঠিক ঠিক, সত্যই তো, গোপাল ঠিক কথাই বলিয়াছে'' এই ভাবের উক্তি হইতে লাগিল। গোপাল সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ''আমরা তো ধর্ম্মালোচনার কথা বলি, মৃত্যু কেশোকর্ষণ করিয়া আছে, এই মনে করিয়াই ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে বলিয়া লক্ষ্য লক্ষ উপদেশ দেই; এ কি কেবল বক্তার মুখে মুখে বা পুঁথিতেই থাকিবে? নিজ নিজ জীবনে আচরণের দ্বারা কি দেখাইতে হইবে না?'' সভা নিস্তব্ধ, কেহই কোন কথা বলেন না। গোপাল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, ''শাস্ত্রকার নানাভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, প্রথমে নির্জ্জনে নিজে সাধন ভজন করিয়া জ্ঞানালোকের সম্মান পাইতে হইবে। সেই আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করিতে হইবে, তারপর জনসমাজকে সেই আলো দেখাইতে হইবে। কিন্তু আজকাল ঠিক ইহার বিপরীত দেখা যায়। নিজে কিছু করিব না, অপরকে খুব বড় গলায় উপদেশ দিব। এইটিই এখন সচরাচর দৃষ্ট হয়। 'পরোপদেশবেলায়াং ও সর্ব্বে ব্যাস-সমদ্বিজঃ।' অপরকে উপদেশ দিবার সময় আমরা এক একটি

ব্যাসদেব হইয়া বসি। আপনারাই বলুন দেখি, সে উপদেশ কি কখনও কার্য্যকরী হয়? জগৎ ভোগবিলাসের মোহে অচৈতনা, অসম্ভবের স্বপ্নে বিভোর, উপদেশ দিবে কাহাকে ? শাসন-বাক্য কাণে তুলিবে কে ? আগে লোককে চৈতন্য দিতে হইবে, তবে তো সে উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্য শুনিবে। আমাদের নিজেদেরই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই; শুধু তোতাপাখীর মত মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া যাই। প্রয়োজন হইতেছে আদর্শের। মনে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সাধনপথে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিবে, ততই তোমার উপর লোকের দৃষ্টি পড়িবে; তাহারা তোমার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ শ্রবণ করিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া অগ্রসর হইবে। শুধু পরকে বলিলে চলিবে না, নিজেকেও কিছু কিছু কাজ করিতে হইবে। তারপর ধর্ম্মবিশ্বাসের তুল্য পবিত্র জিনিষ জগতে আর কিছু নাই। প্রীতি বল, বিবেক বল, শ্রদ্ধা বল, সকল বৃত্তিগুলিই এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের সুশীতল ছায়ায় উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত। যতদিন এই পবিত্র ভাবকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে না পারিবে, ততদিন হাজার উপদেশ, শত শত শাসন বাক্য শুনিলেও কিছু হইবে না, শুনাইলেও কিছু হইবে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্মালোচনার ভঙ্গী সকলের স্মরণ করা উচিৎ। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় এ অতি খাঁটি কথা।' এই ভাবের বহু কথা সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে গোপাল বলিয়াছিল। সভাস্থ সকলেই গোপালের সুযুক্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল ভাবের আলোচনা পদ্ধতির ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেদিনের সেই বক্তৃতা শ্রবণে গৈলার জনৈক ভদ্রলোক এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গোপালকে কন্যাসম্প্রদান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ লইয়া গোপালের জনৈক বন্ধুর সহিত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বন্ধুটি গোপালের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতেই গোপাল বলিল, "না ভাই, আমাকে আর ও বন্ধনে বাঁধিস নি, দোহাই তোদের।' বন্ধুটি ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন, "কেন? বিবাহ করা কি খারাপ?"

গোপাল বলিল, "ভাই! ঘৃত খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু অজীর্ণ রোগী ঘৃতকে বিষের মত ভয় করে। দুধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন এ সবই খুব পুষ্টিকর খাদ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে উদরাময় রোগে ভুগিতেছে, তাহার তো ঐসকল স্পর্শ করাও উচিত নয়। আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির বিবাহ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। বিবাহ ব্যাপারটাকে আমি মোটেই খারাপ বলি না। মনুষ্যসমাজে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ সংস্কার। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, 'সুস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"। সমাজ-শঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখিয়া সৎপথে জীবন-স্রোত-সঞ্চালনের যথেষ্ট সহায়তা

বিবাহ করে বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে একান্ত দৃষ্টি রাখিয়া নিতান্ত শরণাগত হইয়া চলিবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা না হইলে সংসারে পরস্পরবিরোধী ঘটনাচক্রের আলোড়ন বিলোড়ন ঘূর্ণিবায়ু-বিতাড়িত তৃণখণ্ডের মত লাঞ্ছিত, তাড়িত ও বিমর্দ্দিত হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আস্থি ভিরস্থীণি মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচাত্বম্।' বিবাহের মন্ত্রেও আছে। যদেতদ্‌হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' এসকল কথা তো শুধু মুখে বলিলে হইবে না ভাই! এই সকল তত্ত্ব যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি থাকা চাই। আমি যে ভাই বড়ই দুর্ব্বলচিত্ত। সাধনভজনেরও কোন জোর আমার নাই। যাঁহার সুখে দুঃখে সমবোধ হইয়াছে, হৃদয় পাত্রটি যিনি ভগবৎ প্রেমরসে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাসই বা কি আর সংসারই বা কি, উভয়ই তাঁহার নিকট সমান। আমার যে কোন সম্বলই নাই, আমি যে সম্পূর্ণ অনধিকারী, আমাকে তোমরা বিবাহ বন্ধনে বন্ধ করিতে চেষ্টা করিও না—এইটাই আমার বিনীত নিবেদন।

গোপালের যুক্তিপূর্ণ অথচ বিনয়নম্র বচনে বন্ধু তো নয়ই, কন্যাপক্ষের লোকও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা গোপালকে সাধুবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

প্রতিষ্ঠার লোভে লোক হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। কিন্তু এমন লোকও ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ প্রকৃতপক্ষেই তাহার নিকট উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও সে তাহা তাহার নিজ প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। গোপাল এই ধরণের লোক। পরবর্তী সখী-জীবনের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু বাল্যকালে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত জানিবার সুযোগ-সুবিধা অনেকেরই হয় নাই, আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই কিছু কিছু বলিব।

একবার গ্রাম্য দেবী ঁকালীমাতার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে সমাগত জনমণ্ডলী গোপালের নিকট মায়ের মহিমা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোপাল নানাবিধ শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণ দ্বারা একটি ছোটখাট বক্তৃতার মত দিয়াছিল। শুনিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গোপালের বহুমুখী প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারপর নানা জনে নানা ভাবে মায়ের নামকীর্ত্তন করিয়া উৎসব সমাপন করেন। এই বক্তৃতার পর গোপাল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আসকাঠির এক চক্রবর্তী ঠাকুরের সহিত কিছু আলোচনা করিয়াছিল। চক্রবর্তী ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন,

"ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্যকে প্রধান বলা হয় কেন ?" গোপাল বলিল, "আপনি পণ্ডিত, আপনাকে শাস্ত্রের কথা শোনানো আমার শোভা পায় না; আমি আপনার নিকট বালক, তবে আলোচনার জন্য আচার্য্যগণের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে পারি মাত্র।"

চক্রবর্তী—অত ভনিতার প্রয়োজন নাই, তুমি বল।

গোপাল — পরমকরুন সর্ব্বশক্তিমান শ্রী ভগবান আপন লীলাভঙ্গীতে এই প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃষ্ট জগতের মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ, তৎসমূহের মধ্যে নিজ শক্তির বিকাশ বিভিন্নরূপে রাখিয়াছেন। যে যে বস্তুতে শক্তিবিশেষের আধিক্য দেখা যায়, সেই সেই বস্তুকে শক্তি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে এবং সত্যদর্শী ঋষিগণের উক্তি আলোচনা করিলে সৃষ্ট যাবতীয় জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র মনুষ্যকেই দিতে হয় কেন না, মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানশক্তির উৎকর্ষতা আর কোন জীবে নাই। কিন্তু এই জ্ঞানশক্তির উৎকর্য তার সহিত অজ্ঞানশক্তির বা মায়া-শক্তির প্রাধান্যও মনুষ্যে কম লক্ষিত হয় না। এই জনাই মানুষ আপন স্বরূপ ভুলিয়া মায়ার হাতে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করে। শ্রীগুরুকৃপায় অকপট ভক্তি-বিশ্বাসের অধিকারী হইয়া ভজন-সাধনের দ্বারা মানুষ যদি এই মায়া-শক্তি বা অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ হয়; তবেই তাহার সকল দুঃখের অবসান হয়। অনেক কারণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিবার এটিও একটি কারণ।

চক্রবর্ত্তী—গুরুকৃপা সকলের উপর হয় না কেন?

গোপাল—শুধু মুখে বলিলেই তো হইবে না, গুরুকৃপালাভও ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ; এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

চক্রবর্ত্তী—একই মনুষ্যজাতির মধ্যে ভজনের বিভিন্ন পন্থা কেন, মানুষের নিত্যকর্ম্ম কি?

গোপাল—পূর্ব্বজন্মার্জিত সুকৃতি বলে তাহার কাহার অজ্ঞান-শক্তির আবরণ আদৌ থাকে না, ইঁহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ বলা হয়, ইঁহারা ভগবানের নিত্য সহচর এবং স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তিসম্পন্ন বলিয়া কোন বিধি-নিষেধের গাণ্ডীতে আবদ্ধ নন। ইঁহারা যে ভাবের আচরণ করিবেন, তাহা কোন বিধির মধ্যে ধরা পড়িবে না। আবার কেহ কেহ এত লঘু অজ্ঞানাবরণে আবৃত যে, উহা অনায়াসেই বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ইহারা ভগবৎপ্রেম-তরঙ্গে এমন আপ্লুত হইয়া পড়েন যে, কোন বিধি-নিষেধের বশীভূত না হইয়া নিজ নিজ অনুরাগানুসারে ভজন করিতে থাকেন। এই ভাবের ভজনকে রাগমার্গের

ভজন বলা হয়। আর এক শ্রেণী দেখা যায় আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ অধম জীব। ইঁহাদের ভজন উপরোক্ত দুইটি পন্থার কোনটিতেই চলিবে না, ইহাদিগকে বিধি অনুসারে খুটিনাটি প্রত্যেকটি আচরণ করিয়া তত্তৎকালোচিত ভগবল্লীলাদির স্মরণ-মনন করিতে হইবে। না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়—ইহাই শাস্ত্রের শাসন। যেটি করা অবশ্যর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়, তাহাতেই শাস্ত্রকার নিত্যকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিত্যকর্মে অবহেলা করিতে নাই। একেই মন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাতে আবার সাংসারিক কর্ম্ম প্রেরণায় উহা শতধা-সহস্রধা বিভক্ত হইয়া কোন্ গভীরতম অন্ধকার গর্ভে লইয়া যাইতেছে তাহার ঠিক নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য অসীম রূপে, অটুট স্বাস্থ্য, বিলে ভোগবিলাস প্রভৃতি পার্থিব কোন কিছুই মনের যথার্থ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। কাজেই চঞ্চল মন আরও চঞ্চল হইয়া এটা ওটা সেটা করিয়া বেড়ায়। এই চঞ্চল মনকে শান্ত করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্যগণের নির্দ্দেশিত বিধি অনুযায়ী চলিবার অভ্যাস করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এইটিই প্রথম এবং প্রধান সোপান—অবশ্য আমাদের পক্ষে। যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

বিধি অনুযায়ী পথে চলিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত ভজন-সাধনে একান্ত নিষ্ঠাসহকারে লিপ্ত থাকিয়া মন-মধুকরকে যদি কোন রকমে একবার সেই পদপঙ্কজের সন্ধান দিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে আর এটা ওটা সেটা করিয়া বেড়াইবে না। ভ্রমর যেমন মধু আহরণের জন্য গুনগুন করিয়া এফুল ওফুল করিয়া বেড়ায়, কিন্তু মধুযুক্ত প্রস্ফুটিত পুষ্প প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার চঞ্চল পক্ষবিক্ষেপ এবং গুন্‌গুন্ ধ্বনি বন্ধ হইয়া যায়, সে নীরব নিস্পন্দ ভাবে মধুপানে বিভোর হয়, সেইরূপে মন-মধুকরও পদপঙ্কজের মধুপানে বুঁদ্ হইয়া যাইবে, আর 'ইহা চাই' 'উহা চাই' করিবে না।

চক্রবর্তী মহাশয় গোপালকে আলিঙ্গন দিয়া ভাব গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুর। একদিন তোমার বেশভূষা ও আচরণ দেখিয়া 'এত অল্প বয়সে জ্যাঠানি' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলাম। তোমার ভিতরে যে এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, এমন অকাট্য যুক্তিপূর্ণ অথচ অতি মলায়েম ভাব রহিয়াছে, তা তো সেদিন বুঝিতে পারি নাই! পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য কোথায়? 'পণ্ডা বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধি' কৈ, কিছুই তো অনুভব হইল না, কেবল নাই নাই, খাই খাই, চাই চাই—এই করিয়াই তো জীবন শেষ হইয়া গেল। দীর্ঘ দিন অনভ্যাসের ফলে এবং পারিপার্শ্বিক বিষাক্ত আবহাওয়ায় ধর্ম ভাব, ধর্ম আলোচনা,

সাত্ত্বিক আচারব্যবহার সবই যেন মানুষ ভুলিতে বসিয়াছে। এ সময় তোমার মত দুই-চারিজন আদর্শ যুবক যদি প্রাচীন ভাবধারার প্রচারে মনোযোগী হয়, তাহা হইলে জগতের মঙ্গলই হইবে। আমি সবমঙ্গলা জীবকল্যাণ বিধায়িনী মা জগদম্বার নিকট তোমার প্রচেষ্টার সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া জীব-কল্যাণ বিধান কর।"

কিছুদিন পরে একদিন গোপাল কয়েকটি বন্ধুর সহিত বাটাজোড় বাজার হইতে বাড়ীতে আসিতেছিল। মহিলাড়ার পুলের নিকট আসিয়াছে, এমন সময় একটি মধ্যবয়সী লোক আসিয়া গোপালকে প্রণাম করিল। গোপাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, "আমার বাড়ী এই মাহিলাড়া গ্রামে; আমি জাতিতে বৈদ্য, হরিসেনার বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়রা আমাদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সেদিন হরিসেনায় গিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আপনার অমূল্য উপদেশ শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। আপনার উপদেশে আমায় বহুদিনের ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।। আমি শত চেষ্টাতেও এতদিন যে আনন্দের বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই, আপনার কৃপায় এখন আমি সর্ব্বদাই আনন্দময়ীর নামে আনন্দরসে ডুবিয়া আছি। আপনি আমার পথপ্রদর্শক গুরু।"

গোপাল—বাবা! তোমার জীবনের উন্নতি আনন্দলাভ সবই তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল, আমার কথা বা উপদেশ নেই উন্নতির নিমিত্ত মাত্র। ভাবিয়া দেখ, আমার বক্তব্য বিষয় তো তুমি একা শোন নাই। একই সময় একই কথা অনেকের কাণেই গিয়াছে, কিন্তু সেই একই কথা বিবিধ ব্যক্তি দ্বারা বিবিধ প্রকারে গৃহীত হইয়াছে। তোমার সাধনার ফলে তোমার মন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছে। ইহাতে আমার কি কোনও কৃতিত্ব আছে ? অকপটে নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত ভজন কর, নাম কর, সর্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখিও তিনি যে চিরমঙ্গলময়, এই বিশ্বাস হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক রাখিলে তোমার মঙ্গল হইবে।

লোকটি যতই বলে "আপনার দয়াতেই আমার এইরূপে হইয়াছে," গোপাল ততই নিজেকে তফাৎ রাখিয়া বলে, "আমার দয়ায় নয়, সেই দয়াময়ের দয়ায়।" কথায় কথায় লোকটি বলিয়া ফেলিল, "আমার দয়াময় আপনি।" গোপাল অমনি জিভ কাটিয়া বলিল, "ছি ছি, জীবে ভগবৎবুদ্ধি আরোপ করিতে নাই, উহাতে অপরাধ হয় জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" সকল ক্ষেত্রেই গোপাল এইভাবে নিজেকে কোনরূপে ধরা-ছোঁয়া না দিয়া কাজ করিয়া সরিয়া পড়িত কখনও কাহারও নিকট ভুলিয়াও নিজের কোনরূপে কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করে নাই। আমরা

সচরাচর দেখিতে পাই নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া দশজনের একজন হইবার জন্য কত হুড়াহুড়ি, কত মারামারি। সাধন-ভজন যেন প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই। গোপালের সুদীর্ঘ জীবনে এ ভাবের কোন আভাস কোনদিন কেহ পাইয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

সংসার করাটাকে গোপাল সত্য সত্যই যে মনে প্রাণে ভয় করিত, এমন কি তাহার জন্য শ্রীভগবানের নিকটও যে মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিত, তাহার একটি ঘটনার বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

গোপালের পিতা খুবই দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের উদারতা এত বেশী ছিল যে, সেই উদারতা দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া দিতেন। প্রকৃত ধনরত্ন তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেমধনে ছিলেন তিনি মহাধনী। বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি হইত, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আর ঠাকুরের সেবাপূজা যতটুকু অপরের দ্বারা না করাইলে নয়, তাহা করাইয়া অন্য সমস্তই নিজে করিতেন। সামান্য আয়োজনে পূজো হইত। অভাবের জন্য দেবীর শ্রীঅঙ্গে অন্য সকলের মত বিশেষ কোন আভরণও দিতে পারিতেন না। কিন্তু ভক্তিভাবপূর্ণ সেবা দ্বারা দেবীর এমন রূপে তিনি প্রকট করাইতেন যে, শ্রীমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেহ নয়ন ফিরাইতে পারিত না। যেন প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিগ্রহ। কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, ছোট বড় যে আসিয়া প্রতিমা দর্শন করিত, সে-ই বলিত "কি সুন্দর। একবার অষ্টমী পূজার দিন গভীর নিশীথে সন্ধিপূজা হইতেছে। সকলে সাধ্যমত পূজার আয়োজনে ব্যস্ত; গোপালকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সকলে মনে করিল, হয়ত গোপাল গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছে। এদিকে সন্ধিপূজার সময় আগত দেখিয়া গোপালের পিতাঠাকুর মহাশয় পূজার ঘরে গিয়াছেন। দেখেন, একধারে স্থিরভাবে পদ্মাসনে বসিয়া গোপাল চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া করজোড়ে দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ভাব দেখিয়া মনে হইল, গোপালের বাহ্যজ্ঞান নাই। পিতাও তাহার ভজনে কোনরূপ বিঘ্ন কিছু না হয় এমন ভাবে আসনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল গোপাল বলিতেছে, "মা মহামায়া! আমার মায়ার জড়াস্ না মা। আমার মনের দরজার পাছে কোন মায়াবী আসিয়া দাঁড়ায়, তাই মা তোর কাছে এই ভিক্ষা চাই—সদানন্দময়ীরূপে আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই তুই বিরাজ কর। স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয়স্বজন পরিপূর্ণ ঘরে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিলে তোর প্রেমের ভাণ্ডারের সন্ধান কেমন করিয়া মিলবে মা? তাই

বলি, সর্ব্বদুঃখহরা জ্ঞানদায়িনী সদানন্দময়ী মা! অধম সন্তানকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিস, না। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর্।' বোধহয় আরও কত কি বলিত, কিন্তু তন্ত্রধারাক মহাশয় রূঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বসে রইলে কেন? সময় হয়েছে, আচমন কর।" অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; গোপালও চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল। সন্ধিপূজার কার্য্য সমাধা হইলে গোপাল পুনরায় প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

গোপালের বৈরাগ্যভাব, আহার-বিহারে সংযম এবং পূজাহ্নিকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখিয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কেহ কেহ গোপালকে সময় সময় উপদেশ দিতে আসিত। কিন্তু গোপাল তাহাদের সঙ্গে কোনরূপে অসৎ ব্যবহার না করিয়া তাহার ভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র ব্যবহারে অতি সহজে দুই-চার কথাতেই তাহাদের উক্তি খণ্ডন করিয়া বিদায় দিত। একদিন পার্শ্ববর্ত্তী বিল্বগ্রামের জনৈক ভদ্রলোক বিশিষ্ট দুই-চার জন সঙ্গীর সহিত বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বলিতে সঙ্কোচ হয় তথাপি প্রসঙ্গক্রমে না বলিয়া পারিলাম না। ভদ্রলোক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, সেদিন যে কারণেই হউক নেশার মাত্রাটা একটু বেশী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়াই রাস্তা। ভদ্রলোক এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে বহির্ব্বাটিতে গিয়া একটি শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় গোপাল চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অন্ধকারে গায়ে ঢাকা দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছিল। ভদ্রলোকটি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কে?"

গোপাল—আমি গোপাল।

ভদ্রলোক—ওখানে অন্ধকারে কি করছ?

ভদ্রলোকের সঙ্গীগণ যেন একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন, "আঃ, চলুন না আপনি বাড়ী ও ওর বাড়ীতে বসে যাই করুক না তাতে আপনার কি, ও ওখানে বসে ভজন করছে।"

নেশাখোর লোকের স্বভাব কোন কার্য্যে বাধা পাইলে সেই কার্য্য করিতেই ঝোঁক চাপে। লোকটিরও তাহাই হইল, সে তো গেলই না, বরং এক পা দুই পা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকট আসিয়া একটু ব্যঙ্গস্বরেই গোপালকে বলিল, "ও আমার সাধক ঠাকুর! সাধনার ধনের সন্ধান পেয়েছ?"

গোপাল—ধনের সন্ধান পেলে কি এখানে বসে থাকি?

লোকটি—বাবা! কেন জীবনটাকে ভোগে বঞ্চিত করে অমন করে শুকিয়ে মরছ? খাও দাও মজা মার, অন্ধকারে বসে মশার কামড় খেয়ে লাভ কি ?

গোপাল হাসিরা ফেলিল। লোকটি যেন সে হাসিতে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া একটু রুক্ষ স্বরেই বলিলেন, "আমার কথা বুঝি তোমার ভাল লাগল না, তাই হেসে উড়িয়ে দিলে? কেন বাবা, ভোগবিলাস ছেড়ে অমন করে হা-হুতাশ করে মরছ ?"

এখানে একটু বলিয়া রাখি, লোকটি গোপাল অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থাতেও বহুবার গোপালের নিয়ম-নিষ্ঠা, সাত্ত্বিক আচার-ব্যবহার এবং নানারূপে কঠোরতা দেখিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন ; আজ যদিও নেশার মুখে, তথাপি উপদেশ দিবার লোভ ছাড়িতে পারেন নাই, তাই ঐভাবের নানা কথা নানাভঙ্গীতে বলিতেছেন।

গোপাল ভদ্রলোকটির কথায় কোনরূপে বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করিয়া বেশ ধীরভাবেই বলিলেন, "আপনি তো অনেক কিছু; ভোগ করেছেন, বর্তমানেও করছেন, বেশ আনন্দ পাচ্ছেন তো?" লোকটি একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আনন্দ পাচ্ছি বৈকি; তবে তুমি কোন্ আনন্দের কথা বলছ, তা যে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

গোপাল—যে আনন্দের অবধি নাই: ভোগের পরও যে আনন্দে অবসাদ আসে না, বরং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ব্যাকুলতা বেড়েই যায়, আমি সেই জাতীয় আনন্দের কথাই বলছি।

লোকটি যেন কেমন একটু চমকিয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় উঠিবার সিড়িতে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ এবারও একটু বিরক্তস্বরে "আঃ, চলুন না" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিল। ভদ্রলোক বাধা দিয়া "আঃ" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। ভাব দেখিয়া মনে হইল, নেশার ঝোঁক যেন একটু একটু করিয়া কাটিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা নরম সুরে বলিলেন, "আচ্ছা, এই যে তোমাদের আনন্দ, এর একটু আস্বাদ আমাকে দিতে পার?"

গোপাল—আমার তো দেবার সামর্থ্য নাই। তবে শাস্ত্রকারগণ বলেন, সাধুসঙ্গ করলে এই আনন্দের কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আচার্য্যগণের মুখে শুনেছি—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোটীকল্প হয় যদি অল্প সাধুসঙ্গ।
সকল বন্ধন টুটে তার দুঃখ যায় পায় প্রেমানন্দ।।"

ভদ্রলোকটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে ঠাকুর! শুধু ভ্রমিতে ভ্রমিতেই যদি জীবন কেটে গেল, তাহলে আর লাভ হল কি জীবনে?"

গোপাল—সেও তো ভাল, বিপথে কুপথে না ঘুরে সৎসঙ্গ লাভের জন্য

যদি একটা নিদিষ্ট পথে ঘোরা যায়, শেষ পর্যাপ্ত আর কিছু না হলেও কিছুটা পথ তো এগিয়ে রাখা যায়। জীবন তো এইবারের মতই শেষ নয়, আস্‌তে তো আবার হবেই, তখন এইখান থেকে না হয় যাত্রা শুরু করা যাবে। আর তা না করে কেবলমার ভোগ-বিলাসের পথে ঘুরে জীবন কাটালে পরে কি হবে ভাবুন দেখি। আর কেন, জীবনের বেশীর ভাগই তো এইভাবে কাটালেন, এবার চলার মোড়টা একটু ফিরিয়ে নিন্। বাকী দিন কটা এইসব ন্যাকারজনক ভোগবিলাসের পথ পরিত্যাগ করে তাঁর নাম করতে করতে একটু একটু অগ্রসর হবার চেষ্টা করুন। আমার কথার বিশ্বাস করুন, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। সাধুদের মুখে শোনা যায়, অশুভ কর্ম্মের ফল সাময়িকভাবে ভাল হলেও তা কখনই করণীয় নয় ; তার প্রতিক্রিয়া আছেই আছে এবং ভবিষ্যতে তাতে অশুভ ফল ফলবেই। ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতে একটু চেষ্টা করেই দেখুন না। এতে লোকশান মোটেই নেই, প্রচুর লাভেরই সম্ভাবনা। পুনঃ পুনঃ গর্ভজন্ত্রণাভোগ যে কি অসীম অসহনীয় কষ্ট, তা কি একবারও ভাবা উচিত নয়?

লোকটির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই, কিঞ্চিৎ বলি, —ইঁহার অত্যাচারে অধীনস্থ কর্মচারী হইতে সাধারণ প্রজারাও বিশেষভাবে প্রপীড়িত হইত। এমন কি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরীহ লোককে খুন করিতেও ইনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। লোকটি যে কত বড় পাষণ্ড তাহা গোপালের মনে পড়িল। তাই সে পুনরায় বলিল, "আমার কথায় রাগ করিবেন না। অসহায় দুর্ব্বলকে হত্যা করে বা তার উপর পীড়ন করে মানুষ সত্য-সত্যই আপন হৃদয়বৃত্তিকে কলুষিতই করে। এই নির্লজ্জ বৃত্তির পরিহার কি মানবনামধারী জীবের অবশ্য কর্তব্য নয়? আর কেন, এই সর্ব্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি করে জীবন-জনম ধন্য করুন। আপনি সম্ভ্রান্তবংশীয়, আমার মনে হয় আপনার সৎ আদর্শে" দেশের ও দশের মঙ্গলই হবে।"

কি জানি কোন্ সুকৃতি বলে গোপালের এই মিষ্টমধুর চাবুকে আজ ভদ্রলোকটির প্রাণে সাড়া জাগাইল। লোকটি নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে মাথা নীচু করিয়া সমস্ত কথা শুনিলেন এবং কি জানি কার প্রেরণার হাত জোড় করিয়া গোপালকে প্রণাম জানাইলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া গোপাল একটু হাসিয়া বলিল, "আমার কথায় কি রাগ করলেন?" লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "না ঠাকুর, রাগ করি নি, তবে আজ আর বিশেষ কিছু বলতে পারব না, কারণ আমার মাথা যেন কি রকম করছে, আজ উঠি. যদি ভাগ্যে থাকে তবে সময়মত আর

একদিন এসে তোমার সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব। আগে থাকতেই বলে রাখি নেশাখোর বলে আপত্তি করলে চলবে না।" এই বলিয়াই গোপালের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গীদের সহিত সেদিনের মত তিনি বিদায় লইলেন। বলাবাহুল্য, তাহার কয়েক দিন পরেই লোকটি গোপালের নিকট আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে তিনি পবিত্রভাবে গড়িয়া তুলিলেন; তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গোপালের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিত, "গোপাল ঠাকুর সাধারণ মানুষ নয়, এমন দস্যু মাতালটাকে দেব-চরিত্র করে দিল।" এইভাবে বহু স্থানে বহু প্রকারে গোপাল নিজের আচরণ দ্বারা দুষ্কৃতকারীকে পবিত্র করিয়া দিয়া সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই সত্য প্রমাণ করিয়া দিয়া ছিল।

একদিন গ্রামের অনেকেই ব্যাটাজোড় বাজারে যাত্রা শুনিতে গিয়াছে, দৈবক্রমে সেদিন পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিতে গোপালও বাটাজোড়ে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় পথে গ্রামবাসীদের সহিত দেখা হওয়ায় তাহাদের আগ্রহে গোপালও যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। যাত্রা শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া গোপাল যেন কেমন হইয়া গেল। কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্তা বলে না, কখনও বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া 'হায় হায়' করিতে থাকে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'হায় হায়, কি হল, কি দেখলাম, কি শুনলাম।" পুরাণ-বাড়ীর মণিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিলে গোপাল বলিল

"রাজনন্দিনী প্যারীর পায়। রাজার নন্দন গড়াগড়ি যায়।।
চায় না ফিরে কয় না কথা। কি বলব সে দুঃখের কথা।।
(তবু) কত ভাবে কত সাধা। মুখে তুলে চায় না রাধা।।
হায় হায় হায়।"

তখন সকলে বুঝিতে পারিল যে, "মানভঞ্জন" পালা শুনিয়া গোপালের অমন হইয়াছে। অনেকদিন পর্যন্ত গোপালের এই ভাব ছিল। এই সময় গোপাল প্রায়ই একটি পদ গান করিত, পদটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি আমরা পদাবলী হইতে উক্ত পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ত্যাজি কালোবরণ করিব ধারণ তোমার অঙ্গের কান্তি।
তব নাম করি আকুল হইয়া অশ্রুজলে হব শান্তি।।
মিলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইবে যখন অচেতনে রব পড়ি।।
যবে ভেবে ভেবে তব ভাব হবে স্বভাব ছাড়িবে দেহ।
ত্যাজি বংশীধর হব দণ্ডধর রাখিতে নারিবে কেহ।।

অমূল্য রতন তব প্রেমধন অযাচকে দিব আনি।
'বীরচন্দ্র' কয় তবে সে খালাস হইবে প্রেমের ঋণী।।"

যখন যে ভাবে গোপাল থাকিত, তখন সেই ভাবের পদ পদাবলী বা সংস্কৃত শ্লোক অথবা স্তোত্রাদি সর্ব্বদাই গোপালের মুখে শোনা যাইত। তন্মধ্যে তাহার স্বকৃত পদও বহু ছিল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দুই চারিটি ছাড়া বেশী সংগ্রহ করিতে পারি নাই; কারণ অনেক অনুসন্ধানেও তাহার স্বহস্তলিখিত খাতাখানির সন্ধান পাইলাম না। মনে হয় উহা তাহার কোন বন্ধুর নিকট ছিল, এতদিন বিশেষভাবে খোঁজ না করায় হয়তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিংবা নিজের নামে কেহ তাহা চালাইয়া দিয়াছে। সংসারাশ্রমে থাকাকালীন তাহার ব্যবহৃত বহু জিনিষ এইভাবেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এজন্য অপরের দোষ দিয়া নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলে ভুল হইবে। আমাদেরও এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষ কোন যত্ন ছিল না। যাহাই হউক, যিনি যে ভাবেই হউক তাহার জিনিষ ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ করুন, তাহাতেই তাহার আনন্দ হইবে—এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

গ্রাম্যদেবী পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি, নাম সিদ্ধেশ্বরী। শ্রীমূর্ত্তি আকারে খুব বড় নয়, কাজেই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তিনি সেবাগ্রহণ করেন। যখন যে বাড়ীতে যাঁহাদের পালা পড়ে, তখন সেই বাড়ীর লোকেরাই সেবার কার্য্য করিয়া থাকেন। গোপালের পিতৃদেব এবং বড় ও মেজ ভাই সকল সময় বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না। পটুয়াখালিতে কয়েক ঘর যজমান শিষ্য থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ভাই জগদ্বন্ধুকে লইয়া পিতৃদেব সেইখানে থাকিতেন, আর দীনবন্ধু বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিদেশে বিদেশেই বেশী সময় থাকিতেন। কাজেই দেবসেবার ভার গোপালের উপরই পড়িয়াছিল। অবশ্য এজন্য গোপাল বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নয়, বরং বিশেষ আনন্দিত। কারণ গোপালের আবাল্য ধারণা ভগবৎসেবা, ভগবানে বিশ্বাস, নিয়মিতভাবে উপাসনা এইসব কর্ম্ম ব্যতীত মানুষের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার আর কিছু নাই। "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ' গোপাল একথা শুধু পুস্তকে পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নিজ আচরণের দ্বারা জগৎকে দেখাইয়া দিতে চায়। কাজেই গোপাল যে কোন প্রকারে দেবসেবার সুযোগ পাইলেই আনন্দিত হইত। ঠাকুর সেবার কাজ ছাড়া এ সময় গোপাল সংসারের অন্যান্য কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারিত না। সময়মত সেবার আয়োজন কেহ করিয়া দেয় ভাল, নচেৎ নিজেই পরমানন্দে ঠাকুরের বাসন মাজা, জল তোলা, চন্দন ঘষা, ফুল তোলা, এমন কি মধ্যে মধ্যে ভোগ-রান্না নিজে করিয়া লইয়া

ঠাকুরসেবা করিত।

আজ একাদশী, অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ একটা বিশেষভাবে সেবাপূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই অতি প্রত্যুষেই গোপাল বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছে; কিছু ফুল তুলিয়াছে, এমন সময় গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত একজন নমঃশূদ্র জাতীয় লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, গত রাত্র হইতে গুরুমহাশয়ের ভেদবমি হইতেছে। শুনিয়া গোপাল সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা ? লোকটি বলিল, "ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সারা রাত্রির মধ্যে তিনি যান নাই। সকালবেলায় পুনরায় ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, এতক্ষণে গিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।" গোপালের ফুল তোলা বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ফুলের সাজি ঠাকুরঘরের মধ্যে রাখিয়া ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "আমি তোমার চলন্তবিগ্রহের সেবায় যাচ্ছি, যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ শুকিয়ে থাক, আর যদি পার তবে নিজের সেবার জোগাড় নিজে করে নিও।" বলা-বাহুল্য সেদিন বাড়িতে এক গোপাল ছাড়া ঠাকুরসেবা করিবার মত অন্যকেহ ছিল না। কিন্তু আজ গোপালের সেদিকে চিন্তা করিবার অবসরই হইল না, উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া লোকটির সহিত গুরুমহাশয়ের গৃহাভিমুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, অবস্থা খুবই খারাপ, বোধ হয় দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। আরও শুনিল যে, অবস্থা সুবিধাজনক নয় বলিয়া বিশেষ কিছু ঔষধের ব্যবস্থাও করা হয় নাই, তাহা ছাড়া বাড়ীর লোক অর্থের সংস্থানও নাকি করিতে পারে নাই।

ডাক্তারবাবুর কথা শনিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া গোপাল তাঁহাকে বলিল, —"ডাক্তারবাবু! পয়সার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি যথাযথ ঔষধের ব্যবস্থা করুন। উপস্থিত এই নিন, পরে আর যাহা প্রয়োজন হয় আমি দিব।" এই বলিয়া গোপাল নিজের হাতের স্বর্ণঙ্গুরীটি খুলিয়া ডাক্তারবাবুর হাতে দিল। প্রথমে ডাক্তারবাবু, উহা গ্রহণ করিতে একটু ইস্ততঃ করিলেও গোপালের আগ্রহাতিশয্যে শেষে উহা গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোপালের ঐকান্তিক সেবাযত্নে এবং শ্রীভগবানের অপার করুণায় সে যাত্রা গুরুমহাশয় রক্ষা পাইলেন। শুনিয়াছি, গুরুমহাশয় সুস্থ হইয়া গোপালকৃষ্ণকে টাকা দিতে চাহিলে গোপাল গুরুমহাশয়কে বলিয়াছিল,—"আপনি আমার প্রথম জ্ঞানদাতা, তাহা ছাড়া আপনি অসহায় অবস্থার অসুস্থ হইয়াছিলেন; এ অবস্থায় কি একটু; সেবা করিবার অধিকারও আমাকে দিবেন না ? ও পয়সা

তো আমি আপনাকে দিই নাই, আমি দিয়াছি ডাক্তারকে। আর সেবার জন্য যদি কিছু দিয়াই থাকি, তাহাতে হইয়াছে কি? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।'

গ্রামে তখন বড়লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু দুঃখীর দুঃখে তাঁহাদের প্রাণে কোন সাড়া জাগিত না। আত্মীয় কুটুম্ব ভরণে তাঁহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহার প্রয়োজন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন না। শ্রীভগবানের উপদেশ—"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়"। এ কথায় কান দিবার অবসর তাঁহাদের হইত না। কেবল 'তেলা মাথায় তেল' দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন, অথচ অপর কেহ কিছু করিলে তাহার সমালোচনায় এক একজন পঞ্চমুখ হইতেন। তাই গোপালের এই প্রকার জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে নিঃস্বার্থ সেবার সমালোচনাতেও তাঁহারা পশ্চাদ্‌পদ নন। কত ভাবের কল্পিত কথা তুলিয়া কেহ কেহ গোপালের নিন্দা করিতেন। আবার কেহ কেহ বলিতেন কাজটা মন্দ নয়, তবে বড় বাড়াবাড়ি। এই সব নিন্দা বা সুখ্যাতি কোনটাতেই গোপাল বিচলতি হইত না। কেহ সুখ্যাতি করিলে গোপাল বলিত—"আমি আর কি করেছি! যা করা স্বাভাবিক, মানুষ যা করলে নিজের পরিচয় দিবার যোগ্য হয়, আমি তো তাও করতে পারিনি।" আবার কেহ নিন্দা করিয়া কিছু বলিলে গোপাল হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিত, "কি করব ভাই! স্বভাবে করায় কর্ম্ম, ভাল মন্দ নাহি জানি।" বিদ্রূপের সুরে কেহ কেহ বলিত, 'গোপাল। লেখাপড়া শিখেছ, কাজের কাজ কর; ওসব ভূতের বেগার খেটে কি হবে ?" গোপাল পূর্ব্বের মতই হাসিতে হাসিতে বলিত, "পাঁচটা ভূতের বেগার সকলে দেয়, আমি না হয় তার ওপর আর একটা বেশী করে দিই।' মোট কথা কোন প্রভাবেই কেহ গোপালের পরোপকারবৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্তে করিয়া রাখিতে পারে নাই। সখীবেশ ধারণের পরও ইহার প্রত্যেক কার্য্যটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, নিজের কোনরূপে সুখ-সুবিধার প্রতি ইহার দৃষ্টি ছিল না। কিসে অপরে সুখী হইবে, সেই চিন্তাই ছিল অহরহঃ। আমরা সর্ব্বদাই আত্মসুখ প্রয়াসী, তাই অপরকে তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিলেই সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিই।

গোপালের পিতৃদেব একদিন গোপালকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,— "বাবা! তোমার উপর দেখ-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার ভার দিয়া আমি বিদেশে নিশ্চিন্তে থাকি। কিন্তু আজ কয়েকদিন যাবৎ মধ্যে মধ্যে মনে একটা সন্দেহ জাগিয়েছে। তুমি এখনও অদীক্ষিত। উপনয়ন-সংস্কারের পর দীক্ষিত হইলে আর

কোন দেব-দেবীর পূজোয় বাধা থাকে না ইহাই শাস্ত্রবিধি। যদিও তোমাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, তথাপি আমার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, আর তুমি অদীক্ষিত অবস্থায় থাক। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে বল আমি শ্রীগুরুদেরকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া তোমার দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিই।”

গোপাল—বাবা! সেদিন সর্ব্বজ্ঞ বাড়ীর তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের এক আত্মীয় কথা-প্রসঙ্গে ‘আমি দীক্ষিত নয় অথচ দেবীর পূজো করি’ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ‘অদীক্ষিত অবস্থায় দেবীপূজা নিষিদ্ধ। তাঁহার নিকট সেই কথা শুনা অবধি আমারও মনে কেমন সন্দেহ জাগিয়াছে—তবে কি সেবা করিয়া আমি অপরাধী হইতেছি? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই। আজ আপনি যখন এ প্রসঙ্গ তুলিলেন, তখন ভালই হইয়াছে, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই করুন।

গোপালের কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, “বৎস! তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন, অদীক্ষিতের দেবীপূজোয় অধিকার নাই। কিন্তু তোমাদের জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্যবশে কুলদেবীর প্রত্যাদেশ আছে যে, তোমাদের গোত্রে উপনয়ন-সংস্কার হইলেই কুলদেবীর পূজা করিতে পারিবে। দেশাচার বা কোনরূপ বিধিনিষেধ তাহাতে খাটিবে না। মায়ের আর একটি আদেশও আছে, সেটিও তোমাদের জানিয়া রাখা বিশেষ দরকার। সে আদেশটি হইল এই যে, কোনরূপ অশৌচ হইলেও তোমরা তোমাদের নিত্যসেবা করিতে পারিবে, কিন্তু বাহিরে অন্য কাহার নয় বা নৈমিত্তিক পূজার্চ্চনাদি করিতে পারিবে না। সে যাহাই হউক, এখন তোমার যখন সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, তখন তোমার দীক্ষাগ্রহণে আপত্তি কি।”

গোপাল আপত্তি করিবে কেন? সে তো তাহাই চায়। উপনয়ন-সংস্কারের পর অল্পদিনের মধ্যেই বহুবার গায়ত্রী মন্ত্রের পুনশ্চরণ করিয়াছে, জপতপেতেই তো সে মগ্ন থাকিতে ভালবাসে। যাহা পাইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার কত আনন্দ! আবার যদি দীক্ষামন্ত্র লাভ হয়, সে তো পরম সুখের বিষয়। তবে গোপাল একটি কথা পিতা- ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিল, “আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার নিকট হইতে আমি মন্ত্র গ্রহণ করি।” পিতাঠাকুর প্রথমে আপত্তি করিলেন, কিন্তু গোপালের যুক্তিপূর্ণ তর্কে কোন আপত্তিই টিকিল না। ১২৯৪ সালে ঁদুর্গাপূজার পর ঁকালীপূজার দিন পিতৃদেবের নিকট হইতে গোপালের দীক্ষামন্ত্র লাভ হইল। এখন আর গোপাল বাহিরের কাজকর্ম্মে বিশেষ মন দিতে পারে না। সদানন্দময়ী সিদ্ধেশ্বরীদেবীর আরাধনাতেই তাহার অনেক সময়

অতিবাহিত হয়। এমনও অনেক সময় দেখা যাইত যে, গোপাল বিশেষ আগ্রহ সহকারে অপরের পালার সময়েও আনন্দচিত্তে নিজে দেবীর পূজার ভার লইয়া অতি যত্নসহকারে পূজাদি করিত।

ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া খেলাধূলা করিতে গোপাল খুব ভালবাসিত। একবার গ্রামের বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলে মিলিয়া একটি খেলার দল করিল। তাহাতে ব্যাটবল, ফুটবল, কপাটি, দাড়িয়াবান্দা (এ দেশে বলে গিজো) প্রভৃতি খেলা হইত। ছেলেদের অভিভাবকগণ এ সকল খেলাধূলোয় বিশেষ মত দিতেন না। কিন্তু ছেলেরা গোপালের নিকট উৎসাহ পাইয়া দ্বিগুণ আগ্রহে খেলাধূলা করিতে লাগিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত গোপালকেও তাহারা দলে মিশাইয়া লইল। অভিভাবকগণের অনেকেই এজন্য গোপালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গোপাল বেশ যুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে, এই খেলাধূলা বালকদের জীবনরক্ষার টনিক। যে ব্যক্তি যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, মধ্যে মধ্যে একটু এ জাতীয় টনিক ব্যবহার না করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। দেহ মন তাহাদের ভাঙিয়া পড়ে, বিশেষতঃ ছেলে-বয়সে। লেখাপড়ায় যেমন একদিকে জ্ঞানার্জ্জন হয়। অন্য দিকে দেহের ক্ষয়ও যে না হয় তাহা নহে, সেই ক্ষয় পূর্ণ হয় এই সকল খেলাধূলার মধ্য দিয়া। এই ভাবের নানাপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া গোপাল অভিভাবকগণকে সমস্ত করাইত। অপর দিকে ছেলেদের এই সকল খেলাধূলার মধ্য দিয়া নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সকল কাজের শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ছেলেরা গোপালকে দলপতিরূপে পাইয়া খুবই খুশী, গোপাল ও ছেলেদের লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মধ্যে মধ্যে খেলিতে যাইত। হতভাগ্য লেখক গোপালের ছোট ভাই, পাঠকগণ এ পরিচয় পূর্ব্বে একটু পাইয়াছেন। বয়স খুব কম, তথাপি কি জানি কেন নিজের ভজনসাধনের সময়ও যেমন কাছে ডাকিয়া অনেক কিছু, করাইয়া লইত, খেলাগুলোর সময়ও ভাইটিকে সঙ্গছাড়া হইতে দিত না। বলাবাহুল্য, অল্প দিনের মধ্যেই গোপাল অনেক কিছু আমাকে শিখাইয়াছিল। গোপাল একদিকে যেমন আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপরদিকে তেমন শিক্ষাগুরুও বটে। অতএব এখন থেকে আর করিত যাইত না বলিয়া করিতেন যাইতেন বলিব।

বাল্যকাল হইতেই সকল কাজে গোপাল অগ্রণী, কিন্তু কার্য সমাধা হইলে যশের ভাগী সকলকে করাইয়া নিজে সরিয়া দাঁড়াইতেন। কেহ কাজ করিতে না চাহিলে গোপাল যে কোন প্রকারেই হউক তাহাকে অপরের কৃতকর্ম্মের অংশীদার দাঁড় করাইয়া সকলের নিকট প্রশংসা করিয়া তাহাকে এমন করিতেন

যে, সে লোক শেষে লজ্জার পড়িয়া কাজে যোগ দিত। এসকল কৌশল পরবর্তী সখী-জীবনেও আমরা বহু, সময় লক্ষ্য করিয়াছি।

হাটে বা বাজারে যাহাদের দ্রব্য অবিক্রিত থাকিত, তাহা ভাল না হইলেও গোপাল ন্যায্য মূলো দিয়া লইয়া আসিতেন। কেহ কিছু, বলিলে গোপাল তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন, "ও তো বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল; কেউ যদি আমরা না কিনি, তাহা হইলে ওর জিনিসগুলির কি গতি হইবে?" এই ভাবের উক্তি ছিল তাঁহার সকল কাজে। তাই ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে উদার হৃদয় বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। দেশে অবস্থানকালে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাই যে ঘটিয়াছিল, কত জনগণমনমুগ্ধকর অথচ শাস্ত্রসঙ্গত কথাই যে গোপালের মুখে দিয়া যাহির হইয়াছিল; তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। সকলগুলি সংগ্রহ করা এখন আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু পাইয়াছি তাহা দিয়া দিলাম। বর্ণনের দোষ বা ভাষার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পাঠকগণ রসাস্বাদনে তৃপ্ত হউন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

এইবার আমরা গোপালের পিতাঠাকুর মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন এবং সেই সঙ্গে গোপালের পরবর্তী কার্যাবলীর কিছু কিছু আলোচনার চেষ্টা করিব। পিতাঠাকুর যখন মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর অন্বেষণে হরিসেনা হইতে বাহির হন, তখন গোপাল বাড়ীতে ছিলেন না। বাংলা ১৩০১ সালের ৩রা বৈশাখ রবিবার বৈকালে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হন, সেদিন নক্ষত্র ছিল মঘা। ব্রাহ্মণ সব জানিয়া শুনিয়াও কেন যে এমন দিনে যাত্রা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আত্মীয়স্বজন যাঁহারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই এমন অ-দিনে অ-ক্ষণে যাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন। গোপালের মাতাঠাকুরাণী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীন লেখক বহু, কান্নাকাটি করিল; কিন্তু কিছুতেই ব্রাহ্মণের মতের পরিবর্তন হইল না। কিছু সময় ধীরভাবে বসিয়া নিজ ইস্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, জল নাই ঝড় নাই হঠাৎ পার্শ্ববতী বাগানের একটি কলাগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এরূপ দুর্ঘটনায় সকলেই আশু অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অচল অটল। একবার একটু দাঁড়াইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং পুনরায় "দুর্গা দুর্গা দুর্গা" তিনবার বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ সকলেই পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ একবারের জন্যও পিছু ফিরিয়া দেখিলেন না। দৃষ্টির অন্তরাল হইলে সকলেই বিষন্ন মনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে দীনবন্ধু হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, এখনও স্বতন্ত্র বাসা ঠিক করেন নাই, অধ্যাপক কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কালীঘাট হাউলির বাগানস্থিত বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। এই সময় পিতাঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহ স্টেশনে রেল হইতে নামিয়া ব্রাহ্মণ পদব্রজেই কালীঘাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি কিন্তু দীনবন্ধুর কলিকাতায় আগমন কিংবা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। দেশের বহু লোক কালীঘাটে থাকেন; কাজেই অপর সকলে যেমন করে, তিনিও তদ্রূপ কালীঘাটে যাইয়া কোনও পরিচিতের বাড়ীতে উঠিবেন—ইহা মনে করিয়াই শিয়ালদহ হইতে ঐদিকে যাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়াছে। এমন সময় ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের নিকট উপস্থিত। এদিকে দীনবন্ধুও কি জানি কেন কালীঘাট হইতে পদব্রজেই ধর্মতলার দিকে যাইতেছেন। উভয়ের মিলন হইল ঠিক বাজারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। পিতাঠাকুর প্রথমে দীনবন্ধুকে চিনিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর দেহের ও-পোষাক পরিচ্ছদের অনেক পরিবর্তন তখন হইয়াছিল। গেরুয়া রঙের একটা আল্‌খাল্লা গায়ে, মোটা মোটা তুলসীর গোল মালা গলায় ঝোলানো, মাথায় বড় বড় চুল, অল্প অল্প গোঁপ দাড়ি উঠিয়াছে, দেহের গঠন রোগা। দীনবন্ধু প্রথম দর্শনেই পিতৃদেবকে চিনিতে পারিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পিতাঠাকুরকে একটু ইতস্ততঃ হইতে দেখিয়া করজোড়ে বলিলেন,—"বাবা! আমাকে বোধ হয় ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না। আমি আপনার অধম সন্তান দীনবন্ধু।" ব্রাহ্মণ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। দীনবন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দুইটি চক্ষের জলে তাঁহার মস্তক সিক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। পিতা-পুত্রের অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্যে দেখিতে পথচারীরা চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কিছু সময় পরে একটু স্থির হইয়া দীনবন্ধুকে বলিলেন, —"বাবা দীনবন্ধু! আমি একটি বৎসর গঙ্গাতীরে বাস করিবার মনস্থ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি। পীঠস্থান কালীঘাটে থাকিব এবং এই খানেই জীবনের শেষ দিন কয়টা কাটাইয়া দেহ ত্যাগ করিব, এইটিই আমার বাসনা। বহুদিন তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া কালীঘাটে যাইতেছিলাম। এভাবে যে তোমাকে পাইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। পরম করুণাময় শ্রীভগবান যখন হারানিধিকে পথের মাঝেই মিলাইয়া দিলেন, তখন আমার মনে হয় মনোবাসনা আমার অপূর্ণ থাকিবে না, এখন তুমি যাহা করিলে ভাল হয় কর।"

দীনবন্ধু ধীরভাবে মাথা নীচু করিয়া পিতৃদেবের কথা শুনিতেছিলেন। সমস্ত শুনিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

দুইজনে রাস্তা পার হইয়া সোজা পশ্চিমমুখে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন। গঙ্গার ধার দিয়া যে রাস্তা কালীঘাটে গিয়াছে, সেই পথে চলিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, বাবা খুবই ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া গঙ্গার ধারেই একটা খোলার ঘরের বারান্দায় দুইজনে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। সেই সময় একটি স্ত্রীলোক গঙ্গা হইতে জল লইয়া যাইতেছিল: দীনবন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! এখানে কোন ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি ? স্ত্রীলোকটি উহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—বাবাঠাকুর ? আপনি যে ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন, ঐ ঘরই ভাড়া দেওয়া হবে। আপনি বসুন, আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি। আমি বাবার বাড়ীতেই কাজ করি।"

একটু পরেই বাড়ীর মালিক আসিলেন। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল, মাসিক ২।।০ আনা ও ।।০ আনা মেথরের দরুণ দিতে হইবে। এইরূপ ঠিক করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদেবকে লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর ভাবনা কি, বাবাকে ঘরে বসাইয়া সংসার পত্তনের আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। বাংলা ১৩০১ সালের ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার দীনবন্ধুর কলিকাতায় স্থায়ীবাসের সূত্রপাত হইল।

কয়েকদিন একাই দীন বন্ধু পিতার সেবাশুশ্রূষা করেন; পিতা লক্ষ্য করিলেন, দীনবন্ধুর কষ্ট হইতেছে। তাই দেশ হইতে বধূমাতাকে আনিবার জন্য দীনবন্ধুকে আদেশ করিলেন। দেশে সংবাদ দেওয়া হইল। ১৩০১ সালের ২১শে আষাঢ় বুধবার গোপালকৃষ্ণ দীনবন্ধুর স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন দুই ভাই ও দীনবন্ধুর স্ত্রী—এই তিন জনে মিলিয়া মনের সাধে পিতৃদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেবার সৌভাগ্য বেশী দিন ইহাদের ভোগ হইল না। ঐ বৎসরেরই ১৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় সজ্ঞানে বসন্তরোগে পিতৃদের দেহত্যাগ করিলেন। লীলাময়ের কি যে লীলা বুঝা যায় না। ১৩০১ সালটি ভট্টাচার্য্য পরিবারের একটি স্মরণীয় সাল হইয়া থাকিল।

প্রায় এক বৎসর গঙ্গাতীরে বাস এবং পিতৃদেবের আকাঙ্ক্ষিত অতিপ্রিয় পীঠস্থান কালীঘাটে দেহত্যাগরূপ যে সঙ্কল্প লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল দেখিয়া উভয় ভ্রাতাই বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিলেন। তবে দীনবন্ধুর স্ত্রীর মনে একটু ক্ষোভ রহিল যে, বেশীদিন সেবার সুযোগ তিনি পাইলেন না। বিধির বিধান কে খণ্ডায়? এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে—

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে।।'

যথা সময় বন্ধুগণের সহিত কেওড়াতলা শ্মশানে পিতৃদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে দুই ভাই রওয়ানা হইলেন। এবার গোপাল কেমন যেন ধৈর্য্য হারাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। দীনবন্ধু নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ভাইকে শান্ত করিলেন। শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দুই ভাইকে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। বেদান্তবাগীণ মহাশয়ের বাড়ীর তিন চার জন যুবক সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুই ভাই একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া দাহকার্য্য দর্শন করিতেছেন আর নানা বিষয় আলোচনা করিতেছেন। গোপাল প্রসঙ্গক্রমে দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদু ভাই! মরণের হাত থেকে কি কেহই রেহাই পায় না?' দীনবন্ধু জানেন ভাই অজ্ঞান নয়, তথাপি এ জাতীয় প্রশ্ন করায় সে যে পিতৃশোকে বিশেষ মুহ্যমান হইয়াছে, তাহা বুঝিয়াই স্নেহ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"না ভাই ! মরণের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই! মৃত্যু শুধু মানবের নয়, দেহধারী মাত্রেরই স্বাভাবিক পরিণতি। তবে কারও বা দুদিন পূর্ব্বে আর কারও বা দুদিন পরে। যারা সমাজ জীবনে কি ধর্ম্মজীবনে কিছু বৈশিষ্ট্য রাখিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁদের জীবনাবাসানের বহু, পরেও ঐ সব কার্য্যের আদর্শ অনুকরণীয় হয়ে থাকায় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'। "যাঁদের কীর্ত্তি থাকে, তাঁরা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও চিরকাল অমর হয়েই থাকেন।" শ্মশান বন্ধুগণের আহ্বানে উভয় ভ্রাতার আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভাবের আলোচনা দুই ভাইয়ের প্রায়ই হইত। এই সব আলোচনার মর্ম্মার্থ অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীকালে দীনবন্ধু 'ভক্তি' নামে মাসিক পত্রিকায় "ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ" নামক প্রবন্ধে অনেককিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। গোপাল দাদার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট যখনই যাহা শুনিতেন তাহার মধ্যে যেগুলি ভাল লাগিত সেগুলি নিজের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। গৃহত্যাগের পর গোপালের সংগৃহীত অন্যান্য জিনিষের সহিত সেগুলিও দীনবন্ধু, পুরীধামে গোপালকে দিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্মশানের কার্য্য শেষ করিয়া দুই ভাই বাসার ফিরিলেন এবং যথাসময় দেশে যাইয়া একাদশ দিনে খুব সাধারণ ভাবে পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার আর পূর্ব্বের বাসায় না থাকিয়া ঐ কালীঘাটেই আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এ সকল বিস্তৃতভাবে 'দীনবন্ধুর জীবনী'তে আলোচনা করা হইয়াছে। গোপাল এই সময় কালীঘাট নিবাসী পণ্ডিত বনমালী বিদ্যারত্ব মহাশয়ের নিকট কিছুদিন কাব্য ও অলংকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, গোপালের সাংসারিক জীবনের পরিবর্তন এই সময় হইতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দীনবন্ধুর স্ত্রী শ্রাদ্ধের সময় দেশে যাইতে পারেন নাই, কারণ তখন তিনি সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁহাকে একা বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের এক পুত্র গোপালের সহাধ্যায়ী ছিলেন, কাজেই সেখানে থাকিতে কোনরূপে অসুবিধা হয় নাই। বিশেষতঃ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে বলিয়া তাঁহাদিগের ও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইত। আটমাসে দীনবন্ধুর স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া বিশেষ অসুস্থ হওয়ার এবং ঐ বাড়ীতে সকলের সংকুলান না হওয়ায় দীনবন্ধু বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে কিছু খালি জমির খাজনা করিয়া লইয়া গোলপাতার ঘর করিয়া কিছুদিন বাস করেন। নানা কারণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে বাসাও ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে ১৬/২ নং নর্থ চক্রবেড় রোডে কানাই সেনের বাগান বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছিল। এই বাড়ীতে থাকাকালীন ভবানীপুর অঞ্চলে দীনবন্ধুর নাম খুব প্রচার হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ তদানীন্তন জজ স্যার রমেশচন্দ্র মিশ্র মহাশয় বিশেষভাবে দীনবন্ধুর গুণমুগ্ধ হন। অন্যান্য নানা প্রকারের লোক তখন নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে দীনবন্ধুর নিকট যাতায়াত করে। তাহার উপর সভা সমিতিতে পাঠ-বক্তৃতার তার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হয়। কাজেই গোপালের উপরই তখন সংসারের যাবতীয় কার্য্যের ভার।

এই বাড়ীতে থাকিবার সময়েই আর একবার সকলকে দেশে যাইতে হইয়াছিল। কারণ, একাদশ দিনে কোনরকমে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধের কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তিন মাস পরে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণ করিয়া বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ এই সময় করিয়াছিলেন। এই সময় গোপালের দৈহিকশক্তির পরিচয় কিছু কিছু সকলে পাইয়াছিলেন। গোপালের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখিয়া অনেককেই অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি যে, এসব কাজ গোপাল করে না, কোন দৈবশক্তি উহার উপর ভর করিয়া কাজ করাইয়া লয়। বহু ঘটনা গোপালের জীবনে ঘটিয়াছে। তার মধ্যে এই ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই আশ্চর্য হইয়া একবাক্যে গোপালের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাটিই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি।

বাংলা ১৩০২ সাল, ৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ভোজ্যান্ন-নিমন্ত্রণে এক সঙ্গে

কয়েক শত লোক বাড়ীর প্রকান্ড উঠানে ভোজনে বসিয়াছেন। শুধু গ্রামের না, বহু দূর-দূরান্তর হইতেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। এত জনসমাগমের একটি কারণ ছিল। কিছুদিন যাবৎ সামাজিক কোন কারণবশতঃ একটা দলাদলি চলিতেছিল। গোপালের অক্লান্ত চেষ্টায় উভয় দলের লোকই একত্র মিলিত হইয়াছেন এবং এইখানে বসিয়াই সেই দলাদলির মীমাংসা হইয়াছে। কাজেই উভয় দলের লোকই আজ একত্রে ভোজনে বসিয়াছেন। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত সমস্ত বিষয়ের তদারক করিতেছেন। সকলেরই চিন্তা আবার না কোন গোলমাল হয়। উপযুক্ত পরিবেশকের দ্বারা পরিবেশন হইতেছে, কিন্তু জল পরিবেশনে অসুবিধা হওয়ায় একটু গোলমাল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ছোট একটি পাত্রে করিয়া জল লইয়া দুই-চারজনকে দিয়াই পুনরায় জল আনিতে যাইতে হয়। পরিবেশকের এই অসুবিধা গোপাল লক্ষ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া গিয়া জলের জালাটি মেয়েদের কলসী লইবার ভঙ্গীতে কক্ষে তুলিয়া লইয়া জল-পরিবেশকের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাত্রটিতে তখনও প্রায় একমণ জল রহিয়াছে। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল; কিন্তু গোপালের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, নির্বিকার চিত্তে জলের জালা কক্ষে করিয়া জল-পরিবেশকের পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমন্ডলী নির্ব্বক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সকলে দেখিতে লাগিল যে, জল-পরিবেশক জলের জালা হইতে আবশ্যকমত জল তুলিয়া লইয়া পরিবেশন করিতেছে।

গোপালের চেহারা খুব মোটাসোটা ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া কেহ কেহ হিমাচলের সহিত তুলনা করিতেন। ঐদিনই আংটা দেওয়া বড় বড় গামলায় করিয়া জল পরিবেশন এবং দেড়মণি হাঁড়ি অনায়াসে নামাইয়া ভাতের মাড় ফেলা প্রভৃতি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় উচ্ছিষ্ট পাতা গোপাল নিজ হস্তে পরিস্কার করিয়াছিলেন। দুই-চারজন তাহাতে আপত্তি করিলে গোপাল তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘‘আমার পূজনীয় পিতৃদেবের কার্য্যে যাঁহারা উপস্থিত হইয়া কৃপাপূর্বক কিছু; গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেহই হউন না কেন সর্ব্বথা আমার পূজ্য। তাঁহাদের সেবা করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে বলিয়া আমি মনে করি।’ হায় হায়! সেদিনের কথা স্মরণ হইলে আজ কালকার ভাব দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করা ছাড়া আর কিছু উপায় দেখি না।

গোপাল যেটি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, অপরের নিন্দা বা স্তুতি

কিছুতেই তিনি তাহা ত্যাগ করিতেন না। কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া গোপালকে কখনও কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর বা কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ করিতে কেহ কখনও শুনে নাই। যে সময়ের কথা আজ আমি আলোচনা করিতেছি, সে সময় সহর বা সুদূর পল্লী অঞ্চলেও বর্তমান সময়ের মত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাবের এতদূর অভাব পরিলক্ষিত হইত না। যে কোনরূপে ধর্মালোচনা হইলেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের মধ্যে যুবকেরাও আসিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিত, কিন্তু বর্তমান সময়ের মত বৃথা তর্ক করিয়া শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত না। শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি প্রমাণ কোনটাতেই তাহাদের অশ্রদ্ধা ছিল না। মোট কথা সকলেই ধীর-স্থির ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ আলোচনা করিত।

গোপালকৃষ্ণের সংগঠন শক্তির পরিচয় আমরা বাল্যকাল হইতেই নানা ভাবে নানা কার্যের মধ্য দিয়া পাইয়াছি। এ সময়েও গোপাল সমবয়সী এবং দুই পাঁচ বৎসরের ছোট বড় সঙ্গীদের লইয়া একটি সুন্দর দল গঠন করিয়াছিলেন। এই দলের কর্ম্মতৎপরতায় দেশে দিন দিন ধর্ম্মভাবের প্রসারই হইয়াছিল। নিজ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গোপাল একটি সুন্দর ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে ছোট বড় সকলেরই ধর্ম্মালোচনার অধিকতর সুযোগ-সুবিধা হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে দিন স্থির করিয়া এক গ্রামের যুবকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অন্য গ্রামে যাইত; সেখানে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে কোন না কোন ধর্ম্ম বিষয় লইয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিত। এইসব আলোচনা-সভাতে উভয় গ্রামের লোক ব্যতীত অপর গ্রামের লোকও ইচ্ছা করিলে যোগদান করিতে পারিত। আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা একদিনে না হইলে পরপর কয়েক দিন ধরিয়াই আলোচনা চলিতে থাকিত। গোপালের ব্যবস্থামত ইতিমধ্যে বহুবার বহু স্থানে এইরূপে আলোচনা সভা হইয়া গিয়াছে। সকলগুলিতে গোপাল যোগদান করিতে পারেন নাই। সেদিন নিজ জন্মভূমি হরিসেনা গ্রামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ-বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে আলোচনা-সভা বসিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী মাহিলারা গ্রাম হইতে কয়েকজন যুবক পূর্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থা মত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত। গোপাল বিদেশে ছিলেন, কাজেই অনেকদিন আলোচনায় যোগ দিতে পারেন নাই; তাই আজ আলোচনা- সভায় যোগদানের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইলেন। বহুদিন পরে গোপালকে পাইয়া সকলেরই তাঁহার নিকট হইতে কিছু, শুনিবার আগ্রহ জাগিয়াছে। তারাকান্ত সর্বজ্ঞ মহাশয় বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন, কাজেই গোপালকে কিছু বলিতেই হইবে।

গোপালের বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে একটা বিষয় আমরা সকলের অবগতির জন্য বলিতে চাই। গোপাল পিতৃদেবের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শুধু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই গোপাল কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, নিয়মিতভাবে মন্ত্রের পুরশ্চরণাদি দ্বারা বিশেষভাবে নিজেকে উন্নত করিয়াছিলেন। শক্তিমন্ত্রের উপাসক হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহারা কোনরূপে বিদ্বেষ ভাব ছিল না, অদ্যকার আলোচনা দ্বারা তাহা বিশেষভাবেই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি প্রকাশ করিলাম।

তারাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আজিকার এই আলোচনা-সভায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিবেন গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। সভার মধ্যে আনন্দ ধ্বনি উঠিল, কিন্তু যাঁহারা গোপালকে পূর্ব্বে দেখেন নাই বা তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কোনরূপে পরিচয় পাইবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বলিয়াও ফেলিলেন, "এ ছেলে মানুষ, এ আবার ধর্ম্মালোচনা কি করিবে ?" গোপালকে দেখিতে ছেলেমানুষের মতই, কিন্তু তাঁহার তেজোদীপ্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত উক্তিগুলি যে অনেক বৃদ্ধকেও স্তম্ভিত করিয়া দেয়, তাহা তো সকলের জানা ছিল না।

সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, কেন না তিনি প্রস্তাব না করিয়া একেবারে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন। তবুও বিপিনবিহারী সেন উঠিয়া সমাগত সজ্জনগণকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া গোপালের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন তারপর আলোচনার জন্য মাহিলারার যুবকগণকে আহ্বান করিলেন। গ্রামের অন্যান্য প্রবীণদের সহিত পূজনীর কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ মহাশয়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই হাতে গড়া গোপাল আজ সভায় ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিবে, তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে "সাধু সাধু' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মাহিলারার জনৈক যুবক প্রশ্ন করিলেন, "মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন কেন?"

গোপাল—মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় বিশেষ সার্থকতা আছে। কেন না, দুরূহ ও দুরধিগম্য উপদেশসমূহ কেবলমাত্র গ্রন্থ হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে কোন ফলোদয় হয় না। আমরা যদি তাহার একটি প্রতীক প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। উপদেশগুলি গ্রন্থে থাকে নিরবয়ব, আর সাধু-মহাত্মাগণের জীবনে ঐ নিরবয়র উপদেশ সকলই অবয়ব লাভ করে,

কাজেই সহজ-গ্রাহ্য হইয়া সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে অনুসরণ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বাল্যকাল হইতেই আমরা শুনিয়া আসিতেছি 'সদা সত্য কথা কহিবে'; কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যের অপলাপ সর্ব্বত্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বভাবতই মনে হয় যে, সত্য বাক্য কথনের অনুজ্ঞা কেবল অনুশাসন গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; সত্যমূর্ত্তি মহাপুরুষগণ আমাদের মধ্যে প্রকাশ হইয়া যদি না নিজ জীবনে এই সকল আচরণ করিয়া দেখাইতেন, তাহা হইলে মানব-হৃদয়ে উক্ত ধারণাই বদ্ধমূল থাকিয়া যাইত। সর্ব্বমঙ্গলময় করুণাসিন্ধু, শ্রীভগবান তাই তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের প্রতি অপার অসীম স্নেহ দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্ববিধ গ্লানি দূর করিবার জন্য এবং সৎ আদর্শ দেখাইবার জন্য সাধুরূপ পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া জগতে প্রকাশ হন। জীবগণও সেই আদর্শ ধরিয়া সৎ-পথে অগ্রসর হইয়া শুভফল লাভ পূর্ব্বক জীবন-জনম ধন্য করে। কাজেই মহৎ-চরিত্র অনুশীলন যে আত্মোন্নতিকামী সকলেরই একান্ত কর্তব্য, বোধহয় এ বিষয়ে আর দ্বিমত কাহারও নাই।

যুবক—ভক্ত হইলে তাহার জাতি-বিচার থাকে না কেন?

গোপাল—ভক্তের হৃদয় সর্ব্বদাই ভগবানের নিবাসভূমি। কবি বলিয়াছেন, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।" ভক্তের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা নাই, ভক্ত ভগবানের আজ্ঞা পালনকারী দাস মাত্র। দাসের শারীরিক বা মানসিক যাবতীয় চেষ্টা প্রভুর চেষ্টারই নামান্তর, এ কথা একবারও ভুলিলে চলিবে না। যিনি প্রকৃত দাস, তিনি কোন অবস্থাতেই নিজের জন্য কিছু, করিতে পারেন না তাঁহার যাবতীয় কার্য বা চিন্তা সর্ব্বভাবে প্রভুরই। সাধারণ একটা উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। যেমন আমার হস্তপদাদি আমরই আজ্ঞাধীন ভৃত্য, তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মই হস্তের বা পদের না হইয়া আমারই কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তদ্রূপ ভৃত্যের কার্য্য, ভৃত্যের চিন্তা ভৃত্যের না হইয়া প্রভুরই হওয়া। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানে ভেদ কোথায়? মহাত্মাগণের মুখে শুনিতে পাই, "ভক্ত ভগবানের রূপান্তর মাত্র।' ভগবানের গুণগানে যে ফল লাভ হয়, ভক্তের গুণগানেও সেই ফল লাভ হয়। বরং বেশী বলিয়াও কোথাও কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"। এই সকল ভক্ত কোনরূপে জাতি, কুল, গোত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ভক্ত নামক এক নিত্যশুদ্ধ সাধারণ মনোবুদ্ধির অগোচর অপার্থিব স্বর্গীয় জাতি আছে, ইঁহারা সেই জাতিরই অন্তর্গত।

যুবক-সংসারে শান্তি আছে কি না ?

গোপাল—শান্তি তো চাউল, ডাইল, তেল, লবণ বা হাতা, বেড়ির মত কোন পদার্থ বিশেষ নয় যে, কোথাও পড়িয়া থাকিবে, আর আবশ্যকমত তাহা তুলিয়া লইবে? শান্তিটা হইল মনের, আর ওটা দেখাও যায় না বা বলাও যায় না, ওটা অনুভবসাপেক্ষ। বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান নানা ভাবে নানা বিষয় দ্বারা পরিশোভিত করিয়া এই সংসারক্ষেত্রটিকে রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই লীলার নায়ক শ্রীভগবানকে ভুলিয়া ভোগ-বিলাসের আপাতঃমধুর মোহে মোহিত হয়, যে নিয়ন্তার নিয়ম না মানিয়া স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসাইয়া সংসার করিতে যায়, তার কপালেই সুখের পরিবর্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ভোগ হয়। আর যে প্রত্যেক কার্যে শ্রীভগবানকে যুক্ত রাখে, স্বেচ্ছাচারিতা বিসর্জন দিয়া পূর্ব পূর্ব আচার্য্যগণের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে, তাহাকে কখনও দুঃখ বা অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। আপাততঃ বাহ্য-দৃষ্টিতে তাহাকে সংসারের সেবা করিতে দেখিলেও প্রকৃতপক্ষে সে ভগবানেরই সেবা করিয়া থাকে। এইভাবে সন্তোষরূপ অমৃত-সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি শান্তি-সুখ অনুভব করেন, সাধারণ ধনলুব্ধ শান্তিসুখকামী ব্যক্তি তাহা কখনই লাভ করিতে পারে না। ঐ জাতীয় লোককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

সন্তোষমৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্।।

যুবক—'সাধু, এবং ভক্ত' এই দুইটির মধ্যে মূলতঃ কি কোন প্রভেদ আছে?

গোপাল—সাধারণতঃ প্রভেদ মনে হয় না, কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যিনি আপতঃ-সুখদায়ক সংসার-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরসুখময় পরমার্থ চিন্তায় সতত শান্তি অনুভব করেন, যাঁহার সংসারের কোন সম্পত্তির প্রার্থনা নাই, যিনি সর্ব্বদাই শান্তিরূপ পরমধনে ধনী, তিনিই সাধু। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও ভক্তির সকল সাধন-পথেই এই 'সাধু' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। ভক্তে ঐ সকল গুণই বর্ত্তমান, তথাপি ভক্ত শব্দটি সেভাবে সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। কারণ, জ্ঞানাদি-পথের সাধুরা তাঁহাদের শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতির সাধনা করিয়া পরমার্থ সাধনার ভার নিজের পুরুষাকারের উপরই অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্রহ্মলাভ নিজের বিচার দন্ডি ও সাধনার উপরই নির্ভর করে। তাঁহারা বিধিমার্গের নিত্যন্ত পক্ষপাতী। বেদের শাসনবাক্যে তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত-ত্রস্ত। কিন্তু ভক্ত সকল ভার শ্রীভগবানের উপর দিয়া একমাত্র তাঁহার সর্বশক্তিময় ভুবনমঙ্গল নাম আশ্রয় করিয়াই পড়িয়া থাকেন। সাধন-ভজনের

অন্য অর্থ যাহাই থাকুক না কেন, ভক্ত তাহা বিশেষ বুঝিতে চান না। ভগবদচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া অনন্য চিত্তে নামাশ্রয় করিয়া ব্যাকুল প্রাণে তিনি বলেন-

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।।

ভক্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে পথ দেখাইয়া নিজ চরণপ্রান্তে টানিয়া লইবেন। জ্ঞানী সাধু বলেন, "পবিত্রভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা কর।" আর ভক্ত বলেন, "ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চল—ক্ষতি নাই, ভালই; কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও ভগবন্নাম স্মরণ-মাত্রেই স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

এই সময় জনৈক ভেকধারী বৈষ্ণব সভার এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া করজোড়ে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনাদের ওসব বড় বড় তত্ত্বকথা আমরা বুঝিতে পারি না, সাধনাও করিতে পারি না। আমাদের মত মুর্খ পতিতদের সোজাসোজি কি সাধনা আছে. তাই বলুন। আমরা তো আর আপনাদের মত পণ্ডিত নই?

গোপাল—এতে পণ্ডিত বা মুর্খের কোন কথা নাই, আর সোজা-কঠিনেরও কোন প্রশ্ন নাই। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহারই পুনরক্তি করিতেছি। আপনার বলিবার উদ্দেশ্য মনে হয় কলিযুগোচিত নাম-সাধনা সম্বন্ধে কিছু, আলোচনা করা!

বাবাজী—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ভাবের কিছু আলোচনা করুন।

গোপাল—বর্তমান কলিযুগে কলিযুগপাবনাবতার পরম করুণাময় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে নাম-সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, মনে হয় দেশ, কাল এবং আমাদের মত পাত্র হিসাবে তাহাই সর্ব্বথা করণীয়। প্রভু বলিয়াছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যের নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

শ্রীহরিনামের অপার অসীম মহিমা বর্ণনে শাস্ত্রকার বহু প্রমাণ-প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তারপর এই সুমধুর হরিনাম জপ বা সঙ্কীর্তন করিবার বাঁধাবাঁধি বিশেষ কোন সময় বা নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই, বরং অভয় দিয়া বলিয়াছেন—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।।

অন্যান্য যুগের কৃচ্ছ সাধন কলিযুগের দুর্ব্বলজীব করিতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়াই যেন সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বমঙ্গলাধার নামে সর্ব্বশক্তি দিয়া দুর্ব্বল কলি-প্রপীড়িত

জীবকে নাম-সাধনায় অগ্রসর হইতে আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।

সত্যযুগের জীবগণ ধ্যান-ধারণা দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানে, দ্বাপরে সেবা দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছিল, কলিযুগে একমাত্র নাম-সাধন দ্বারাই তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। এ আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা। শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা বোধহয় সকলেই শুনিয়াছেন। একমাত্র নামসাধন দ্বারা মানুষ কতদূর উন্নত হয়, ইনি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইনি নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন প্রত্যহ তিন লক্ষ "হরে কৃষ্ণ" নাম জপ করিবেন। তাঁহার এই নিষ্ঠার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া একান্ত নিষ্ঠার সহিত নাম-কীর্ত্তন করিয়া সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় পণ্ডিতগণ নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া যখন বলিলেন "নামে মুক্তি" হয়, তখন হরিদাস ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামবলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় নামানুরাগী ভক্তের এমন অবস্থা হয় যে, সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন আনন্দে নৃত্য করে; অর্থাৎ তাহার কোনরূপ বাহ্যস্মৃতি থাকে না—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।

স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, অরুণোদয়ের আভায় যেমন রাত্রির অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, নামাভাস হইতেও তেমনি হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার মালিন্য বিদূরিত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বদানং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।।

প্রাচীন পদকর্ত্তা শ্রীযদুনন্দন দাস এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজকৃত পদে বলিয়াছেন—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নাহি হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়।।
সখি হে! কি কব নামের মাধুরী।
কেমনে অমিয়া দিয়া কি জানি গড়িল হিয়া
কৃষ্ণ এই দু আখর করি।।
আপন মাধুরীগুণে আনন্দ বাড়ায় কানে
তাতে কানে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান যবে লয় তব নাম
মাধুরী করি আস্বাদনে।।
কৃষ্ণ দু' আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয়
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হইতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম উনমাদ
যে কানে প্রবেশে নাম সে ত্যজয়ে আনকাম
সর্ব্বভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দন দাসে কয়।।

পদ্মপুরাণে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া একস্থানে বলিয়াছেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ।

এই সময় গোপলের বক্তব্যে বাধা দিয়া জনৈক পণ্ডিতাভিমানী বলিলেন, কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম ক'রে গোপাল পাগল হ'য়ে গেলে দেখ্‌ছি। বাবা, দুর্গা কালী

কি কিছু নয়? চৌদ্দ পুরুষ কালী কালী ব'লে তরে গেলেন, আজ আবার তোমরা নতুন শাস্ত্র বের করলে।" গোপাল বিনীতভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়। আমি তো কোন দেব-দেবীর নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলি নাই, নাম গ্রহণের কথাই বলিয়াছি। আর সেও তো আমার কথা নয়, শাস্ত্রে যাহা আছে তাহাই আমি বলিতেছি। আপনি বলিলেন, কালী দুর্গা কি কিছুই নয়? কে বলিল কিছু নয়? প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে বাধ্য যে, এই ভাবের ছোট বড় বিচার দ্বারা কেবল যে ভজন-পথে বিঘ্ন হয় তাহা নহে। পরস্পরের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। কিছু মনে করিবেন না, সেদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে বিল্বগ্রামে আপনিই বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ কালিকা স্যাদ্রামমূর্ত্তিশ্চ তারিণী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহশ্চ বামনো ভুবনেশ্বরী।
জমদগ্নিঃ সুন্দরী স্যাদ্বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
বগলা কুর্ম্মমূর্তি"ঃ স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ।
মহালক্ষ্মীভবেৎ বুদ্ধে দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপকঃ।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্
তস্মাৎ ভেদো ন কর্তব্যো ভেদে চ নরকং ব্রজেৎ।।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তো কাহাকেও ঘৃণা করিতে বা ত্যাগ করিতে বলে না। দেবতা তো দূরের কথা, বৈষ্ণব শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুক্করান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি।।
সেই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।

বৈষ্ণব কবি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

সর্ব্ব দেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্ট-ভক্তিবর।।

আজ আমরা এ সকল কথা ভুলিয়া দলাদলি লইয়া ব্যস্ত। বুঝি না যে, যে ভাবে যে নামে যেখানে বসিয়াই তাঁহারা উপাসনা করি না কেন, গতি এক স্থানেই হইবে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি শুনুন—

একজনের সংসারে বড়ই অভাব, তাঁহার স্ত্রী স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন বলিল, "আমি তোমার সংসারে থাকিয়া অভাবের তাড়না সহ্য করিতে পারিতেছি না, তুমি তোমার ছেলে মেয়েদের লইয়া থাক, আমি আমার পিত্রালয়ে

চলিলাম।' এই বলিয়া সে তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে তাহার স্বামী ভাবিলেন, আমিই বা এভাবে শুকাইয়া মরি কেন? আমিও দিন কয়েকের জন্য শ্বশুর-বাড়ী বেড়াইয়া আসি না; সঙ্গে সঙ্গে তিনিও শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেলেন। পিতা মাতা এইভাবে চলিয়া যাওয়ায় ছেলেমেয়েরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আমাদের আর কে আছে, চল আমরাও মামার বাড়ী গিয়া থাকি। এই কথা ভাবিয়া একদিন দল বাঁধিয়া তাহারা মামার বাড়ী গিয়া হাজির হইল। সেখানে গিয়া দেখে বাবাও সেখানে, মাও সেখানে। তখন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, আমরা তিনজন তিনটি স্থানের নাম করিয়া বাহির হইলাম, কিন্তু হাজির হইলাম সকলেই এক স্থানে—কিরূপে হইল? তখন তৃতীয় পক্ষ বুঝাইয়া দিল যে, তোমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম করিলেও সম্বন্ধ হিসাবে একই স্থানের ঐরূপে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। ছেলেটিকে বলিলেন, 'তোমার যে মামার বাড়ী, তোমার পিতার সেটি শ্বশুর-বাড়ী, আর তোমার মাতার সেটি বাপের বাড়ী। স্থানের কোন ভিন্নতা নাই, কেবল সম্বন্ধের তফাৎ।

তাহা হইলে একটু নিবিষ্টচিত্তে এখন ভাবিয়া দেখুন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে নামরূপে-সাধনা

ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু গম্য একস্থান।
যে যেমন পার ট্রেণে স্টীমারে হও তথা আগুয়ান।।

গোপালের এই ভাবের কথা শুনিয়া শ্রোতাদের মধ্য হইতে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি উঠিতে লাগিল। সেদিন পণ্ডিত মহাশয় আর কোন প্রসঙ্গ তুলিলেন না। গোপাল আবেগভরে সুর করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

ওরে মন! কৃষ্ণনাম সম নাহি আন।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপ-ত্যাগ ধ্যান-জ্ঞান-ব্রত-যাগ
কেহ নহে নামের সমান।।
যে নাম লইতে হর প্রেমে মত্ত দিগম্বর
বাল্মীক হইল তপোধন।
অজামিল পাপী ছিল নামাভাসে মুক্তি পাইল
পুত্রকে ডাকিয়া নারায়ণ।।
যে নামের স্বাদ পাইয়া তম্বুরে ফিরয়ে গাইয়া
দেব ঋষি নারদ গোঁসাই।
সত্যভামা ব্রতছলে কৃষ্ণ সঙ্গে করি তুলে
দেখাইলা নামের বড়াই

অনন্ত সহস্র মুখে। যে নাম গায়েন সুখে
তবু তো করিতে নারে সীমা।
লক্ষ্য করি অর্জ্জুনকে প্রভু আপনার মুখে
কহিয়াছেন নামের মহিমা।।
প্রেমানন্দ কহে মন কৃষ্ণ বল অনুক্ষণ
দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়।
প্রেমে উচ্চ নাম করি। অবশ্য পাইবে হরি
নাম আর নামী ভিন্ন নয়।

আনন্দের আতিশয্যে সভাস্থ সকলেই গোপালের সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। কিছু সময় কীর্তনের পর সে দিনের মত এইভাবেই সভ্য ভঙ্গ হইল।

গোপালকৃষ্ণের ধর্ম্মলোচনার আর একদিনের কথা বলি। বিশেষ কার্য্যগতিকে গোপালের সেইদিনই 'গৈলা' যাইবার কথা। কাজেই বৈকাল বেলা বিল্বগ্রামের উপর দিয়া একাই রওনা হইলেন। পথে একস্থানে কয়েকটি যুবকের সহিত দুইজন সন্ন্যাসীর কি সব আলোচনা হইতেছিল। অন্যান্য শ্রোতাদের সহিত গোপালও দাঁড়াইয়া একটু শুনিয়া চলিয়া যাইবেন, এমন সময়ে ঐ গ্রামেরই জনৈক ডাক্তার গোপালকে ডাকিয়া লইয়া ভিতরে বসাইলেন। গোপাল ধীরভাবে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের আলোচনা ক্রমে ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম দেখিয়া গোপাল উভয় পক্ষকেই শান্তভাবে যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্ব স্ব মত স্থাপনের যুক্তি দিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সন্ন্যাসীগণ যেভাবে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করেন যুবকগণ তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান নয় বরং নিন্দায় শত মুখ এমনও দুই-তিন জন যুবক ছিল। ঐ ভাবের পরামর্শ দিয়াও যখন কোন সুফল হইল না, তখন গোপাল একটু, বিরক্ত ভাবেই চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু গোপালের উপর উভয় পক্ষের বক্তব্যের মীমাংসার ভার দিলেন। গোপাল প্রথমে দৈনাভরে নিজ অযোগ্যতা জানাইয়া দুই-একটি কথার পর বলিলেন, 'ধর্ম্ম' ধর্ম্ম" করে সকলে পাগল হচ্ছেন, অথচ ধর্ম্ম যে কি এবং সব ধর্ম্মই যে এক, এ কথাটা কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছেন না কেন? আমি মূর্খ, আমার কথাগুলি একটু রূঢ় হবে, কেউ রাগ করবেন না। আমি আপনাদের কোন ধর্ম্মকেই ছোট করছি না, তবে সার্ব্বভৌমত্বের দাবী একমাত হিন্দু ধর্ম্ম যেমন বুক ঠুকে ক'রে আসছে বা করতে পারে, অন্য কোন ধর্ম্মই তেমন পারে নি বা পারবে না। কেন, তার একটা কারণ বলছি, দয়া করে ধীরভাবে শুনুন।

হিন্দুধর্ম্ম বৈদান্তিক-ধর্ম্ম সারা বিশ্বকে এবং সর্ব্ব জীবকে নিয়ে তার প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য ধর্ম্ম অধিকাংশই কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে দ্বেষভাবাপন্ন। হিন্দুধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন—'যত মত তত পথ'; কে যে কোন্ পথে কোন্ সাধন সূত্র ধরে কিভাবে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করবে, তার কোনও ঠিক নেই। তবে যিনি যে মতে বা যে পথেই থাকুন না কেন, কোনরূপ কপটতা না করে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের নির্দ্দেশমত চললে শেষে একই জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হবেন। সাধক-কবি তাই বলছেন—

ভিন্ন ভিন্ন পথ ভিন্ন ভিন্ন মত কিন্তু গম্য একস্থান
যে যেমন পার স্টীমারে হও তথা আগুয়ান।।

তারপর হিন্দু ধর্ম্মের মহান্ উদারতার কথা একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। হিন্দুধর্ম্মে শুধু বিশ্বাস নেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি আছে, সাধক মাত্রেই অল্পাধিক সে অনুভূতি লাভ করতে পারেন। তবে সাধন করে তাঁর দেখা না পাওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধি নেই। যে ব্যাকুল প্রাণে তাঁর দর্শন চায়, সে নিশ্চই তাঁকে লাভ ক'রে সকল সন্দেহের হাত থেকে পরিত্রাণ পার। যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরাই জীবকল্যাণার্থে নানাপ্রকার শাস্ত্র শ্রুতি প্রচার ক'রে গিয়েছেন, তার উপরই এই সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

একটু নিবিষ্ট চিত্তে কোনরূপে গোঁড়ামি না রেখে চিন্তা করলেই হিন্দু ধর্ম্মের সজীবতা বিশেষভাবে বুঝতে পারা যায়। চলার পথে যখনই এই হিন্দুধর্মের মধ্যে গ্লানিকর বিকৃতি আসে, তখনই তার সংশোধনের জন্য অবতার-রূপে শ্রীভগবান এসে আবির্ভূত হন। এই সকল অবতার সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে যুগোপযোগী করেন; ফলে লোকের সামর্থ্য অনুযায়ী সাধন-ভজনের সুবিধা হয়। মূলে কিন্তু ধর্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। কেবলমাত্র আচরণের কিছু কিছু হেরফের হয়। অবতারগণ ঐ একই কথা বলেন, 'তুমি যা-ই হও না কেন, যেখানেই থাক না কেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরাধনা কর, তাতে বিশ্বাস রাখ, নিশ্চয়ই তাঁকে লাভ করে ধন্য হবে। তুমি গৃহী বলে দুঃখ কর না, গৃহস্থ রাজা জনকের নিকট সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শুকদেরকেও শিক্ষালাভের জন্য যেতে হয়েছিল। সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে তিনি গৃহস্থেরও যেমন সন্ন্যাসীরও তেমন। বনেও তাঁকে পাওয়া যায়, ঘরেও তাঁকে পাওয়া যায়। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বদা যাদের সহিত আমাদের সংস্পর্শে আসতে হয়, হিন্দুধর্ম্ম মতে ভগবান তাদের সকলের মধ্যেই নিত্য বিদ্যমান আছেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য থেকে পশু, পক্ষী, কটি, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যেই তিনি বিরাজমান—এই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য বক্তব্য। শুধু যে তিনি তোমার আমার পূজার প্রতিমার থাকেন না, স্তম্ভ থেকে নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়ে তিনি তা দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—অনন্ত শেষ নাগ সর্পরূপী ভগবান, মৎস্য ভগবান, গরুড়-পক্ষীরূপী ভগবান, কুর্ম্ম ভগবান, মানুষের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ বাল-বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ সকলেই ভগবান। যদি নিজে যথার্থ সুখী হতে এবং অপরকে সুখী করতে বাঞ্ছা থাকে, তবে ধর্মানুশীলন করা যে মানব মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য—এ কথা বহুভাবে বহুবার হিন্দুশাস্ত্র ঘোষণা করেছেন। তবে ধর্মানুশীলন করতে গিয়ে যদৃচ্ছা মত আচরণ করলে চলবে না। দেহ ও চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রথম কথা; এই জন্য যম-নিয়মাদি যা শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তদনুসারে আচরণ করতে হবে। এ আচরণ সংসারী বা সন্ন্যাসী উভয়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য ; যে কোন অবস্থার যে কোন মানুষই তা করতে পারবে। এই সমস্ত নিয়ম পালনের সঙ্গে ঈশ্বরদর্শনাকাঙ্ক্ষা যখন জাগ্রত হয়, তখন তাঁরই কৃপায় সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে সাধনা করতে করতে ক্রমে সিদ্ধাবস্থা লাভ করে। এক জীবনে সিদ্ধিলাভ না ঘটলেও হতাশ হবার কিছু নেই। যতটা হ'ল, ততটাই পরবর্তী জীবনের জন্য অগ্রসর হয়ে থাকা গেল, পরবর্তী জীবনে এর পর থেকেই শুভারম্ভ হবে।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান আছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন "আত্মাই ব্রহ্ম"। এখন প্রশ্ন হতে পারে দেখতে পাই না কেন ? এর উত্তরে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে, অহংকারের সঙ্গে মিলে মিশে জীব যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গিয়েছে। এই অহংকারকে বিসর্জন দিতে পারলেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। মোহাবসানে স্বরূপানুভুতি আসে এবং সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এখানে কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটা কথা না ব'লে পারলাম না, কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি কাকেও লক্ষ্য করে বলছি না। কথাটা এই যে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এ কথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, জগৎ একেবারেই নেই। সাধারণতঃ আমরা যে চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখি, সেই দৃষ্টিটা একটু পরিবর্ত্তন করলেই বর্ত্তমানরূপ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আসক্তি শূন্যে ব্রহ্মরূপ পরিলক্ষিত হবে। সুদুর্ল্লভ মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল এই জ্ঞান লাভ করা এর জন্য সকলকেই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সাধন-পথের সিড়িগুলি অতিক্রম করতে হবে। শক্তিশালী সাধক হয়ত শ্রীগুরুকৃপায় সাধন-বলে দু-একটা ধাপ উল্লঙ্ঘন ক'রেও যেতে পারেন; কিন্তু সাধারণতঃ সাধকের পর পর ধাপ অতিক্রমই

দেখতে পাওয়া যায়।

যুগোপযোগী এবং সাধকের শক্তি অনুযায়ী সাধনার এই স্তর বা ধাপগুলি প্রস্তুত ক'রে দেবার জন্যই অবতার-পুরুষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং যুগোপযোগী সংস্কারক অবতার-পুরুষগণের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে নেই। তাঁদের উপদেশ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ ক'রে তাঁদের আচরণ অনুকরণ ও তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলাই আমাদের। অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার সম্প্রদায় বড়, আমার প্রচারিত মতই সত্য, অন্য সকল কিছু, নয়—এ ভাবের তর্ক করে কোন লাভ নেই। করজোড়ে আমার আপনাদের নিকট অনুরোধ, আপনারা পরস্পর ঝগড়া না করে মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধন-পথে অগ্রসর হউন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথার অবতারণা ক'রতে হ'ল, হয়ত তাতে কারও প্রাণে ব্যথা লেগেছে, আমি কাকেও লক্ষ্য করে কিছু বলিনি। এজন্য আমি সকলের কাছেই ক্ষমা চাই। নমস্কার।"

যখনই যেখানে গোপাল কোনরূপে আলোচনা করিয়াছেন, কোথাও কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কোনরূপে কটাক্ষ করেন নাই। পরবর্তী সখী-জীবনে তাঁহার আচার-ব্যবহারের মধ্যে সকলেই এ বিষয় বিশেষভাবে দেখিতে পাইয়াছেন।

গোপালকৃষ্ণের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে বহু ঘটনা এখন প্রবাদের মত দেশে আলোচনা হয়। সকলগুলি সংগ্রহ করা এখন আর সম্ভব না, যতটকু সন্ধান পাইয়াছি এবং সংগ্রহ করিবার সংযোগ সুবিধা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে আর একটি বলিব।

প্রাচীন-প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি আমাদের বাড়ীতে চৈত্র মাসে চড়কের সময় খুব মেলা হইত এবং বহু দূর দূরান্তর হইতে অনেক গুণী খেলোয়াড় আসিয়া নানা প্রকার খেলা দেখাইত। যে গাছটিতে চড়কের সময় পৃষ্ঠে বঁড়শি বিধিয়া গুণিগণ শূন্যে ঘুরিয়া দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিতেন, সে গাছটি পরবর্তী কালে পুকুরের ঘাটে খণ্ড খণ্ড করিয়া পৈঠারূপে ব্যবহার করিতে আমরা দেখিয়াছি। মনে হয়, অনুসন্ধান করিলে এখনও উহার অংশবিশেষ পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত কাঠখানি লম্বার আঠার-উনিশ হাত এবং মোটা প্রায় দেড় ফুট আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি আরও মোটা ছিল। তালে থাকিয়া থাকিয়া উহার রঙ কালো পাথরের মত হইয়াছিল। শুনিয়াছি গোপালকৃষ্ণ নাকি মধ্যে মধ্যে সঙ্গীগণকে লইয়া উক্ত কাঠখানিকে ইচ্ছামত তুলিতেন এবং নানাভাবে ঘুরাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। একদিন গ্রামের জমিদারবাবুর বাড়ীর

কয়েকজন লাঠিয়ালা মফিজদ্দিন সদরকে সঙ্গে লইয়া গোপালের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। শেষে স্থির হইল পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। মফিজদ্দিন একজন বড় লাঠিয়াল; আমরা যে সময় তাহাকে দেখিয়াছি, তখন তাহার বয়স প্রায় যাট; কিন্তু তখনও তাহার সুদৃঢ় মাংসপেশী একটু শিথিল হয় নাই। সে তোতলা ছিল, কথা বলিতে খুবই কষ্ট হইত। একটি হাতের আঙুল ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া অতি কষ্টে কথা বলিত। সে সকল লাঠিয়াল এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের একত্র করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঐ কাষ্ঠ খণ্ডকে দেখাইয়া বলিল, "এই কাঠখানিকে যে একা তুলিয়া লইয়া খালে ফেলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।" হিন্দু, মুসলমান, নমঃশূদ্র অনেকেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মোহিনী কুমার সেন গোপালকে বলিলেন, "আমাদের সামনে তো অনেক শক্তি দেখাও, এই প্রতিযোগিতার যোগ দাও না কেন?" গোপাল মৃদু, হাসিয়া বলিলেন, "তা যোগ দিতে পারি; কিন্তু কৃতকার্য্য হ'লে আমি যা চাইব, তা দিতে পারবেন?" দর্শকগণের মধ্য হইতে দুই-চারজন একই সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আপনি কি চান?" জমিদারবাবুর প্রধান কর্ম্মচারী যেন একটু শ্লেষভাবেই বলিলেন, "কি চাও ঠাকুর, না হয় অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাই দেওয়া যাবে।" গোপাল বলিলেন, "রাজত্ব বা রাজকন্যা আমার দরকার নেই, আমার দরকার স্কুলের জন্য আটখানি বেঞ্চি ও দুইটি চেয়ার এবং একটি খাতাপত্র রাখবার আলমারী।" সুনিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বিপিনবিহারী সেন বলিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" গোপালকৃষ্ণ পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উত্তরীয়খানি ভাঁজ করিয়া স্কন্ধের উপর রাখিয়া 'জয় মা ভবানী' বলিয়া কাষ্ঠখনি স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া খালের দিকে চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক, সকলেই গোপালের পিছু পিছু চলিয়াছেন, গোপালের কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি খালের ধারে যাইয়া পুনরায় "জয় মা ভবানী" বলিয়া স্কন্ধের কাষ্ঠখানি খালের জলে ফেলিয়া দিলেন। অনেক মহিলাও মিছিলের সঙ্গে ছিলেন, সকলেই একসঙ্গে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। বালকের দল হাতে তালি দিয়া নাচিতে লাগিল মহিলাগণ উলুধ্বনি দ্বারা নিজ নিজ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপালের ভূতপূর্বে শিক্ষক কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ মহাশয় ভীড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গোপালকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া "দীর্ঘজীবী হও, দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। প্রায় আধঘণ্টা আনন্দোচ্ছ্বাস চলিল। তারপর একে একে সকলে চলিয়া গেলে মফিজদ্দিন সর্দ্দার ও অন্যান্য লাঠিয়ালগণ একসঙ্গে

গোপালকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইল।

বলা বাহুল্য, বিপিনবাবু যথা সময়ে বেঞ্চি, চেয়ার ও একটি আলমারি প্রস্তুত করাইয়া বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন। গোপালের এই প্রকার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে গোপালের সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—গোপাল সাধনা করিয়া একটা কিছু সিদ্ধাই লাভ করিয়াছে, তাহার বলেই ও এইসব করে। সখীবেশ ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে নাটমন্দির নির্মাণকালে বিরাট বিরাট কড়ি উঠাইবার সময় অনেকেই আর একবার শক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।

কাঙ্গাল-গরীবকে কিছু দিতে না পারিলে গোপাল যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেন। মাতা-ঠাকুরাণী ও গোপালের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য মধ্যে মধ্যে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন; গোপাল সঙ্গীদের লইয়া পরমানন্দে "ইহারা দরিদ্ররূপধারী নারায়ণ' এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের উচ্ছিষ্টাদি নিজহস্তে পরিষ্কার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। শুধু দেশে থাকিবার সময় নয়, অন্যত্র অবস্থানকালে গোপালের এই উদার চিন্তাবৃত্তির পরিচয় অনেক পাওয়া যাইত।

দেশে পিতৃদেবের কার্য্যদি সমাপনের পর কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিনের জন্য গোপাল শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীচৈতন্যচতুষ্পাঠীতে ছিলেন। শুনিয়াছি ঐ সময় কাশীধাম হইতে 'শিবগোবিন্দ ভারতী' নামক জনৈক - স্বামীজী ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিয়াছিলেন, গোপাল নাকি তাঁহার নিকট বেদান্ত পড়িয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, গোপাল এই স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ কথার প্রতিবাদ করিতে কোনরূপে কুণ্ঠাবোধ করিব না। কারণ, গোপাল উপনয়ন সংস্কারের পর হইতেই যে গৈরিক-বসন পরিধান করিতেন, তাহার প্রমাণ বহু ক্ষেত্রে বহুবার আমরা পাইয়াছি। আর কথা প্রসঙ্গে গোপাল প্রায়ই "মা-ই তো আমাকে গেরুয়া পরাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়াছেন।" এ উক্তিটির মূলে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে সেটি পাঠককে জানাইয়া দিতেছি, সত্যাসত্য তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিবেন।

উপনয়ন হওয়ার কয়েক দিন পরে গোপাল বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সেন মহাশয়দিগের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। গোপালের পরিধেয় বস্ত্র ও গায়ের চাদরখানি মলিন দেখিয়া সঙ্গীদের মধ্যে একটু অপ্রিয় আলোচনা হয়; গোপাল তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কার্য্য সমাপনান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখেন— মা, খুড়িমা পশ্চিমের বাড়ীর জ্যাঠাইমা প্রভৃতি সাত আট জনে বসিয়া সীতার

অগ্নিপরীক্ষা' লইয়া আলোচনা করিতেছেন, সম্মুখে রামায়ণখানি খোলা। গোপালও একটু বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই সময় রজক আসিয়া কাপড় চাহিল। গোপালের মা গোপালের বড় বৌউদিদিকে সমস্ত ময়লা কাপড় ঠিক করিয়া দিবার আদেশ দিয়া গোপালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর কাপড়টা তো কালো হয়েছে, ঘরে কাচা কাপড় আছে তাই পরে ওটা ছেড়ে দে। গোপাল বলিলেন, "মা! আমার কাপড় আর ধোপার বাড়ী কাচতে দেব না।'

মা—ময়লা কাপড় ধোপার বাড়ী না দিলে চলবে কেন?

গোপাল—মা! ওরা নানা লোকের নানাপ্রকার নোংরা কাপড়ের সঙ্গে একত্রে আমার কাপড় সিদ্ধ করে, এটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। যদি কেউ না আমার কাপড় পরিষ্কার ক'রে দেয় তবে আমি নিজেই খার বা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নেব।

মা এবং উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া একটু বাদানুবাদ হইল। গোপাল কথা প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, "মেয়েদের অশুচি কাপড়ের সঙ্গে আমার কাপড় দিতে পারিবেন না।' এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "তা হলে তো বাবা তোমাকে কাপড় ছুবিয়ে পরতে হয়। যদি অতই পবিত্রভাবে থাকতে চাও, তা হলে কিছু, গেরিমাটি এনে কাপড়গুলো ছুবিয়ে নাও, ঘন ঘন কাচতেও হবে না আর ময়লা হলেও সহজে দেখা যাবে না।' ব্যাস আর কি! গোপাল কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং পরের দিনই নিজের ব্যবহারের কাপড় চাদর সমস্ত গেরুয়া রঙে ছোবাইয়া লইয়া পরিতে লাগিলেন। এই তো তাঁহার গেরুয়া কাপড় পরার ইতিহাস। এছাড়া কোন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনি যে কোন সময় সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সে কথা তিনিও কখন বলেন নাই, আমরাও জানি না। গোপালের অত্যন্ত প্রিয় বালাসঙ্গী পূর্ব্বোক্ত হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন পুরী গোবর্দ্ধন মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর নাম গ্রহণ করেন, তখনও নাকি গোপাল গেরুয়া কাপড় পরিধান করিতেন—একথা আমরা স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছি। কাজেই নবদ্বীপে স্বামী শিবগোবিন্দ ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা আমরা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না। তখন স্বামীজীর নিকট থাকিয়া গোপাল যেভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, আর স্বামীজীও যেভাবে যত্ন করিয়া গোপালকে বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, তাহাতে বাহিরে এভাবের আলোচনা হওয়া অসম্ভব নয়। তবে প্রকৃত ব্যাপার যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এখানে পাঠকগণকে জানাইয়া দিলাম।

কিছুদিন নবদ্বীপে থাকার পর স্বামীজী যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষ হইয়া চলিয়া

গেলেন। গোপালের বেদান্ত পাঠে বাধা পড়িল। তখনকার পণ্ডিত মন্ডলীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন প্রমুখ দুই একজন ব্যতীত সকলেই গোপালকে কলিকাতার দাদার নিকট ফিরিয়া যাইতে এবং কালীঘাটের পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণদাস বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের উপদেশ দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্যের কোন গ্রন্থ এবং শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতাসে পণ্ডিত-প্রবর প্রভুপাদ ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট কিছুদিন গোপাল ভাগবত পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়গণের আদেশানুসারে বেদান্তবাগীশ মহাশরের নিকট নিয়মিতভাবে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই গোপাল কি জানি কেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই চক্রবেড়ের বাসা হইতেই গোপাল সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর বাসায় আত্মীয় বন্ধু ছাড়াও নানা স্থান হইতে নানা ভাবের লোক আসা যাওয়া করিত। কিন্তু, গোপাল বিশেষভাবে কাহারও সহিত মেলামেশা করিতেন না। তবে যেটুকু নিতান্ত না করিলে নয় তাহাই করিতেন। যদি কোন সাধু, সন্ন্যাসী আসিতেন, গোপাল একেবারে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেন। দিবারাতের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের সেবায় ও নানা প্রকার শাস্ত্র আলোচনায় কাটাইয়া দিতেন। সাধুদের সেবার জন্য অন্য কাহাকেও সুযোগ দিতেন না, একাই তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য করিতেন। এই সময় গোপাল দীনবন্ধু দাদার নিকট হইতে নূতন কিছু কিছু, যোগের প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সব এবং দেশে থাকাকালীন যে সব অন্ত্রধৌতাদি ক্রিয়া শিখিয়াছিলেন, তাহা এই সময় নিয়মিতভাবেই করিতেন। ছোট ভাই ছিল দেশে তাঁহার সাথী। যদিও তাহার বয়স কম ছিল তথাপি গোপাল কি জানি কেন তাহাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন এবং কোন কিছু, প্রয়োজন হইলে ছোট ভাইয়ের মারফতেই তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। এখানে সে সংযোগ নাই, কাজেই নিজেকেই নিজের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইত। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে যে না হইয়াছে তাহা নহে, তথাপি কখনও অন্যকে বিরক্ত করেন নাই। এইভাবে প্রায় এক বৎসর গত হইল।

পিতার সপিণ্ডকরণ সময় উপস্থিত জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগবন্ধুকে সংবাদ দেওয়া হইল। জগদ্বন্ধু মাতাঠাকুরাণীকে ও ছোট ভাই দীনেশকে লইয়া যথাসময় আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে চার ভাই মিলিয়া পিতৃদেবের বাৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বাংলা ১৩০২ সালের চৈত্র মাসে কার্য্য শেষ

হইল, আর ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের ২২ তারিখে দীনবন্ধুর একটি পুত্র সন্তান হইল। পূর্ব্বে সন্তান নষ্ট হওয়ায় ধাত্রীমাতার পরামর্শ মত ইহাকে তিনকড়া কড়ি দিয়া ধাত্রীর নিকট হইতে কিনিয়া নেওয়া হইল। বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম তিনকড়ি হইয়াছিল। যদিও অন্নপ্রাশনের সময় অনাথবন্ধু, নাম রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ তিনকড়ি হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনু নামটাই থাকিয়া গেল। ইহার পর গোপালকে বাধ্য হইয়া কিছু সময় শিশুকে লইয়া থাকিতে হইত। শিশুও গোপালের খুব বাধ্য। গোপাল সবই করে, কিন্তু সকল বিষয়েই যেন কেমন উদাস উদাস ভাব। এইসব দেখিয়া একদিন দীনবন্ধুর স্ত্রী গোপালকে বলিলেন, “ঠাকুরপো! আপনার মতলবখানা কি বলুন তো? আপনার কি হয়েছে?”

গোপাল—কেন বউদিদি! আমার কি হয়েছে?

বউদিদি—দিন দিন আপনার যেন সব ছাড়-ছাড় ভাব দেখছি, এভাবে থাকলে তো চলবে না। আপনার দাদা বাড়ী এলেই আপনার একটা বিয়ে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলব, তা হ'লেই বেশ জব্দ হবেন।

গোপাল—বউদিদি, আর যা খুশী করুণ, ঐ কাজটি দয়া করে করবেন না। আমি পূর্ব্বেও ব'লেছি এখনও ব'লছি, জগতে স্ত্রীলোক মাত্রই আমার মাতৃস্থানীয়া, কার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন? কোন চেষ্টা করবেন না, শেষে আপনারাই ফ্যাসাদে পড়বেন, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি কোনরূপে জব্দ হব না।

বউদিদি—রাম রাম, ও কি বলছেন? একথা কি বলতে আছে নাকি ? আচ্ছা, কেন বলুন দেখি ঠাকুরপো, আপনার এ দুষ্টু সরস্বতী ঘাড়ে চেপেছে? এইসব সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে বুঝি আপনার এই বুদ্ধি হয়েছে ?

গোপাল হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কেন বউদিদি! সাধুদের সঙ্গে মিশে আমার কি হয়েছে ?

বউদিদি—দিন দিন আপনার খাওয়া ক'মে গিয়ে এতক'টি হয়েছে। রাত্রিতে ঘুম নাই, অন্ধকারে সারারাত ব'সে কি যে করেন তা জানি না। ভাল করে সকলের সঙ্গে কথাও বলেন না। আমরা যেন আপনার কেউ নই, কোন কাজে আমাদের সাহায্য চান না, এ সব কি ? এরকম ভাব তো ভাল না, আমি কোন কথা শুনব না, আজই আপনার দাদা এলে সব বলে দেব।

গোপাল—বউদিদি! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, দাদাকে কিছু বলবেন না। আচ্ছা, আজ থেকে দেখুন আমি কেমন পাকা গৃহস্থ হই। আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন, আপনি আমার রাত্রিরের খাওয়াটা একটু একটু ক'রে কমিয়ে

দেবার চেষ্টা করুন। দুদিন একদিন ছাড়া একখানা করে রুটি আমাকে দেবেন। ভাতও এই ভাবে দুটি দুটি কমিয়ে দেবেন। মনে করছেন এতে আমার কষ্ট হবে? সত্যি বলছি বউদিদি, এতে আমার কোন কষ্ট হবে না বরং আমার কাজের বিশেষ সুবিধাই হবে, আমার কথায় বিশ্বাস করুন।

গোপালের এইসব কথা শুনিয়া বউদিদির মনে যাহাই থাকুক, মুখে বিশেষ কিছু আর বলিলেন না। কিন্তু সেই দিন হইতে সত্য সত্যই গোপালের আচরণের অদ্ভুত পরিবর্তন দৃষ্ট হইল। বাজার করা, ছেলেকে দেখাশোনা করা, লোকজন আসিলে তাহার ব্যবস্থা করা—মোট কথা সংসারের সকল কাজই গোপাল সেই দিন হইতে এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করিয়া যাইতে লাগিলেন যে, বউদিদি মনে করিলেন ঠাকুরপোর আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তা কি যায় ? বৈরাগ্যের স্পর্শ একবার যাহার প্রাণে লাগিয়াছে, সে যতই আবরণ দিক না, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে ধিক ধিক জ্বলিতে থাকিবেই; আর যে মুহূর্ত্তে অনকুল সঙ্গ পাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সর্ব্বত্রই যখন এই হয়, তখন এক্ষেত্রেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? বিশেষতঃ গোপাল তো আচার, নিয়ম, নিষ্ঠার দিক দিয়া ভাববিরোধী কোন কিছু করেন নাই; বরং শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-নিষেধ বিশেষভাবেই পালন করিয়া আসিতেছেন। যুক্ত আহার যুক্ত বিহার যাহা ভাব-ভক্তি লাভের প্রধান সহায়, গোপাল তো প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন, তাঁহার বৈরাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে না কেন ?

এইসময় গোপালের দৈনিক কার্য্যসূচী বড় চমৎকার ছিল। দৈনিক গঙ্গাস্নান, শাস্ত্রপাঠ, নিভৃতে উপাসনা, সাধু সজ্জন আসিলে তাঁহাদের পরিচর্য্য; এদিকে সংসারে যখন যেরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হইত, কোনটাতেই সাহায্য করিতে গোপাল দ্বিধা বোধ করিতেন না; এমন কি মধ্যে মধ্যে সমস্ত কার্য্য বজায় রাখিয়া সংসারের রন্ধন কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এই সময় আহার নিদ্রা সংযম খুব কঠোরভাবে গোপাল পালন করিয়াছিলেন। খুব সামান্য আহার গ্রহণ করিতেন এবং গভীর রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে নানা প্রকার যোগক্রিয়া করিয়া কাটাইয়া দিতেন। নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন বিছানায় শয়ন করিবেন না। বসিয়া বসিয়া বা কিছু, একটা ঠেসান দিয়া আলসত্য আসিলে একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ সকল বিষয়ে তাহাকেও কিছুমাত্র জানিতে দিতেন না, গোপনে করিতেন।

গোপালকৃষ্ণের সংসারাশ্রম ত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে এমন একটি অপ্রীতিকর

ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য দীনবন্ধুকে পরবর্তীকালে অনেক সময় দুঃখ করিতে দেখা গিয়াছে। ঘটনাটি তেমন গুরুতর না হইলেও সময় পাওয়া গেল না যে, উভর ভ্রাতা একত্রে বসিয়া সেটির মীমাংসা করিয়া লইবেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি—

দীনবন্ধুর স্ত্রী একটি বিড়াল পুষিয়াছিলেন, সকলেই তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিত। একদিন দুই ভাইকে অন্নের থালা ধরিয়া দিয়া অন্যান্য দ্রব্য আনিতে দীনবন্ধুর স্ত্রী কক্ষান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় বিড়ালটি গোপালের অন্নের থালায় মুখে দিল। গোপাল কিছুতেই সেই অন্ন গ্রহণে রাজী হইলেন না। অন্য সময় হইলে অনায়াসেই অন্ন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইত কিন্তু কি জানি কেন, সেদিন দীনবন্ধুও গোপালকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, অন্ন দূষিত হয় নাই; তুমি সাচ্ছন্দে উহা গ্রহণ করিতে পার। গোপাল ও দাদার কথায় অন্য সময় বিশেষ প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেদিন যেন নিজের জিদ বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; কিছুতেই সে অন্ন গ্রহণ করিলেন না। এমন কি, শেষে দীনবন্ধুর স্ত্রী পৃথক অন্নের থালা আনিয়া দিলেও গোপাল তাহা স্পর্শ না করিয়াই উঠিয়া গেলেন। দীনবন্ধুরও রাগ হইয়াছিল, তিনিও আর তাঁহাকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন কেহই জানে যে, এই অন্ন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গোপালের সংসার ত্যাগের সূচনা হইল। গোপাল নিজ মনোগত ভাব সহজে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, কাজেই এ-বিষয়েও তাঁহার অন্তরের কথা বাহিরে কেহ জানিতে পারিল না। ইহার পর যে দুই দিন গোপাল সংসারে ছিলেন, সে দুই দিনও সে অন্ন গ্রহণ করেন নাই, তাহা কেবলমাত্র দীনবন্ধুর স্ত্রীই জানিতেন; কিন্তু প্রকাশ করিলে পাছে আবার কিছু গোলমাল হয়, তাই তিনিও সে কথা কাহারও নিকট তখন প্রকাশ করেন নাই। দীনবন্ধু সেই দিনই সন্ধ্যারপূর্ব্বে ধর্ম্মসভার নিমন্ত্রণে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

এখানে একটা বিষয়ের উপর পাঠকগণের মন আকর্ষণ করিতেছি। যে গোপাল সেদিন বিড়ালে মুখে দিয়াছে বলিয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই গোপালই পরবর্ত্তীকালে সকলের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টপাতা হইতে অন্নের কণিকা তুলিয়া খাইতে কোনরূপে দ্বিধাবোধ করেন নাই; এমনকি কুক্কুরে ভোজন করিয়া গেলেও তাহা মহা-মহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মানিয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধারমণবাগে মহোৎসবের সময় অনেকেই এ দৃশ্য দেখিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইল অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করিবেন। আমরা একবাক্যে বলিব যে, সৎগুরুর

সৎশিক্ষার অমোঘ ফলেই এই পরিবর্তন। শ্রীগুরুকৃপা গোপালের ভিতরে-বাহিরে, আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত, যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন।

এই অন্নত্যাগের ব্যাপারে অনেকে গোপালের প্রসাদে অবহেলা মনে করিতে পারেন, কিন্তু গোপালের আদৌ সে উদ্দেশ্য নয়। কিছুদিন যাবৎ গৃহত্যাগের ছল খুজিতেছিলেন—কি উপায়ে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, কিসে সংসারাশক্তিতে বিরক্তি আগে ইত্যাদি অনেক কিছুই গোপাল ভাবিতেছিলেন; তাই আজ এইরূপে একটি সামান্য ঘটনার সূত্রে লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি করিয়া সামান্য ব্যাপারকে গুরুতর করিয়া তুলিলেন। ভগবানেরও বুঝি এই ইচ্ছাই ছিল। তাই এই তর্কযুদ্ধই গোপালের সংসারত্যাগের সঙ্কল্পকে অতি সহজে সিদ্ধ করিয়া দিল।

এই ঘটনার পরদিন অর্থাৎ সংসারাশ্রম ত্যাগের পূর্ব্বে দিন সঞ্চার অব্যবহিত পূর্ব্বে” দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। এমন তো প্রায়ই সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়, কাজেই ইহা আর কেহ নূতন কিছু, বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যায় হইয়াছে, কাজেই তাঁহাদিগকে সেদিন আর অন্যত্র যাইতে দেওয়া হইল না। পূর্বদিন দীনবন্ধু যে নিমন্ত্রণে বিদেশে গিয়াছেন, সেদিন তখনও ফিরিয়া আসেন নাই: গোপালই অন্যান্য বারের নায়ে সাধুযুগলের সেবার ভার সেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। পরবর্তী ঘটনার সহিত আজিকার এই সাধুসমাগমের কোনরূপে যোগ সাজুষ্য আছে কিনা, গোপাল ইহাদেরই সঙ্গে কোনরূপে পরামর্শ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা, ভাবিবার বিষয়।

প্রাতে উঠিয়া সন্ন্যাসী দুইজন চলিয়া গেলেন। কিছু সময় পরে গোপালও গামছা, কাপড় ও কমণ্ডলু লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাই বলিয়া বাহির হইলেন। তখন দীনবন্ধুর শিশুপুত্র তিনকড়ি মাত্র সাত মাসের। কাহাকে কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া একখানি ছোট কাগজে কি যেন লিখিয়া দীনবন্ধুর স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, “এইখানি দাদা বাড়ীতে এলে তাঁকে দেবেন।” দীনবন্ধুর স্ত্রী বলিলেন—“আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?” গোপাল তখন একটু হাসিয়া বলিলেন, “দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন কাপড় গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। তবে ফিরতে যদি বিলম্ব হয়, আর ইতিমধ্যে দাদা এসে পড়েন, তাই আপনার হাতে দিচ্ছি; নচেৎ তো আমি দিতে পারতাম।’ এই বলিয়া বউদিদির কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গোপাল দ্রুত প্রস্থান করিলেন। দীনবন্ধুর স্ত্রী লেখাপড়া জানিতেন না, কাজেই কাগজে কি লেখা আছে না আছে কিছুই জানিতে পারিলেন না;

যত্ন করিয়া কাগজখানি তুলিয়া রাখিলেন। ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের শেষে এই ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ গোপাল গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এদিকে দীনবন্ধু, অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই গোপালকে না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল কোথায়?" দীনবন্ধুর স্ত্রী বলিলেন, "সকালে কাপড় গামছা নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যাই ব'লে বের হয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।' দীনবন্ধু ভাবিলেন—বোধ হয় কোন ঠাকুর বাড়ীতে বা কোনও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়া পড়িয়াছে, তাই আসিতে বিলম্ব হইতেছে। বেলা অবসান প্রায়, তখনও গোপাল ফিরিতেছেন না : দীনবন্ধু যেন কেমন অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময় দীনবন্ধু স্ত্রী গোপাল যাইবার সময় যে কাগজখানি দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া দীনবন্ধুকে দিলেন। দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া একেবারে "গোপাল গোপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাগজখানিতে কেবল লেখা ছিল "অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদায় নিলাম, অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইবেন না, প্রয়োজন মত আমি নিজেই সংবাদ দিব। ইতি—গোপালকৃষ্ণ।"

হরিবোল হরি, দীনবন্ধু ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ। বিশেষতঃ সেদিনের সেই অপ্রিয় ঘটনার পর আর তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সংযোগ হয় নাই। সেজন্য মনটা খুবই খারাপ হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলেন বাড়ীতে যাইয়াই গোপালের সহিত কথা বলিয়া মনটা শান্ত করিয়া লইবেন। তাহা তো খুবই হইল! গোপালের উপর সংসার ও স্ত্রী-পুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে বিদেশে থাকিতে পারিতেন, তাহাও গেল। এখন উপায়? বেশী সময় বসিয়া ভাবিতেও পারিলেন না। গোপাল যদিও অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবু, দীনবন্ধুর প্রাণ সে নিষেধ মানিল না। দীনবন্ধু অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে খোঁজ করিতে লাগিলেন। পরিচিত মহলে কোথাও পত্র দিয়া, কোথাও বা লোক পাঠাইয়া, আবার কোথাও বা নিজে যাইয়া সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু, সন্ধান মিলিল না। পরবর্তীকালে জানা গিয়াছিল যে, গোপাল সংসার ত্যাগ করিয়া কিছুদিন শ্রীশ্রীগৌরীমাতার নিকটে থাকিয়া ওখান হইতে নীলাচল অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন; সঙ্গে উক্ত মঠের আরও একটি ভক্ত ছিলেন। হাঁটাপথে অনেক খেয়া পার হইতে হয়, খেয়ার মাঝি গোপালকে বিনা মাশুলে পার করিতে চায় বটে কিন্তু সঙ্গের ভক্তটিকে পার করিতে চায় না; গোপাল সেই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সঙ্গে কিছু আছে কিনা সে বলে, দশ আনা পয়সা আছে। তাহাতে গোপাল বলেন, উহা ত্যাগ না করিলে উহারা তোমাকে পার করিবে না।

কিছুদিন এইভাবে সন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া দীনবন্ধু অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হইলেন। হঠাৎ একদিন কাশীধাম হইতে একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে গোপাল কিছু টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছেন। দীনবন্ধু ভাবিলেন, টাকার অভাবে বোধ হয় গোপাল আসিতে পারিতেছে না, তাই তাড়াতাড়ি পনেরটি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন এবং শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিয়া দিলেন। একদিন দুইদিন করিয়া একমাস গত হইল, গোপাল আসিলেনও না বা কোন সংবাদ দিলেন না। দীনবন্ধু অনেক কিছু অনুরোধ করিয়া সেই ঠিকানায় একখানি পত্র দিলেন। কয়েকদিন পরে পত্র ফেরৎ আসিল নামের উপর লাল কালিতে লেখা "মালিক এ ঠিকানায় নাই।' দীনবন্ধু আর কি করিবেন, অগত্যা নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিলেন। প্রায় দেড়মাস পরে আবার টাকা পাঠাইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া গোপাল পত্র দিলেন। এবার পত্রে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "বৃথা আমার সন্ধানে লোক পাঠাইবেন না, টাকা পাঠাইলেই হইবে।" ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ দীনবন্ধু মনে করিলেন, টাকার অভাবে না জানি ভাইয়ের কত কষ্টই হইতেছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন এবং সেই দিনই ঐ ঠিকানায় একটি বিশ্বস্ত লোককে পাঠাইলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক গোপালকে আনা চাই। যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তার-যোগে আমাকে জানাইবে, আমি নিজে যাইব। কিছু, অর্থ সঙ্গে লইয়া লোকটি রওনা হইয়া গেলেন।

যথাকালে লোকটি কাশীধামে পৌঁছিয়া নিদিষ্ট ঠিকানায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আজই বেলা ১১টার সময় গোপাল কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। লোকটি সেদিন সেখানে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু সারা দিন-রাতের মধ্যে গোপালের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। পরদিন প্রাতে বাড়ীওয়ালার একবন্ধু একখানি খামের চিঠি আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীতে যে যুবক সন্ন্যাসীটি কিছু দিন ছিলেন, তিনি এই পত্রখানি আপনাকে দিবার জন্য আমার হাতে দিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।' বাড়ীওয়ালা তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া দেখেন, উহার ভিতরে পাঁচ টাকার একখানি নোট ও এক টুকরা কাগজে লেখা আছে—"আপনাকে কয়েকদিন যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। আমি বিদায় নিলাম, এখন আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। আজই আমি কাশীধাম ত্যাগ করিব। প্রেরিত টাকা হইতে আপনার ঘরভাড়া বাবদ যাহা নিতে হয় তাহা নিবেন, আর অবশিষ্ট টাকা বিশ্বনাথের সেবায় অথবা দরিদ্ররূপী

নর-নারায়ণের সেবায় ব্যায় করিবেন। নমস্কার।”

দীনবন্ধুর প্রেরিত লোক পত্রের মর্ম্ম অবগত হইরা স্থির করিলেন যে, গোপালের আর ওখানে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই দিনই তিনি অন্য কয়েকটি সাধুর আস্তানায় অনুসন্ধান করিয়া কোন খোঁজ না পাইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার বিশেষ পরিচিত কাশীবাসী জনৈক বন্ধুর সহিত দেখা হওয়ায় তাহার নিকট কাশী আগমনের কারণ বলিলে বন্ধুটি বলিলেন, “আমি যদিও তোমার বর্ণিত লোককে চিনি না, কিন্তু তোমার নিকট তাঁহার যেরূপ বর্ণনা শুনিলাম, তাহাতে মনে হয় আজই দ্বিপ্রহরে আমি তাঁহাকে আরও দুই তিনটি সন্ন্যাসীর সহিত ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে দেখিয়াছি। আমি আমার এক আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সন্ন্যাসীরা নাকি হরিদ্বারে যাইতেছেন।” দীনবন্ধুর প্রেরিত লোকটির সেদিন আর কলিকাতা রওনা হওয়া হইল না। উক্ত বন্ধুটির সহিত কয়েকটি স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে দুই তিন দিন তাঁহার বাড়ীতেই থাকিয়া গেলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না; গোপালের কোন খোঁজই মিলিল না, তাই শেষে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন।

লোকটির নিকট সবিশেষ শুনিয়া দীনবন্ধু হরিদ্বারে পরিচিত সাধুমহলে এবং বন্ধুগণের নিকট কয়েকখানি পত্র দিলেন। ঐ সঙ্গে পুরীধামেও দীনবন্ধুর সহাধ্যায়ী রাসবিহারী চক্রবর্তীকে একখানি পত্র দিলেন। এই চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদিও দীনবন্ধুর স্বদেশবাসী, কিন্তু এখন আর দেশে থাকেন না, সস্ত্রীক পুরীতেই বাস করিতেছেন। দুই চারি ঘর যজমান যাহা তাঁহার ছিল, তাহাতে যাহা পাইতেন তাহাতেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এক প্রকার চলিয়া যাইত : উহারা নিঃসন্তান ছিলেন। ব্রাহ্মণ দীনবন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের মত দেখিতেন; যখনই দেশে যাইতেন বা দেশ হইতে পুরী আসিতেন, তখনই একবার করিয়া দীনবন্ধুর সহিত দেখা না করিয়া ফিরিতেন না, তাই দীনবন্ধু গোপালের বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া তাঁহাকেও পত্র দিলেন।

হরিদ্বার হইতে দুই একখানা পথের উত্তর আসিল কিন্তু গোপালের কোন সংবাদই তাহাতে পাওয়া গেল না। দীনবন্ধু এখন এক প্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিয়াছেন; কারণ, পরিচিত মহলে কোথাও যে কাহারও সহিত গোপালের দেখা হইয়াছে, এমন খবর কেহই এখন পর্যন্ত কিছু দিতে পারে নাই। এইভাবে বৎসরাধিক কাল গত হইল, গোপাল ফিরিলেনও না কিংবা টাকা পয়সার জন্য আর কোন পত্রও দিলেন না। ইতিমধ্যে বাধ্য হইয়া দীনবন্ধুকে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দীনবন্ধুর নিকট

দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের নিজ বসতবাটী ১১ নং অভয়চরণ সরকার লেনে দীনবন্ধুকে থাকিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে গোপালের গৃহত্যাগের পর সংসারে অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় দীনবন্ধুরও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে বিদেশে যাওয়ার বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। ওখানে থাকিলে নিশ্চিত মনে বাহিরে থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া উহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথাসময় দীনবন্ধু সস্ত্রীক তিনুমণিকে লইয়া উক্ত অভ্যাচরণ সরকার লেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার দীনবন্ধু সতীশবাবুর মায়ের উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুনরায় পাঠ বক্তৃতাদি করিতে বিদেশে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

বাংলা ১৩০৫ সালের দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন দীনবন্ধু সস্ত্রীক কালীঘাটে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। বাসায় ফিরিতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে সদর ঘরে একখানি খামের পত্র দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, গতকল্য তাহাদের অনুপস্থিতিকালে ডাকপিয়ন পত্রখানি দিয়া গিয়াছে। পত্রখানি খুলিয়া দেখিলেন, পুরী হইতে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত রাসবিহারীবাবু, লিখিয়াছেন—

"ভাই দীনু! (দীনবন্ধুকে তিনি দীনু বলিয়া ডাকিতেন) তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তোমাকে পত্র দিব ভাবিতেছিলাম। আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীমান গোপাল ভায়াকে এখানে এক বাবাজীর সহিত বেড়াইতে দেখিতেছি। অনুসন্ধানে জানিলাম বাবাজীর নাম "গোবিন্দ দাস"। তাঁহার সহিত আরও দুই চারিজন মধ্যে মধ্যে থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের নিকটেই প্রায় ইহাদের সহিত দেখা হয়, গতকল্য আর একজন বাবাজীর নাম জানিতে পারিয়াছি "নবদ্বীপ দাস"। আমি গোপালের নিকট তাহার এখানে আগমনের কারণ ও এভাবে ইহাদের সহিত থাকিবার উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিলাম ; তাহাতে গোপাল যে ভাবের উত্তর আমাকে দিল, তাহাতে মনে হয় প্রকৃত কারণ সে আমার নিকট গোপন করিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান বেশভূষা, কথাবার্ত্তা মোটেই সংসারী লোকের মত নয়। বিশেষতঃ যাহাদের সহিত সে আছে, তাহারা তো সকলেই বৈরাগী বাবাজী। বুঝিতে পারিতেছি না, গোপালের উদ্দেশ্য কি! তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম আমার অনুমান সত্য। এখনও গোপাল এইখানেই আছে। তুমি যদি নিজে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাও, তাহা হইলেই ভাল হয়। তোমার কোনও অসুবিধা হইবে না, যে কয়দিন থাকিতে হয় আমার বাসাতেই থাকিবে। অন্যান্য খবর এক প্রকার ভালই। আমার প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার রাসুদা"

দীনবন্ধু পত্র পাইয়া রাসবিহারীবাবুকে জানাইলেন, "আমি যতদিন না যাই। ততদিন গোপালের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, সে যেন অন্য কোথাও চলিয়া না যায়। আমি শীঘ্রই যাইতেছি।" পত্র দিলেন বটে, কিন্তু বালিকা বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজনে পুরী যাইতে কয়েকদিন বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে রাসবিহারীবাবুর দ্বিতীয় পত্রে জানিতে পারিলেন যে, "গোপাল সখীবেশ ধারণ করিয়াছে, এখন আর সে অন্যান্য বাবাজীদের সহিত রাস্তায় বাহির হয় না। আর ইহারা পূর্ব্বে যে মঠে ছিলেন সেখান হইতে উঠিয়া উহারই নিকটে "ঝাঁজপিটা" মঠে অবস্থান করিতেছেন।"'

রাসবিহারীবাবুর দ্বিতীয় পত্র পাইয়াও দীনবন্ধু নিজে যাইতে না পারায় প্রিয় শিষ্য অটলবিহারীকে পাঠাইয়া দিলেন। অটলবিহারী বি-এ পাস, যুক্তিতর্ক করিয়া গোপালের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে—এই ছিল দীনবন্ধুর ধারণা। কিন্তু ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার ক্ষমতা তো কাহারও নাই; অটলবিহারী যথা-সময় ঝাঁজপিটা মঠে গিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া আগমনের কারণ জানাইলেন! কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বাবাজী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া গোপালকে ফিরাইয়া আনা তো দূরের কথা, নিজেও উহাদের সহিত ভেকাশ্রয় করিয়া রহিয়া গেলেন। দীনবন্ধুর নিকট এই সংবাদ আসিলে অটলবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিবাবু দীনবন্ধুর আদেশ লইয়া গোপাল ও অটল দুইজনকেই ফিরাইয়া আনিবেন সংকল্প করিয়া উক্ত মঠে গেলেন। কিন্তু তাঁহারও সেখানে যাইয়া মত পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি ওখান হইতে কয়েকটি ভক্তের সহিত তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। রাসবিহারীবাবু নিয়মিতভাবে মঠে যাইয়া এই সকল ঘটনা জানিয়া দীনবন্ধুকে পুনরায় পত্র দিলেন।

এবার দীনবন্ধু পত্র পাইয়াই পুরী রওনা হইলেন। যথাসময়ে পুরীতে পৌঁছিয়া রাসবিহারীবাবুর বাসায় থাকিয়া তাঁহারই সহিত গোপালের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দিন যাইয়া কাহারও সহিত দেখা হইল না; শুনিলেন, গতকল্য সন্ধ্যার সময় বাবাজীরা কীর্ত্তন করিতে কোথায় গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। গোপাল সখীবেশ ধারণ করিয়া মঠের ভিতরেই ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিলেন না। একজন সেবকের নিকট শুনিলেন, গোপালের নাম হইয়াছে "ললিতা সখী"। ইঁহারা সেখানে অপেক্ষা না করিয়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিয়া সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন মঠে যাইয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় অন্যান্য আলোচনার পর দীনবন্ধুকে বলিলেন, "যাঁহার ইচ্ছায়

ও আসিয়াছে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তুমি আমি কি ব্যবস্থা করিব?” দীনবন্ধুর একান্ত আগ্রহে গোপালকে ডাকা হইল, দীনবন্ধু নানাভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য। কিছুতেই যখন গোপাল রাজী হইলেন না, তখন দীনবন্ধু বলিলেন, “আমি তোমাকে পুলিশ আনিয়া জোর করিয়া লইয়া যাইব।” গোপাল এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একবার মুখে তুলিয়া দীনবন্ধুর দিকে ও বড় বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন বড় বাবাজী মহাশয় দীনবন্ধুকে ধীরে ধীরে বলিলেন, “তুমি পণ্ডিত, তোমাকে বিশেষ বুঝাইতে হইবে না, ও যখন এখানে থাকিতে চাহিতেছে, বেশ তো, থাকুক না কিছুদিন; তারপর যখন এ জায়গা এর ভাল লাগিবে না, তখন ও নিজেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখ, ও তো নিতান্ত বালক নয় যে, উহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে? এখন উহার অমতে কোন কিছু করিও না। তার এমন কিছু অন্যায় কার্য্যও ও করিতে যাইতেছে না, যাহার জন্য বাধা দিবে। ও তো মূর্খ নয়, কয়েক দিন উহার সহিত আলোচনা করিয়া উহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। থাকুক এখানে, তোমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইবে।” অনেক তর্ক অনেক কথা দীনবন্ধু তুলিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গোপাল ঐখানেই থাকিয়া গেলেন, কাজেই দীনবন্ধুকে একাই সে যাত্রা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। আসিবার সময় রাসবিহারীবাবুকে উহার উপর একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া আসিলেন। দীনবন্ধু বুঝিয়াছিলেন, গোপাল আর ঘরে ফিরিবে না। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন যে, তবুও যদি নিদিষ্ট কোনও স্থানে থাকে, তাহা হইলেও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাওয়া যাইবে বা দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিবে।

দেশে মাতাঠাকুরাণীর নিকট সংবাদ গেল, “গোপাল সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে।” প্রথম প্রথম তিনি খুবই কান্নাকাটি করিলেন, শেষে বাল্যকালের জ্যোতিষ ঠাকুরের ও সন্ন্যাসীগণের উক্তি সকল স্মরণ করিয়া এবং অন্য বর্ষীয়সী মহিলাগণের পরামর্শে কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তবে সেই হইতে সংস্কৃত শিক্ষার উপর মাতা ঠাকুরাণীর কেমন যেন এক বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে, “অল্প বয়সে বেশী সংস্কৃত পড়িলেই সন্ন্যাসী হইয়া যায়।” বলা বাহুল্য, একথা তিনি দীনেশের পাঠের সময় দীনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন। দীনবন্ধু যখন দীনেশকে স্কুল ছাড়াইয়া সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “যদি দীনেশকে সংস্কৃত পড়াইতে ইচ্ছা হয়, তবে আগে উহার বিবাহ দিয়া লও।

এক পোড়াকপালে (গোপালকে লক্ষ্য করিয়া) ঐ ছাই পড়িয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে, আবার এটাকেও ঘর ছাড়া করিস না।' যাহা হউক, মা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া দীনবন্ধুকে সর্ব্বদা গোপালের সংবাদ রাখিতে আদেশ দিয়া পত্র দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার অল্প দিন পূর্ব্বেই বড় বাবাজী মহাশয়ের হাতে ঝাঁঝপিটা মঠ আসিয়াছে। ইহার পুর্ব্বে উহারা রাম-চণ্ডীসাহি শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জে থাকিতেন। শুনিয়াছি ঐ স্থানেই নাকি ১৩০৬ সালের কার্তিক মাসে শ্রীশ্রীগোপাষ্টমীর দিন গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ হয়। আরও শুনিয়াছি যে, ঐ ১৩০৬ সনের মাঘ মাসে ঝাঁজপিটা বড় বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করেন এবং সেই অবধি ঐ মঠেই সপরিকরে বাবাজী মহাশয় বাস করিতে থাকেন। এ বিষয়ে নিত্যধামগত নগেন দাদা, পরমানন্দ দাদা, শ্যামদাদা প্রভৃতির নিকট যেরূপে শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম যদি অন্য কোন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারিব না।

গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে বড় বাবাজী মহাশয়ের পবিত্র লীলাকাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে 'চরিত-সূধা' গ্রন্থে যাহ লিখিত হইয়াছে, তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"......জয়গোপাল (গোপালকৃষ্ণকে বড় বাবাজী মহাশয় জয়গোপাল বলিতেন) তত কীর্ত্তন প্রিয় নহে, উহার কেবল সেবার প্রতি লক্ষ্য। উহার মনের ভাব, সর্ব্বদা ঘরে থাকিয়া সেবার কার্য্য করে। বাবাজী মহাশয়কে দেখা অবধি জানি না উহার মনের মধ্যে কি ভাব; কিন্তু কখনও মুখ তুলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চোখের দিকে তাকাইতে পারেন না বা কোনও কথা বলেন না। উহার সম্বলের মধ্যে কেবল চোখের জল। কথায় কথায় কান্না। কখনও বাবাজী মহাশয় হাত ধরিয়া কাছে ডাকিলে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি মৃদুস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া দূরে চলিয়া যায়। উহার যত কিছু আব্দার গোবিন্দদাদা ও নবদ্বীপ দাদার উপর।

বেলা প্রায় নয়টা। এই সময় মাধব পশুপালক (জগন্নাথদেবের শিঙ্গারী পান্ডা) জগন্নাথের চরণতুলসী, কণ্ঠমালা ও অবকাশ-জল (স্নানজল) লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই শশব্যস্তে উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। চরণতুলসী ও কণ্ঠমালা বাবাজী মহাশয়কে দিলে ইনি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। জয়গোপাল (গোপালকৃষ্ণ) বাতাস করিতেছিল। মাধব পশুপালক বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, 'দেখুন আমি যখনই ইহাদিগকে দেখি তখনই যেন আমার বোধহয় ইহারা ব্রজের সখী। বলিতে

কি একদিন জগমোহনে কীর্ত্তনের মধ্যে ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছিল, আমি সকাল ধূপের পূজো করিবার সময় দেখিলাম যেন ইহাদের ঘাগরা পরা। মনে ভাবিলাম আজ বাবাজী মহাশয় বোধহয় ইহাদিগকে সখী সাজাইয়া আনিয়াছেন। আহা কি সুন্দর ভাব। যেমন মনে করিয়াছি অমনি জন্নাথের কণ্ঠমালাগাছটি খসিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইহার ভিতর কোন অপূর্ব্ব রহস্য আছে। ভোগের পর ঐ মালাগাছটি আপনাকে আনিয়া দিলে আপনি কিছু, সময় গলায় রাখিয়া এই ছেলেটিই হউক বা ঠিক এই রকম অন্য একটি ছেলের হাতে দিলেন। সেদিন আপনাকে একথা বলিতে পারিলাম না, আজ সেই কথাটি বলিব বলিয়াই আসিয়াছি।' তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, 'আপনারা জগন্নাথের অন্তরঙ্গা সখী, আপনাদের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। আপনি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হউক।' বলিয়া জয়গোপালকে ইসারা করিলে সেও উঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করায় তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'জগন্নাথ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।' ক্রমে সকলেই প্রণাম করিলে সকলকেই ঐরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় একটি ছেলেকে বলিলেন "খোল করতাল লইয়া আইস, আজ রাধারমণ জীউর মধ্যাহ্নলীলা গান হইবে।' তখনই খোল করতাল আসিল। কুঞ্জবাবুকে বলিলেন, 'কুঞ্জ গোষ্ঠগান কর'ত। কুঞ্জবাবু গান ধরিলেন। এদিকে শ্রীরাধারমণজীউর গোষ্ঠবেশ হইল, গোষ্ঠ গমন কীর্ত্তন হইতেছে। যেমন শ্রীমতী তুঙ্গমণি মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন এই পদটি কীর্ত্তন হইতে লাগিল, অমনি জয়গোপাল শ্রীমতীকে একখানি চৌকির উপর বসাইয়া সকলের ভাবোদ্দীপন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে যেমন যেমন ভাব বর্ণনা হইতে লাগিল, ঠাকুরের ঠিক তেমনি তেমনি বেশভূষাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যেন. প্রকট হইয়াছে, তৎসহচর সহচরীগণ কীত্তন ও নর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে রাধাকুণ্ড মিলন হইল। রাধারাণী বামে বসিলেন। জয়গোপাল ও অদ্বৈত দাস দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। রাধাবিনোদ কিশোরী, গোপাল ও অন্যান্য চার পাঁচজন নৃত্য করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় রাধাকুণ্ডের বর্ণনা ও রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই। সকলেই আত্মহারা, সকলেই উন্মত্তভাবে নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কে কোথায় পড়িতেছে, কে কোথায় ভাবে গড়াগড়ি দিয়েছেন ঠিক নাই। জয়গোপাল রাধারমণজীউর ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন আর অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রতিবেশিনী অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বাবাজী

মহাশয় যেমন উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি চারিদিকে উলুধ্বনি হইতে লাগিল।

এদিকে জয়গোপাল রাধারমণ জীউর নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অদ্বৈত প্রভৃতি নানারূপ সেবাতেও চৈতনা করিতে না পারিয়া একটু ভাবিত হইলেন। এই সময় বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে রাধারমণজীউর নিকট গিয়া যেমন উহার কর্ণে কি মন্ত্র প্রদান করিলেন, অমনি চৈতন্য লাভ করতঃ শশব্যস্তে মাথায় কাপড় দিয়া ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বাহিরে আসিয়া আবার কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। খুব কীর্ত্তন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন লোক একখানি শাড়ী নবদ্বীপ দাদার হাতে দিয়া বলিল, "আপনাদের নাকি একখানি শাড়ীর দরকার? কে পরিবে, তাই আমি লইয়া আসিলাম। শুনিয়া সকলে অবাক্। নবদ্বীপদাদা বাবাজী মহাশয়কে শাড়ীখানি দেখাইলে ইঁনি একটু মাথায় ছোঁয়াইয়া নবদ্বীপ দাদাকে ইসারা করিলেন। নবদ্বীপ দাদাও শাড়ীখানি রাধারানীর প্রসাদী করত বাবাজী মহাশয়ের চাদরের উপর পরাইয়া মাথায় দিলেন। চারিদিকে ভক্তগণ—'জয়রাধে জয়রাধে' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের অঙ্গে পুলক আরক্তিম নয়নযুগল হইতে জলধারা বহিয়া গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভাবগদগদ-কণ্ঠে কত কি প্রার্থনা করিতেছেন। সঙ্গীগণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন আর বাবাজী মহাশয়ের সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তিখানি দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইঁনি কীর্ত্তনে আরও অনেকবার শাড়ী পরিয়াছেন, কিন্তু এমন অপরূপ রূপে আর কখনও হয় নাই। সম্পূর্ণ পরিবর্তন, যেন বাবাজী মহাশয়ের মূর্ত্তি বলিয়াই কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না। বহুক্ষণ পরে বেলা আন্দাজ সাড়ে বারটার সময় কীর্ত্তন শেষ করতঃ শাড়ীখানি নবদ্বীপের হাতে দিয়া কি বলিলেন। নবদ্বীপ ঘরে গিয়া জয়গোপালকে শাড়ীখানি পরাইয়া দিলেন। কেহ কেহ উহার হাতে তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন। তখন নবদ্বীপ উহার হাত ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিলে ইনি ভাব-গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'রাধারাণীর কৃপাদত্ত বস্তু যত্নে রাখিও; আনন্দ পাইবে। আমার ভাগ্যে হইল না, প্রভু তোমাকে কৃপা করিলেন, সুখের বিষয়, কেবল বেশ করিলেই হইবে না, বেশোচিত কার্য্য করা চাই। সখীভাব অঙ্গীকার করিতে হইলে সম্পূর্ণ আত্মসুখবর্জ্জিত নিষ্কাম ব্রজগোপীদিগের ভাব, স্বভাব ইচ্ছা ও অহংকারের আনুগত্যে হৃদয় গঠিত করিয়া সাধন করিতে পারিলে তদবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সর্ব্বদা দাসীভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধরূপে

তদ্‌যোগ্য আচরণ করা প্রয়োজন। ভাবানুযায়ী স্বভাব গঠিত করিতে না পারিলে ভাব স্থায়ী হওয়া কঠিন। স্বভাব গঠন করিবার প্রধান উপায় সেবা অর্থাৎ নিত্য-জ্ঞানে শ্রীমুর্ত্তির কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপে সেবা, প্রাণীমাত্রে শ্রীগুরুর প্রকাশ জ্ঞানে, বৈষ্ণব কৃষ্ণ অভিন্ন বোধে অবিচারে সেবা করিতে পারিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে।' ইত্যাদি বহু প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি নাম রাখা হইবে?

বাবাজী—তোমাদের সকলের কি ইচ্ছা বল।

নবদ্বীপ—আমাদের ইচ্ছা 'ললিতা দাসী'।

সকলেই নবদ্বীপ দাদার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই হইতেই ললিতা দাসীকে কেহ 'সখী বাবাজী' কেহ 'বউ বাবাজী', কেহ 'দিদি', কেহ 'মা', ইত্যাদি আপনাপন ইচ্ছানুরূপ নামে ডাকিতে লাগিল ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়, নবদ্বীপ দাদা, গোবিন্দ-দাদা প্রভৃতি যাহাতে ইহার ভাবের পুষ্টি হয়, সর্ব্বদা তদনুকূল কার্য্য করিতে লাগিলেন।" ('চরিতসুধা, ২য় খণ্ড)

একবার বড় বাবাজী মহাশয়ের উৎসবের সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসিয়া 'চরিতসুধা'র বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে আমি অন্যরূপ জানি।" আমি তখন তাঁহাকে যাহা জানেন বলিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিলেন। সেখানে পূজনীয় নন্দদাদা এবং অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি জীবনীতে কোন্‌টি দিব?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তা আমি বলিতে পারিব না। গোঁসাই প্রভুরা আছেন এবং এ বিষয় জানেন এমন কেহ কেহ এখনও নীলাচলে বর্তমান রহিয়াছেন। তুমি যদি পার তাঁহাদের সহিত এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া লও। আমি যাহা জানি বললাম।" বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি পড়িলাম উভয় সঙ্কটে। আমার পক্ষে কোন্‌টি গ্রাহ্য, কোনটি ত্যজ্য, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি বাবাজী মহাশয়ের বক্তব্যটি লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম—ঠিক হইয়াছে কিনা। তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক হইয়াছে।" আমি উহা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

আমার জীবনী প্রকাশের ব্যগ্রতা একটু হ্রাস পাইল। কারণ, এই দুইটি বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে কোন্‌টি প্রকাশ করি, কোন্‌টি প্রকাশ করিব না—এ বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ১৩৪৭ সালে চৈত্র মাসে একবার

বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে তাপং যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। সেখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পুরী যাই এবং ঝাঁজপিটা মঠে কয়েকদিন থাকি। সেই সময় আমার লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি বাবাজী মহাশয়কে আদ্যন্ত শুনাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। সেখানে প্রাচীন বাবাজী মহাশয়দিগের কেহ কেহ ছিলেন এবং গোস্বামী প্রভুরাও শুনিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট দুইটিই বর্ণনা করিয়াছিলাম। তাঁহারা দুইটিই সমর্থন করিলেন। বলিলেন, বাবাজী মহাশয়ের বর্ণনাটি যে রাত্রে হয়, তাহার পরের দিন দ্বিপ্রহরেই 'চরিতসুধা'র বর্ণিত ঘটনা ঘটে; কাজেই ইহার কোনটিই অসত্য নয়, কোনটিই বাদ দিও না।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, পাঠক-গণকে তাহা জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "গোপাল, রাধাবিনোদ, করুণা, শরৎ ও রঘুনাথ দাস—এই কয়দিন মিলিয়া গোপনে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গভীর রাতে অভিসার, রাস, অলস প্রকৃতি কীর্ত্তন করিতেন। রসপুষ্টির জন্য এক একজন ভাবনুযায়ী বেশে সজ্জিত হইতেন। ঐ অবস্থায় কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে এমন বিভোর হইতেন যে, নিজ নিজ ভাব ভুলিয়া বেশানুযায়ী ভাবে এক একদিন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কোনরূপে বাহ্য স্মৃতি থাকিত না। এইভাবে একদিন অলস কীর্ত্তন করিতে করিতে এমন আবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, কীর্ত্তনান্তে সেই ঘরের মধ্যেই সজ্জিত শয্যায় শ্রীকৃষ্ণবেশী শরৎ ও শ্রীরাধিকাবেশী রাধাবিনোদ পরস্পর যুগলবেশে শয়ন করিলেন। গোপাল ললিতার অভিমানে ঘরের এক কোণে বসিয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রাতটুকু অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে পক্ষীকুলের কল-কুজনে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় গোপাল ছাড়া অপর সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজ নিজ বেশ ত্যাগ করিয়া একটু লজ্জিত অবস্থাতেই মঠের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু গোপাল ললিতার আবেশে এমন সুখের নিশি এত শীঘ্র শেষ হওয়ায় বিধিকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে বসিয়া লীলাস্মরণ করিতে করিতে সময়ানুযায়ী প্রাচীনপদ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। এদিকে বেলা বাড়িতে লাগিল বড় বাবাজী মহাশয় সকলকেই দেখিতেছেন, কিন্তু গোপালকে দেখিতে পাইতেছেন না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, গোপাল ঐ ঘরের মধ্যে আছেন। তখন তিনি নিজে তথায় যাইয়া গোপালকে বাহিরে আসিতে বলিলেন, কিন্তু গোপাল ঘরের বাহির হন না। বাবাজী মহাশয় তখন নানারূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই যখন গোপাল বাহিরে আসিলেন না, তখন

যেন একটা ক্রোধাবেশেই বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, "তুমি উহাকে কেন তিরস্কার করিতেছে ? যে কারণে ও লজ্জায় বাহির হইতে পারিতেছে না, তোমার সে অবস্থা হয় নাই বলিয়া কি তুমি উহাকে শাসন করিতেছ? তুমি গুরু তোমার হইল না আর শিষ্যের হইল, ইহাতে কি তুমি ক্ষুন্ন হইয়াছ? ও যে ভাবে বিভোর আছে, তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এখন উহার সেই ভাবের যাহাতে পুষ্টি হয় তাহা করা।" এই ইঙ্গিত পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের মনোভাব যেন আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি গোপালকে অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি বাহিরে এস. তোমার কোনও ভয় নাই। কোনরূপে সংকোচ করিবারও তোমার কারণ নাই। আমি এখন হইতে সকলকে লইয়া যাহাতে তোমার ভাবপুষ্টি হয়, তাহাই করিব।" এইবার গোপাল কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে পতিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় ভাববিহ্বল কণ্ঠে 'এস এস' বলিয়া তাঁহাকে বাহু পশারিয়া তুলিয়া লইলেন। উপস্থিত ভক্তগণ "গৌর হরিবোল" ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বলা বাহুল্য গোপালের তখনও সেই আবেশানুরূপ বেশ বর্তমান ছিল।

'চরিতসুধা'র বর্ণনা এবং শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের বর্ণনা ভিন্ন প্রকারের হয়। কিন্তু নীলাচলধামে কয়েক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিলেন, "দুইটিই ঠিক। যেদিন রাতে গোপালের ঐরূপ ভাবান্তর হয়, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নেই কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ দাদার হাত দিয়া শাড়ীখানি তাঁহাকে পরাইয়া দেন এবং 'ললিতাদাসী' নাম প্রদান করেন। পূর্ব্বরাত্র হইতে ললিতার ভাবাবেশে গোপাল তন্ময় হইয়াছিলেন, এখন ভাবানুযায়ী বেশ ও নাম পাইয়া ভাবের পরিপুষ্টিই হইল।" প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ ইহারা একটা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন, মধ্যে মধ্যে উহার একটা ধার পীঠের উপর দিয়া মাথায় দিয়া নৃত্য করিতেন। সে সময় হঠাৎ উহাদিগকে কেহ দেখিলে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বড় বাবাজী মহাশর গোপালের স্থির ধীর ভাব সেবানৈপূণ্য ও লীলানুভবাদি দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন, "জয়গোপালের যাহা কিছ, লাভ হইয়াছে, একমাত্র অকপটে চৈতন্যদাসের সেবার ফলে।' এই চৈতন্যদাস বড় বাবাজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শুনিয়াছি, শেষ জীবনে গ্রহণী রোগে নীলাচলধামেই রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে উঠিবার পূর্ব্বক্ষণেই ইনি দেহরক্ষা করেন।

এও এক অপূর্ব্ব ভঙ্গী। জগন্নাথদেব রথে চড়িয়া গুণ্ডিচায় যান। গুণ্ডিচাই যেন শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীজগন্নাথ বৃন্দাবন যাইতেছেন, তাহার পূর্ব্ব ক্ষণেই চৈতন্যদাস যেন বৃন্দাবন বিহারীর লীলায় প্রবেশ করিলেন। বড় বাবাজী মহাশয় যেন এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়াই বলিয়াছিলেন, 'চৈতন্যদাস বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছে।'

গোপাল গৃহত্যাগ করিয়া নানাতীর্থ পরিভ্রমণের পর নীলাচলধামে আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই মিলনের পূর্ব্বে বড় বাবাজী মহাশয়েরই কৃপাপ্রাপ্ত নবদ্বীপদাস ও গোবিন্দদাস এই দুইজন গোপালকে অনেক কিছু কৃপা করিয়াছিলেন। গোপাল এ কথা বিস্মৃত হন নাই। সখীবেশ ধারণের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, "নবদ্বীপদাদা" বলিতে কেমন যেন ভাবে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। অনেক সময় ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিত এবং নয়ন ধারায় প্লাবিত হইতেন। চরিতসুধায় নবদ্বীপ দাদার প্রতি নিবেদনটি পাঠ করিলে এ বিষয় সম্যক অবগত হওয়া যায়।

সখীবেশ ধারণের পর গোপালকৃষ্ণ দুই বার মাকে দেখা দিয়াছিলেন। একবার শ্রীশ্রীমৎ বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত ভবানীপুরে আর একবার কোঁড়ার বাগানে। ভবানীপুরে যখন আসিয়াছিলেন, তখন অন্যান্য অনেকের সহিত হাওড়া সালিখা নিবাসী হরিদাস বাবাজী মহাশয়ও ছিলেন। বোধ হয় সেটা ১৩০৭ কিংবা ১৩০৮ সালের ফাল্গুন চৈত্র মাসে হইবে। সেবারে বড় বাবাজী মহাশয়ের শুভাগমনে 'ভাগবতধর্ম্ম' প্রচারিণী সভায় যে কীর্ত্তনানন্দের স্রোত বহিয়াছিল, ভবানীপুরবাসী বহুদিন তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী হইতে নবদ্বীপ যাইবার সময় গাড়ী না পাওয়ায় হাওড়া কোঁড়ার বাগানে দীনবন্ধুর বাড়ীতে দ্বিতীয় বার এক রাত বাস করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই গোপালের গর্ভধারিণী ও মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমি উপস্থিত ছিলাম।

ভবানীপুরে যখন আসিয়াছিলেন, সেই সময় একদিন আমাকে কোলের উপর বসাইয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাক্‌রুণ! আপনার তো অনেক আছে, আমার ঘরে ছেলে নাই, এইটি আমাকে দিন না ?' বলাবাহুল্য, মা এই কথা শুনিবামাত্র তাড়াতাড়ি আমাকে তাঁহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া "ষাট্ ষাট, বাছা আমার লক্ষেশ্বর হইয়া ঘরে থাক" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে নিজের কোলের মধ্যে বসাইয়া "তুই জাতনাশা, তোর ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, তুই আমাদের ছুঁস না" ইত্যাদি বলিয়া গোপালকে অনেক কিছু

শুনাইয়াছিলেন। তারপর হাওড়ায় যখন আসেন, তখন কাহারও সহিত বিশেষ কথাবার্তা বলেন নাই। একটা মোটা সাদা চাদর গায়ে জড়াইয়া সারা রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বসিয়া বসিয়াই কাটাইয়াছিলেন। এইখানেই মা বলিয়াছিলেন, 'গোপালরে, তুই ঘরে ফিরে আয়।' সখীবেশধারী গোপাল একবার মাত্র বলিলেন, "আমার জাত নাই, আমি ঘরে ফিরিয়া কি করিব ? আমাকে ছুঁইলে যে আপনাদেরও জাত যাইবে?' মা বলিলেন "তুই ঘরে আয়, আমি তোকে প্রায়শ্চিত করাইয়া আবার পৈতা দিয়া লইব।" গোপাল একটু হাসিলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। কিছুতেই যখন গোপালকৃষ্ণের ঘরে ফেরার মত পাইলেন না, তখন বলিলেন "তবে তুই অনুমতি দিয়ে যা, আমি দীনেশের বিয়ে দিই।" গোপাল তখন কোন উত্তর দিলেন না। অনেক দিন পরে আমার বিবাহের সংবাদ দীনবন্ধুর এক শিষ্য "দক্ষবালার" নিকট শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা ঠাক্‌রণের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে ? দীনেশের হাতে পায়ে বেড়ী পড়েছে ? তা বেশ!" ইহার পর অনেকেই অনেকবার নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি আর আসেন নাই।

নবদ্বীপে আসিবার পর মা অনেকবার গোপালকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দীনবন্ধুকে বলিয়াছেন, দীনবন্ধু ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গোপাল আসেন নাই। কি জানি কেন মাও নবদ্বীপে যাইতে কোনমতে রাজী হন নাই। শেষ জীবনে মা "গোপাল গোপাল" করিয়া খুব আক্ষেপ করিতেন। এমন কি এক এক সময় অসহ্য হওয়ায় বলিতেন, "ওরে, তোর জন্য আমার বুকের মধ্যে যেমন জ্বলুনি হচ্ছে তোরও এই মত হবে।" এটা যে মায়ের অভিমানের উক্তি, তাহা বলাই বাহুল্য। দেহত্যাগ সময় মা সাতদিন শিবপুরে ভড়পাড়া শ্মাশানঘাটে গঙ্গাতীরে ছিলেন। সেই সময় একবার গোপালকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। যাহাতে গোপাল আসিয়া মাকে শেষ দেখা দেখিয়া যান, তাহার জন্য দীনবন্ধুও নবদ্বীপে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু গোপাল আসিলেন না। শেষে লোকমুখে শুনা গিয়াছে, গোপাল নাকি বলিয়াছিলেন, "শেষ সময় যদি অসম্ভব একটা কিছু, আদেশ করে যান, আর আমি যদি সেটা পালন করতে না পারি, তাহলে আমার পক্ষে সেটা মহামুস্কিলই হবে।" সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যাহা বলে আমরা তাহাই শুনি। গঙ্গাতীরে মাতৃদেবী সাতদিন ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তৃতীয়দিন বৈকালে দীনবন্ধু মায়ের কাছে বসিয়া গীতা, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতির ভাল ভাল কথা বলিতেছেন, এ সময় দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপাল এখন কিভাবে আছে?" দীনবন্ধু সমস্ত বুঝাইয়া

বলিলেন যে, "সে সৎ সঙ্গেই জীবন-যাপন করিতেছে। সকলেই তাহার ব্যবহারে সুখী। ভজন সাধন আপনার গোপাল খুবই উন্নত হইয়াছে।" মা ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন এবং শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ষষ্ঠ রাত্রে সর্ব্বজ্ঞ ঠাকুর যা বলেছিলেন, সবগুলিই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল? থাক্ ও সুখে থাক, আমি পোড়াকপালী, জ্বালায় জ্বলি।' অভিমান করে সময় সময় অনেক কটুবাক্য গোপালকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেন আরার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন—"না-না, তুই সুখে থাক, তুই সুখে থাক্" ইত্যাদি।

মাতাঠাকুরাণীর জীবিতাবস্থায় আমার শ্রীধাম নবদ্বীপে যাইবার উপায় ছিল না। কারণ, মায়ের ধারণা, আমি গোপাল দাদার সঙ্গ পাইলেই এদিকের সব ভুলিয়া যাইব। তাই তিনি আমাকে কিছুতেই নবদ্বীপে যাইতে দিতেন না, আমিও দু'চার বার বলিয়া মত না পাওয়ার আর বিশেষ আগ্রহ দেখাইতাম না। দীনবন্ধু দাদা বলতেন "মা যাতে সন্তুষ্ট হন, তাই কর ভাই।" কাজেই অন্য সময় বা তেমন কোন উৎসব পদেও যাইবার ইচ্ছা হইলে আর কিছু না বলিয়া দীনবন্ধু দাদার কথা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়াই থাকিতাম। এখন তো আর মা ইহজগতে নাই, কাজেই বাধা দিবে কে? তাই দাদার অনুমতি লইয়া একবার নবদ্বীপে গেলাম। সেটা বৈশাখ মাসের শেষ বলিয়াই মনে আছে। বাগানবাড়ীতে সে-সময় কি একটা উৎসব। সেই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। আমার পরিচিত হাওড়া কোর্টের উকীল পরেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আমার সহিত গিয়াছিলেন। বাগানবাড়ীতে তখন বাহিরের সমাগত ভক্তবৃন্দের থাকিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই আমি পরেশবাবুর সহিত শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুদের বাড়ীতেই রহিলাম। কীর্তনের সময় বা পরেশবাবুর সহিত সখীজীর যখন কথাবার্তা হয়, তখন আমিও তাঁহার সহিত বাগান বাড়ীতে উপস্থিত থাকি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিতে হইল আমি যদিও সখীজীর কনিষ্ঠ, তথাপি কি জানি কেন দেখা হইলেই সখীজী আমাকে দণ্ডবৎ করেন। আমার ইহা মোটেই ভাল লাগে না, প্রাণে বড়ই ব্যাথা পাই। পরেশবাবু বা অন্যান্য যাঁহারা আমার পরিচয় জানেন, তাঁহারা এবিষয়ে আপত্তি জানাইয়া সখীজীকে বলেনও, কিন্তু তিনি কাহারও কোন আপত্তি শোনেন না। তিনি বলেন, "ওরা উচ্চ বংশ সম্ভূত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আমি গোয়ালিনী, আমার তো ওঁদের সম্মান করাই উচিত" ইত্যাদি। আমি দূরে দাঁড়াইয়া শুনি আর ভাবি—"এই কি আমার সেই গোপালদাদা ? আমার বাল্যকালের প্রতিটি আবদার যিনি হাসিমুখে প্রাণপন চেষ্টায় রক্ষা করিতেন, ইনি কি সেই ?'

দুই দিন এইভাবে গেল। তিনদিনের দিন কয়েকটি ভক্তের সহিত সখীজী 'মহাপ্রসাদ মহাত্মা' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় আমরা সেখানে উপস্থিত। সখীজী আমাদের দেখিতে পান নাই, আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া আলোচনা শুনিতেছি। সখীজী বলিতেছেন "শ্রীভগবানে নিবেদিত যাহা কিছু, তাহাই মহাপ্রসাদ। যে কেহ উহা স্পর্শ করুক না কেন, উহাতে মহাপ্রসাদ নষ্ট হয় না। এমন কি— "কুক্করাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।"

কিছু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রায়ই বলিতেন—

কৃষ্ণ নিবেদিত যে কিছু হইবে। মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে।।
স্পর্শদোষে কৃষ্ণ-প্রসাদ নষ্ট নাহি হয়। নষ্ট-দোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয়।।

এই ভাবের আলোচনা হইতেছে, এমন সময় পরেশবাবুকে দেখাইয়া একটি ভক্ত সখীজীকে কি যেন বলিলেন; অমনি সখীজী আমাদের দিকে চাহিয়া "আসুন আসুন" বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। পরেশবাবুও ছাড়িবার পার নহেন, তিনিও এক পাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া সখীজীর চরণধূলা লইয়া মস্তকে লইলেন। অবশ্য আমিও আমার সঙ্গীর অনুসরণ করিতে এটি করি নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগাবশতঃ চরণে হাত লাগিবার পরেই 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে সখীজী উঠিয়া সরিয়া গেলেন। পরেশবাবু ছাড়িলেন না, তিনি সখীজীকে বলিলেন, "দিদি! কেন তুমি এমন ক'রে আমাদের অপরাধী কর বল দেখি?" আমাকে দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন—"ঐ দেখ দেখি, দীনেশ ভয়ে জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে" এবার সখীজী বলিলেন "কেন, এতে ভয়ের কি আছে? আমি তো ওকে কিছু করি না, ওর পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমি দণ্ডবৎ প্রাণামাদি করি। উনি আমার স্নেহের পাত্র, তবে গলায় ঐ যে জাত সাপ (যজ্ঞসূত্র) ঝুলছে, ওইটাকেই আমার ভয়; কখন ফোঁস ক'রে ওঠে তার ঠিক কি?" এই কথা শুনিয়া সকলেই "গৌর হরিবোল' বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় কিছু সময় পূর্ব্বপ্রসঙ্গ আলোচিত হইয়া তখনকার মত আলোচনা বন্ধ হইল। ভক্তগণও নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। এই ভাবের বহু ঘটনা বাগানবাড়ীতে বসিয়া ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সাধু শাস্ত্র মুখে আমরা শুনিতে পাই গোপী-আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর্ত্তব্য। এই আনুগত্য নানা জনে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাভাব স্বরূপিণী অশেষ করুণাময়ী শ্রীরাধারাণী করুণা, করিয়া এই গোপীভাব প্রদান করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ সেবার যোগ্য করিয়া না দিলে শুধু বেশ ধারণে বা লোক-দেখান আচরণে কিছুই হইবে না। গোপালকৃষ্ণ যে নিজ ইচ্ছায় সখীবেশ ধারণ করেন নাই, ইহা আমি পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার সখীবেশ ধারণ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। কৃপাময়ী শ্রীরাধারাণীর অপার করুণায় গোপালকৃষ্ণ বেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশোচিত সাধনায় শক্তিও লাভ করিয়াছিলেন। এই করুণাবলেই তিনি সব প্রকার বিরোধী শক্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বৈষ্ণবজগতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-সাধনার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সাধনার এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বের কথা সাধারণ লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। তাই "ললিতা সখী" সম্বন্ধে কোন কোন মহলে অল্পবিস্তার বিরুদ্ধ আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা মোটেই বিচিত্র নয়।

গোপালকৃষ্ণের সখীবেশ ধারণের পর আমরা আর তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করিব না। এখন হইতে ললিতাসখী, সখীমা বা দিদি এই ভাবের পরিচয়ই দিব। দীন লেখক সখীজীকে 'দিদি" বলিয়াই সম্বোধন করিত। অনেক স্থলে হয়ত শুধু ঐ দিদি শব্দই ব্যবহার হইয়াছে, সে সকল স্থানেও ঐ ললিতা সখীকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ঝাঁজপিটায় অবস্থান

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণদাসদেব অর্থাৎ বড় বাবাজী মহারাজ পুরীধামে ঝাঁজপিটা মঠে স্বগণ-সঙ্গে মহানন্দে বিরাজ করিতেছেন। ললিতাসখী ও অন্যান্য ভক্তগণ যিনি যে জাতীয় সেবার অধিকার পাইয়াছেন তাহা করেন আর সুযোগমত বাবাজী মহারাজের সঙ্গে নামসংকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। নানাবিধ তত্ত্বকথায়, উপদেশে, কীর্তনে বড় বাবাজী মহাশয় পুরীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই কৃতার্থ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কটক, বালেশ্বর, ভূবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল বা তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ হইতে ভক্তগণ বড় বাবাজী মহাশয়কে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাবাজী মহাশয়ও বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া সঙ্গীগণ-সঙ্গে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করিতে গমন করেন।

সকল সময় যদিও ললিতা দিদির মঠ ছাড়িয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হয় না, তথাপি কোনরকমে সুযোগ সুবিধা করিতে পারিলেই পরমানন্দে ভক্তগণ সঙ্গে বাহির হইয়া পড়েন। যখন মঠে থাকেন, তখন বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত সেবার কার্য্যদি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহে সর্ব্বদাই যেন কেমন ম্রিয়মাণ ভাব। এমন কি এক একবার এমনও হইত যে,

যে কয়দিন বাবাজী মহাশয় মঠে না থাকিতেন, সে কয়দিন দিদি অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। বাবাজী মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রসাদ গ্রহণের আদেশ দিলে তবেই দিদি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন চলিবার পর বাবাজী মহাশয় অন্যত্র যাইবার সময় দিদির ভাবপুষ্টির জন্য যাঁহাদিগকে কাছে রাখিয়া যাইতেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

বড় বাবাজী মহাশয় স্বগণ-সঙ্গে এইভাবে নানা প্রকার আলাপ আলোচনা ও নামগুণলীলা কীর্ত্তন প্রসঙ্গদ্বারা গৌর-গোবিন্দলীলাকে প্রমূর্ত্ত করিয়া অসংখ্য ভগবদ্‌বিমুখী নাস্তিক, মদ্যপায়ী, অসচ্চরিত্র, মায়ামুগ্ধ জীবকে ধর্ম্ম-পথের পথিক করিয়াছিলেন। তাহা 'চরিত্র-সুধা' গ্রন্থে বিশেষভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঝাঁজপিটা মঠে অবস্থানকালে ললিতা দিদির বেশোচিত ভাবপুষ্টির জন্য বড় বাবাজী মহাশয় যাঁহাদিগকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কুসম দিদি, কিশোরী দিদি, বিনোদিনী দিদি, দয়াল দাদা, অদ্বৈত দাদা প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, নবদ্বীপ দাদা ও গোবিন্দ দাদা প্রভৃতি যদিও সেই সময় মঠেই থাকিতেন, কিন্তু তাঁহারা সকল সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদিগকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত। কুসুম দিদিও কিশোরী দিদি ললিতা দিদিরমতই সখীবেশ ধারণ করিয়া সেবার কার্যে সহায়তা করিতেন। কিশোরী দিদি শ্রীশ্রীরাধাকান্তের নিয়মিত সেবা করিতেন আর কুসুম দিদি ললিতা দিদির সহিত ভোগাদি প্রস্তুত ও অন্যান্য সেবাকার্যে সময়োচিত সহযোগিতা করিতেন। কিছুদিন পরে হরিদাস বাবাজী মহাশয় সখীবেশ ধারণ করিয়া বৃন্দাসখী নাম গ্রহণ করিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হন। কিন্তু খুব বেশীদিন তিনি এই বেশে থাকিতে পারেন নাই। কোনও বিশেষ কারণে তাঁহাকে পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

উৎসব পর্ব্বাদির সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের অপূর্ব্ব বেশাদি দর্শনে-ভাবাবেশে দয়ালদাদা মাথায় কাপড় দিয়া এমন সুন্দরনৃত্য করিতেন যে, উৎসবপর্ব্ব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইত। দর্শকমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘন ঘন 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি করিতেন। ললিতা দিদিও ভাবাবেশে এক-একবার সময়োজিত পদকীর্ত্তনে সেই লীলারসকে আরও পুষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহাদের এই নৃত্যকীর্ত্তনকে দেখিল না দেখিল সেদিকে আদৌ কাহারও লক্ষ্য থাকিত না।

ইঁহারা ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াই নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। বড় বাবাজী মহাশয় কখন কখন আড়ালে থাকিয়া এই মধুরাদপি মধুর ভাব আস্বাদানে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। অবসর সময় দিদি বা নগেন দাদা দয়ালদাদাকে ডাকিয়া "তোমার খুব কষ্ট হইয়াছে।" বলিলে দয়ালদাদা বলিতেন, "ইঁহার (বড় বাবাজী মহাশয়ের) সুখের জন্যই আমার সব। ইঁনি যদি কণামাত্রও সুখ অনুভব করেন, আমি তার জন্য আমার এ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি। সামান্য নৃত্যকীর্ত্তন করে কষ্ট হচ্ছে—একথা তোমরা কেন বল্‌ছ?"

কিশোরী দিদির শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা-পারিপাট্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং সময়োচিত বেশাদি রচনানৈপুণ্য দর্শনে ললিতা দিদি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সময় সময় দুইটি হাত ধরিয়া প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলিতেন, "দিদি! তুমি সত্য সত্যই ব্রজে ব্রজরাজ-নন্দনের কুঞ্জসেবিকা ছিলে।"

কৃপা-শাসন

ঝাঁজপিটা মঠের সেবা তখন ভিক্ষা দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। বড় বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশ ছিল—কোনরূপ মাসিক বন্ধানি (বৃত্তি) লওয়া হইবে না, ভিক্ষার যাহা কিছু মিলিবে তাহার দ্বারাই সেবা কার্য্য চলিবে। বেশী হইলেও কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা হইবে না। তখন মঠে একবেলা অন্নভোগ হইত এবং রাত্রে কয়েকখানি রুটি ভোগ লাগিত। এই ভোগের প্রসাদ দ্বারাই মঠবাসীগণকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইত। কেহ যে বাহিরে কোথাও গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিবেন বা কাহার নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাহিয়া লইবেন, তাহা পারিতেন না। এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা ও শাসন ছিল বলিয়াই মনে হয় তখনকার সেবক সেবিকারা এক একজন আদর্শবান হইয়াছিলেন। বহুদিন অদ্ভুত অদ্ভুত বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যথাস্থানে তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইবেন। এখানে একদিনের একটি ঘটনা বলি। পাঠকগণ, বড় বাবাজী মহাশয়ের শাসনের নমুনা দেখুন—

একদিন অপরাহ্নে বড় বাবাজী মহাশয় ভক্তগণকে লইয়া ঝাঁজপিটার এমন স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন যে, সেখান হইতে রসুই ঘর ও ভাণ্ডার ঘর দুইটিই বেশ দেখা যায়। কিছু সময় কথোপকথন করিতে করিতে বড় বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এবং ঘন ঘন ভাণ্ডার ঘরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিছু সময় পরে একজন সেবককে বলিলেন, "ললিতাকে ডাক্‌তো।" ভক্তটি

ললিতাদিদিকে ডাকিয়া আনিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ভাণ্ডার ঘরে ঐ কলসীটায় কি আছে ললিতা? একটা ছোট ইঁদুর একবার ওর ওপরে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে কেন?"

ললিতা—আজ্ঞে, ওটার মধ্যে কিছু ভিক্ষার চাল কালকের জন্য রাখা হয়েছে উপরের ঢাকা খোলা ছিল, ইঁদুর ভিতরে ঢুকে যায় ব'লে আমি একটা সরা ওর মুখে চাপা দিয়ে রেখেছি। তাই আর ভিতরে যেতে না পেরে নেমে যাচ্ছে।

"হুঁ, বুঝেছি" এই বলিতে বলিতেই বাবাজী মহাশয়ের নয়নযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিল। খুব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "এই যদি করবে তবে আর ঘরবাড়ী ছেড়ে এসে এভাবে লোক হাসানো কেন? ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও না?"

দয়াল দাদা—আজ ভিক্ষার কিছু চাল বেশী পেয়েছিলাম, তাই আজকের মত নিয়ে কালকের জন্য রেখে দিয়েছি। তাতে দিদির কোন দোষ নেই, আমিই রেখেছি।

বাবাজী—(ক্রোধভরে ধমক দিয়া) থাক্ তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না, যত সব গাঁট কাটার দল। আচ্ছা, যিনি আজ জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি যে কালও দিতে পারেন এ বিশ্বাসটুকুও নেই? এই জাতীয় বুদ্ধি বৃত্তি নিয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বৈরাগী হয়েছ?

সঙ্গে সঙ্গে নিজে উঠিয়া একটা চেলা কাঠ দিয়া কলসীটাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, "যেদিন যা ভিক্ষায় পাবে বা মঠে অযাচিতভাবে উপস্থিত হবে তার কিছু, কেউ জমা ক'রে রাখতে পারবে না। যে এর অন্যথা করবে তার এখানে স্থান নেই। সে যেখানে খুশী চলে যেতে পারে। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" ললিতাদিদির দিকে চাহিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা ললিতা! বল দেখি, ইঁদুরটা ঐভাবে বার বার হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ায় ওর মনে কি কষ্ট হয় নি। তোমরাই না বল—'কায়মনে প্রাণী মাত্র উদ্বেগ না দিবে।' তারপর ঐ চালগুলি কি তোমার জমিদারীর? ও তো ভিক্ষার চাল, এতে তোমারও যেমন অধিকার ওরও ঠিক তেমনি অধিকার আছে। ওকে তুমি ওর অধিকার থেকে বঞ্চিত কর কোন্ সাহসে? বুঝেছি, মঠবাসী তোমাদের ভিতর কলি প্রবেশ করেছে। আজ সকলে উপবাসী থেকে সারা রাত নাম করবে। ভোরে নাম করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে স্নান ক'রে সিদ্ধ বকুল, গম্ভীরা ও জগন্নাথ দর্শন এবং দণ্ডবৎ করে শ্রীমন্দিরের বাহিরে তিনবার প্রদক্ষিণ ক'রে ও সাষ্টাঙ্গ দিয়ে এসে তবে প্রসাদ পাবে।"

উপস্থিত ভক্তগণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ কঠোর শাস্তির

কথা শুনিয়াও কেহ কোন মন্তব্য করিতে সাহস পাইল না। ললিতাদিদি ও দয়ালদাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বাবাজী মহাশয় অচল অটল। ‘‘যাও, আদেশ মত কাজ কর’’ বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তগণের সহিত কথা বলিতে চলিয়া গেলেন।

বাবাজী মহাশয়ের এইরূপে কঠোর আদেশের কথা শুনিয়া হয়ত আমরা তাঁহাকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর মনে করিব; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কৃপা-শাসনের কঠোরতার মধ্যেও বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ের মাধুর্য্য ও স্নেহ বিগলিত কণ্ঠস্বরের কোমল প্রতিধ্বনি অহরহই ধ্বনিত হইতেছে।

অদ্বৈত দাদার প্রতি

পুরীধামে আউলিয়া মঠে রঘুনাথ দাদা ও অদ্বৈত দাদা এক সঙ্গে থাকেন এবং সেবার কার্য্যদি করেন। একদিন সকালে অদ্বৈত দাদা ঝাঁজপিটায় আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন যে, রঘুনাথ দাদা প্রস্রাব করিয়া কুল্লা না করিয়াই ভোগের ঘরে গিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় শুনিলেন কিন্তু রঘুনাথ দাদার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া অদ্বৈত দাদার দিকে চাহিয়া একটু রূঢ় স্বরেই বলিলেন, ‘‘এখনই মঠ থেকে বের হও, চার ধাম ক’রে তবে আমার কাছে আস্‌বে।’’

কয়েক বৎসর পরে নবদ্বীপে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে অদ্বৈত দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘‘ভাই দীনেশ! চার ধাম করা কাকে বলে আমি তখন তাও জানতাম না। ঘর ছেড়ে এসে যাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছি, সেই অধমতারণ পতিতপাবন বাবাজী মহাশয় ছাড়া আর যে জগতে কোথাও কিছু আছে বা থাকতে পারে, সে জ্ঞানও আমার তখন ছিল না। দিদি একটু দুরে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সজলনয়নে তাঁর দিকে চাইলাম যদি তিনি কোন প্রতিকার করেন এই আশায়। কিন্তু তিনিও মুখ নীচু করে চলে গেলেন। তখন আমি কি করব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না— ইতস্ততঃ করছি দেখে বাবাজী মহাশয় খুব দৃঢ়স্বরে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দরজা দেখিয়ে বললেন—‘‘যাও’’। কি আর করব, আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডবৎ ক’রে মঠ থেকে বাহিরে বের হয়ে গেলাম। বের তো হলাম, এখন যাই কোথায় ? ভাবতে ভাবতে ‘নারায়ণ ছাতায়’ গিয়ে সেখানকার মহান্ত মহারাজকে সমস্ত বললাম। তিনি সব শুনে বললেন, ‘ওপরের ঘরে গিয়ে বসে বসে নাম কর, পরে যা হবার হবে।’ আমি তাঁর আদেশ মত মালা ঝোলা হাতে ক’রে ওপরে উঠে রাস্তার দিকে জানলার কাছে বসে নাম করতে লাগলাম। কিছু সময় পরে দেখি, বাবাজী মহাশয় দ্রুত পদে ‘নারাণ ছাতার’ দিকেই

আসছেন। আমি তো ভয়ে জড়সড়। তিনি সেখানে এসে বাইরে থেকেই মহান্ত মহারাজকে ডেকে বললেন—'আমার সম্পর্কিত কেউ এখানে এলে যেন ঠাঁই না পায়।' শুধু এই কথা ক'টি বলেই তিনি চলে গেলেন।

হরিবোল হরি। আমি ওপরে বসে আদেশ শুনেছি, কিন্তু মহান্ত মহারাজ কি করবেন তখনও বুঝতে পারিনি। তবে বুঝতে বেশী বিলম্ব হল না। সঙ্গে সঙ্গেই মহান্ত মহারাজ আমাকে ডেকে সেখান থেকে চ'লে যেতে আদেশ করলেন। আমিও ধীরে ধীরে দণ্ডবৎ ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দুঃখ যে কি তা বলতে পারি না, কেবল দুটো চোখ দিয়ে অবিরত জল গড়াতে লাগল, জগৎটা যেন আমার কাছে কেমন শূন্যবোধ হ'তে লাগল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন কোথায় যাই।

কতক্ষণ এভাবে গিয়েছে জানি না, একটু জ্ঞান হতেই দেখি, আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে চলেছি। ক্রমে সিংহ দরজায় উপস্থিত হয়ে বাহির থেকেই পতিতপাবন দর্শন করে দরজায় দক্ষিণ দিকে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিলেন, তাঁর নিকট বসে একে একে আমার সমস্ত কথা তাঁকে বললাম। তিনি অভয় দিয়ে বললেন—'তুম, হিঁয়াপর রহো, রামজী সব ঠিক কর্‌দেগা।' আমি সাধুর অভয় বাণী শুনে নিরাশ প্রাণে যেন একটু ভরসা পেলাম। আদেশ মত ধ্বনির কাছেই বসে পড়লাম। তখন শীতকাল, আমার সম্বলের ভিতর কৌপিন বহির্ব্বাস, এ ছাড়া আর কিছু নেই। শীতে কষ্ট হচ্ছে দেখে সাধু তাঁর কম্বলখানি আমার গায়ে চাপা দিয়ে দিলেন। একে ধ্বনির গরম, তাতে কম্বল গায়, কাজেই বেশ একটু আরাম এল, না জানি কখন আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

এদিকে অদ্বৈত দাদাকে বিদায় দিয়া বড় বাবাজী মহাশয় কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথাও বলিতেছেন না। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের দ্বিপ্রহরের ভোগারতির পর ললিতা দিদি, গোবিন্দ দাদা, দয়াল দাদা প্রভৃতি সকলেই প্রসাদ পাইবার জন্য বহু কাকুতিমিনতি করিলেন; কিন্তু তিনি প্রসাদ পাইলেন না। প্রসাদের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া এক কণিকা মুখে দিয়া চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সন্ধ্যারতি শেষ হইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর আরতিকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বড় বাবাজী মহাশয় গোবিন্দ দাদাকে কাছে ডাকিয়া অদ্বৈত দাদার সন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। আদেশ মত গোবিন্দ দাদা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও দেখা না পাইয়া

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির দেখিয়া মঠে ফিরিবেন মনে করিয়া সিংহ দরজার পাশে যাইতেই সাধুর নিকট অদ্বৈত দাদাকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। গোবিন্দ দাদা সেখানে দাঁড়াতেই সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ক্যা তলপ্ হুয়া?" গোবিন্দ দাদা বলিলেন, 'জী, শ্রীগুরুমহারাজ বহুৎ উদ্‌বিঘ্ন হুয়া, অনুমতি দিজিয়ে।'

সাধু তখন অদ্বৈত দাদাকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ দাদার সহিত যাইবার আদেশ করিলেন। সাধুর আদেশ শুনিয়া অদ্বৈত দাদা উঠিয়া বসিলে গোবিন্দ দাদা আবেগ ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ভাই অদ্বৈত মঠে চল্, বাবাজী মহাশয় যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। তুই চলে আসবার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত একবিন্দু জলও মুখে দেননি। চল্ ভাই চল।" অদ্বৈত দাদা সাধুকে প্রণাম করিয়া গোবিন্দ দাদার সঙ্গে ঝঁজপিটা মঠের দিকে রওনা দিলেন।

মঠে বড় বাবাজী মহাশয় আরতি কীর্ত্তন শেষ করিয়া দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আউলিয়া মঠ হইতে রঘুনাথ দাদাকেও ডাকা হইয়াছিল, তিনি দরজার ভিতরে ছিলেন। যথাসময়ে অদ্বৈত দাদা উপস্থিত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে এবং দুইটি চোখে অবিরল ধারায় জল পড়িতেছে।

বড় বাবাজী মহাশয় "জয় নিতাই" ধ্বনি করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অদ্বৈত দাদার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অদ্বৈত! রঘুনাথের কাছে তোমার অপরাধ হয়েছে। ও তোমার বড় গুরুভাই। ওর আচরণে কোনরূপে কটাক্ষ করা তোমার উচিত হয় নি। যাও, ওর চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাও।'

অদ্বৈত দাদা রঘুনাথ দাদাকে প্রণাম করিতে গেলে রঘুনাথ দাদা দুইটি হাত ধরিয়া কোলে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না ভাই! আমার কাছে তোমার কোন অপরাধ নেই, বরং আমিই সদাচার লঙ্ঘন ক'রে অপরাধী হয়েছি, আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।"

এইভাবে উভয়ের দৈন্যোক্তিতে ও ক্রন্দনাবেশে বেশ একটু সময় অতিবাহিত হইল। বাবাজী মহাশয় সকলই দেখিতে ও শুনিতেছিলেন। এইবার "খুব হয়েছে, মর্য্যাদা রক্ষায় যেন হুশ থাকে" এই কথা বলিয়া উভয়কে প্রসাদ পাইবার আদেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখন ললিতা দিদি ছুটিয়া আসিয়া "এস ভাই" বলিয়া দুইজনকেই ভিতরে লইয়া গিয়া নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রসাদ পাওয়াইলেন। বলা বাহুল্য, দুইজনের জন্যই সকালের ভোগের পারস ধরা ছিল।

বলিতে সঙ্কোচ আসে। আজ আমরা মর্যাদাবোধ যেন একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। গুরুভাই তো পরের কথা, সময় সময় সাক্ষাৎ শ্রীগুরুদেবের ক্রিয়ামুদ্রারও সমালোচনা করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করি না। শাসন মানা দূরে থাকুক, গুরুজনদিগকে ছলে বলে কৌশলে জব্দ করিয়া খুবই একটা বাহাদুরি দেখাই। অনেক সময় শ্রীগুরুদেবকে "আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না," "আপনার ভুল হচ্ছে" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতেও মনে দ্বিধা আসে না। "মর্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন" এ শাসন বাক্য মুখে বলি, কিন্তু কাজে করি না। পাঠকগণ ভাবিরা দেখুন, আমরা কি করিতেছি আর ইহারা কিভাবে অবনতমস্তকে গুরুবর্গের কঠোর শাসন অপার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, অপরকেও মহান্ আদর্শের সুযোগ দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

দিদির সেবাসুখ লালসা

পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে পাঠকগণ দেখিয়াছেন, দেবসেবা ও জীবসেবা দুইটিই ছিল গোপালকৃষ্ণের প্রাণকোটী প্রিয়। আজ সখীবেশ ধারণ করিয়া সেই সেবাপ্রবৃত্তি যেন সহস্রমুখী হইয়া নব নব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিদির মধ্যে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। কিভাবে কাহার সেবা করিতে হয়, কোন ধারা ধরিয়া সেবা করিলে সেব্যের সুখ হইবে, অতি সহজেই অল্প সময় মধ্যে দিদি তাহা বুঝিতে পারিতেন। নিজের সকল প্রকার অসুবিধা বা পরিশ্রম ভুলিয়া সেবা করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। পুরীধামে আমরা এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাই—"ললিতা মা ছিলেন মূর্ত্তীমতী সেবা বিগ্রহ।"

বড় বাবাজী মহাশয়ের পদাশ্রিত আমাদের শ্রদ্ধেয় নগেন দাদা একদিন ঝাঁজপিটায় বসিয়া কথা প্রসঙ্গে স্নানবেদী দেখাইয়া আমাদের বলেন, "এই স্নানবেদীর ধারে বসেই দিদি একদিন বলেছিলেন—দাদা সাধু, গুরু ও শাস্ত্র মুখে শুন্‌তে পাই—সেবার তাৎপর্য সর্ব্বতোভাবে সেব্যের প্রীতি বিধান করা। তোমরা আমাকে এই কৃপা কর, আমি যেন আত্মসুখী না হ'য়ে অকপটে সকলের সেবা করতে পারি। অন্যকোন ভজন সাধন আমার মত দুর্ব্বলচিত্তের জন্য নয়। আমি জানি—সেবাই আমার ধর্ম্ম, সেবাই আমার কর্ম্ম"। চিরদিন সেবিকা হয়ে থাকব—এইটিই আমার মনের বাসনা। সেবা-সুখে বঞ্চিতা হ'য়ে এক মুহূর্ত্ত'ও আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন দাদা এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া বলিলেন, "ভাই রে, এমন কথা কেউ কখনও বল্‌তে পেরেছে কি? আমরা

এখন শ্রীগুরুদেবের করুণায় সামান্য কিছু, সেবার অধিকার লাভ করতে পারলেও কতক্ষণে তা থেকে অবসর পাব অথবা কি উপারে তার মধ্যেও সময় ক'রে নিয়ে নিজের সুখসুবিধা ভোগ করব, তারই চেষ্টায় কত না ফিকির ফন্দি খুঁজে বেড়াই। হায়রে দুর্দ্দৈব!"

নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে ললিতা দিদি ঠাকুরের অষ্টকালীন সেবার ব্যবস্থা করিয়া যে সকল সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেবা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে একদিন বলিয়াছিলেন—"বহু, ভাগ্যেও যে সেবা পাওয়া যায় না, শ্রীগুরুদেবের অযাচিত করুণার তোমাদের তা সহজলভ্য হয়েছে, হেলায় হারাইও না। আমি স্বেচ্ছায় কোনরূপে চেষ্টা ক'রে এসব সেবা প্রতিষ্ঠা করিনি, এরা নিজ গুণে দয়া ক'রে এখানে এসে প্রকাশিত হয়েছেন, তোমাদের হাতে একটু সেবা গ্রহণ ক'রে তোমাদের ধন্য করছেন। মনে রেখ, আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় এই সেবা তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি, কোনরূপে কপটতা বা অবহেলা করলে সত্য সত্যই আমার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগবে আর তোমরাও এঁদের অযাচিত করুণা লাভে বঞ্চিত হবে।"

তারপর ধীরে ধীরে একটির পর একটি শ্রীবিগ্রহ কি ভাবে কখন সমাজবাড়ীতে আসিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে সেবকগণকে বলিতে লাগিলেন। একদিনের জন্যও নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া দিদির সেবা পারিপাট্য দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন সেবা কাহাকে বলে। আমরা সর্ব্বদাই আত্মসুখাভিলাষী, ইন্দ্রিয়সেবা তৎপর, আমরা এ জাতীয় সেবাসুখের সন্ধান কিভাবে কোথা হইতে পাইব?

অন্যান্য দাদা ও দিদিদের লইয়া ললিতা দিদি বড় বাবাজী মহাশয়ের সেবা কিভাবে করিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণী সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে দিদি নিজে একদিনের অষ্টকালীয় সেবার যে বিবরণ শ্রীশ্রীলবঙ্গ-মঞ্জরীগুটিকা' গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ললিতা দিদি যাহাকে যে ভাবে সেবা করিতে হয়, তাহা অতি সন্তর্পণেই করিতেন। মঠে নবাগত ছেলেরা বাল্যস্বভাববশে কোন প্রকার বিরুদ্ধে আচরণ করিয়া ফেলিলে দিদি মুখে কঠোর ভাব দেখাইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্নেহপূর্ণ" ব্যবহার সহ তাহাদিগের আচরণের ত্রুটি দেখাইয়া যাহাতে উহা সংশোধিত হয় সর্বদাই সে বিষয়ে যত্ন লইতেন। দিদির এই প্রকার ব্যবহারের সুযোগ লইয়া কেহ পুনরায় কোনরূপে

উচ্ছল ভাবপ্রকাশ করিলে মঠের অন্যান্য গুরু-ভগ্নীরা দিদির উপরেই দোষ চাপাইয়া বলিতেন, "দিদি! তোমার আস্কারা পেয়েই তো ওরা এতদূর বেড়ে উঠেছে, তুমি ওদের দূর ক'রে দাও না কেন ?" উত্তরে দিদি তাঁহার স্বভাব মধুর হাসি হাসিয়া বলিতেন, "যিনি আকর্ষণ ক'রে ওদের এখানে এনেছেন, কৃপা-পরশ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তিনিই সব দুর্দ্দৈব ঘুচিয়ে খাঁটি ক'রে নিবেন। আমি ওদের কি করব? কর্ত্তা বলেছেন—'আমার ছেলেগুলোকে একটু দেখো।' তাই আমি ওদের নিয়ে আছি। ওগো, আমি যে তাঁর দাসী, তাই তাঁর আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছি মাত্র।' বিশেষভাবে উহাদের সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে বলিতেন, 'ভয় নেই ভাই ভয় নেই, যখন একবার পরশমণির পরশ ওরা পেয়েছে, তখন ওরা সোনা হয়ে গেছে, উপরের ময়লা মাটি দূরে হতে একটু দেরী।"

হিসাব দিবে কাকে ?

প্রথম দর্শন হইতেই নবদ্বীপ দাদাকে ললিতাদিদি কিভাবে দেখিতেন, তাহার কিছু কিছু বর্ণনা পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে দিয়াছি। দিদির কথায়, দিদির লেখায়, দিদির ব্যবহারে নবদ্বীপ দাদাই যে তাঁহার সব কিছু। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিন নবদ্বীপ দাদা বড় বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে দিদির হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিয়া গেলেন "আবশ্যকমত খরচ করবে।" দুই তিন দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, দিদি একখানা কাগজে কি যেন লিখিতেছেন। নবদ্বীপ দাদাকে দেখিয়া যেমন কাগজখানি লুকাইতে যাইবেন, অমনি তিনি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "কি লিখছ?" দিদি বলিলেন, "আপনি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তাই লিখে রাখছি।'

নবদ্বীপ—কে দেখবে? কাকে হিসাব দেখাবে?

দিদি নির্ব্বাক। নবদ্বীপ দাদার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার ইচ্ছা করিয়াও প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। নবদ্বীপ দাদা দিদির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটা হাসিয়া বলিলেন, "এটা রাধাকান্তের সংসার, ভয় নেই, তিনি তোমার হিসাব দেখতে চাইবেন না। সঞ্চয় প্রবৃত্তি মনে না রেখে যেমন আসবে তেমন খরচ করতে কোন চিন্তা নেই, তিনি আবশ্যকমত যোগান দিবেনই। মনে রেখ, এ তোমার আমার মত সীমাবদ্ধ তহবিল নয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি শোন —

আমাদের এই মঠে যে কুয়াটি আছে দড়ি ফেলে মেপে দেখলে তিন হাত কি চার হাত জল আছে দেখতে পাবে। আর কুয়াতে খুব বেশী হলে ষাট কি

সত্তর ঘড়া জল হবে। কিন্তু সমস্ত দিনে পাঁচ-ছশো ঘড়া জল কুয়া থেকে উঠছে, তবু সেই তিন-চার হাত জল আছে। ইচ্ছামত খরচ হচ্ছে, কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না, অথচ কুয়াটি পূর্ণ আছে। এর কারণ কি জান ? একজন খরচের সঙ্গে সঙ্গে জল যোগান দিচ্ছেন, তাই অভাব হচ্ছে না। এও ঐ মতই জানবে। তাঁর সংসার, আমরা তাঁর সেবক সেবিকা, যখন যা দরকার তিনি বুঝবেন—যে রকমেই হোক ঠিক ঠিক জুটিয়ে দিবেনই। দৈবাৎ যদি কোন কিছু তুমি আমি আবশ্যক মনে করেও না পাই, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, তোমার আমার দৃষ্টিতে সেটি প্রয়োজন বোধ হলেও সত্য সত্য সেটির কোন প্রয়োজন নেই। তোমার আমার দৃষ্টি থেকে যে তাঁর দৃষ্টি প্রখর, তিনি যে তোমার আমার চেয়েও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন —কোন সময়েই একথা ভুলে যেও না। তাতে সুখ পাবে, আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাবে। দাদার কথায় বিশ্বাস কর।'

দিদি নবদ্বীপ দাদার কথা শুনিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাদা কবে আমার এইরূপে নির্ভরতা আসবে ?" নবদ্বীপ দাদা বলিলেন, "হবে গো হবে। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যাঁর চরণে মাথা বিকিয়েছ, যিনি কৃপা ক'রে অঙ্গীকার করছেন, তিনি কি অমনি অমনি ফেলে রাখবেন? তুমি অকপটে, কায়মনোবাক্যে তাঁর হয়ে থাক, যখন যা করবার তিনি ঠিকঠিক মতই করবেন।'

ললিতা দিদির উপর নবদ্বীপ দাদার কৃপার কথা বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ হইয়া যায়। কি ভাবে সেবা করিতে হয়, কিসে তিনি (বড় বাবাজী মহাশয়) সুখী হন, হাতে ধরিয়া তাহা নবদ্বীপ দাদা ললিতা দিদিকে শিখাইয়াছিলেন। বড় বাবাজী মহাশয়কে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ জ্ঞানে নবদ্বীপ দাদা সেবা করিতেন। কেহ কিছু প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বড় বাবাজী মহাশয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অন্যের পক্ষে অসম্ভ কার্য্যও দাদা অনায়াসে অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন করিতেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের অলৌকিক লীলাবলীর সহায়, সাক্ষী ও মর্ম্মজ্ঞ এই নবদ্বীপ দাদা একদিন দিদিকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "রত্ন ফেলে যেন শুধু, আঁচলে গাঁট দিও না, যাঁকে হাতের কাছে পেয়েছ, এ কিন্তু নিজেকে সহজে ধরা ছোঁয়া দেবে না এবং নানা ভাবে আবরণ দিয়ে রাখতেই চেষ্টা করবে।"

দিদির প্রতি মাধবদাসের স্নেহ প্রীতি

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীপাদ গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজের নিকট বড় বাবাজী মহাশয় ভেকাশ্রয় গ্রহণ করেন। ভেকের সময় নাম হয় ‘‘যাদব দাস’’। এই মহান্ত মহারাজের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে আর একজন ভেক লইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ‘‘মাধবদাস’’। বড় বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বে ইনি ভেক লইয়াছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাকে বড় গুরুভাই জ্ঞানে ‘দাদা’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই ভ্রাতৃযুগলের প্রীতিপূর্ণভাব, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা ও গুরুভক্তি সত্য সত্যই আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

দিদির প্রতি মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ের এমন স্নেহ-প্রীতি ছিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে ‘‘ললিতা কেমন আছে’’ জিজ্ঞাসা করিতেন। দিদির কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আপনজন কাহাকেও পাইলে বলিতেন, ‘‘তোমাদের বড় বাবাজী জীবের মঙ্গলের জন্য দুটি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছে। একটি ঘরের মধ্যে বসিয়া মাথায় কাপড় দিয়া সমীবেশে সেবার আদর্শ শিক্ষা দিতেছে, আর একটি খোল করতাল লইয়া কলিহত কৃষ্ণভোলা জীবের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তৃণাদপি শ্লোকের যাজন করিয়া এক মহান আদর্শ স্থাপন করিতেছে। এ দুটির তুলনা নাই।’’

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বিরক্ত বৈষ্ণব। অধিকাংশ সময়ই শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া স্মরণে মননে আবিষ্ট থাকিতেন। কখন কোনও সুযোগে ললিতা দিদির সহিত মিলিত হইলে কি জাতীয় সেবা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হইত, একদিনের একটি ঘটনা হইতে পাঠকগণ তাহা আস্বাদন করুন—

একবার গ্রীষ্মকালে মাধবদাস বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপধামে আসিয়াছিলেন। সমাজবাড়ীতেই থাকেন। দিদির সহিত ভজন প্রসঙ্গ ও লীলাতত্ত্বাদি আলোচনায় পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। একদিন বেলা নয়টা সাড়ে নয়টার সময় মালা হাতে দিদির ঘরের বারান্দায় বসিয়া স্মরণ করিতেছেন। দিদি উঁহার নিকটেই রন্ধনশালায় রন্ধন করিতেছিলেন। গ্রীষ্মকাল, তাহাতে রন্ধনশালার উত্তাপে দিদির খুব ঘাম বাহির হইয়াছে, তাই একবার বাহিরে আসিয়াছেন। মাধবদাস বাবাজী মহাশয় দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘‘ললিতা! গরমে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, অপর কাউকে কাজের ভার দিয়ে তুমি একটু বিশ্রাম ক’রে নাও না।’’ দিদি একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, ‘‘আপনি ওখানে ব’সে কি করছেন?’’

মাধবদাস—আমি আর কি করব, ব'সে ব'সে স্মরণে প্রাণেশ্বরীর রন্ধন কার্য্যে একটু সহায়তা করছি।

দিদি—তা ওতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন ত?

মাধবদাস—শ্রীগুরুদেবের করুণায় একটু একটু আনন্দ পাচ্ছি বই কি।

দিদি—আপনি স্মরণে রন্ধনকার্য্যে সহায়তা ক'রে আনন্দ অনুভব করছেন, আর আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রিয়াজীর সহিত রন্ধনে সহায়তা ক'রে আনন্দ পাচ্ছি। আমি এ আনন্দ ত্যাগ করব কেন?

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় দিদির মুখে এই কথা শুনিয়া হুঙ্কার করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ললিতা! তুই ধন্য, আর ধন্য তোর অনুভব। তোর এই ভাবের, তোর এই অনুভবের ছিটে ফোঁটা আমাকে দে, আমি তোর মত প্রত্যেক কাজের মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে নিয়ে লীলা ভোগ ক'রে ধন্য হই।

এই মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ই একবার ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা একখানি উৎকৃষ্ট বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী কিনিয়া দিদিকে পাঠাইয়াছিলেন। দোকানদার বাবাজী মহাশয় কেন শাড়ী কিনিতেছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে আবেগভরে বাহ্যিক সম্বন্ধ ভুলিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এক ছোট ভগ্নী নবদ্বীপে থেকে ভজন করে, এ শাড়ী আমি তাকে পাঠিয়ে দিব।" দোকানদার কেমন যেন একটু বিস্মিতভাবে তাঁর ভগ্নীর পরিচয় জানিতে চাহিলে তিনি আনন্দে গদগদ স্বরে ললিতা দিদির নাম করিলেন। শুনিয়া দোকানদার তাহার দোকানে যতগুলি শাড়ী ছিল তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বোকৃষ্ট একখানি শাড়ী বাবাজী মহাশয়কে দিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে সেই শাড়ীর সহিত কিছু শ্রীকুণ্ডের রজ ও প্রিয়াজীর প্রসাদী নির্ম্মাল্য দিয়া দিদিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

যাদবদাস নাম পরিবর্ত্তন

ললিতা দিদির সহিত যখন নবদ্বীপ দাদার প্রথম মিলন হয়, তখন গোবিন্দ দাদা চৈতন্য দাদা প্রভৃতি কথায় কথায় নিজ নিজ পূর্ব্ব পরিচয় কখনও কখনও ব্যক্ত করিতেন। একদিন দিদি সকলের সম্মুখেই নবদ্বীপ দাদাকে বলিলেন, "দাদা! আপনার কথায়, আপনার ব্যবহারে সব সময়ই কেমন যেন একটা তেজস্বীভাব কেন বলুন তো?" নবদ্বীপ দাদা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওরে ও যে নৃসিংদেবের ঘরের লোক, ও তেজস্বী হবে না?'

দিদি — নৃসিংদেবের ঘরের লোক আমাদের এখানে কি ক'রে এলেন?

গোবিন্দ দাদা—আরে নবদ্বীপে তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে যখন প্রথম মিলন হয় তখন তো উনি ফুলবাবু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। ছুটি নিয়ে পরিজনবর্গ" সঙ্গে নবদ্বীপে এসেছিলেন বেড়াতে। সেই সময় তোমাদের কর্ত্তাও নবদ্বীপে রাজেনবাবু, ব'লে জনসমাজে পরিচিত। ইতিপূর্ব্বেই নবদ্বীপে নৃসিংহদেবের আখড়ায় উনি দীক্ষিত হন। কিন্তু প্রথম দর্শন হ'তেই দুজনে এমন অবিচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে বাঁধা পড়েন যে, একমুহূর্ত্তও একে অন্যের অদর্শন সহ্য করতে পারতেন না। যদিও অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে চাকুরীর দোহাই দিয়ে সে যাত্রা দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এসে কর্ত্তার সঙ্গে আবার মিলিত হলেন এবং স্পষ্টই বললেন—আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আর যাব না।

আর একটা তেজের কথা শুনে রাখ। বড় বাবাজী মহাশয় যখন ভেকাশয় করেন তখন তাঁহার নাম হয় যাদবদাস। নবদ্বীপ দাদা মিলিয়া মিশিয়া নাচিয়া গাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান, কিন্তু যাদবদাস নামটি তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। আড়ালে আড়ালে নানা ভাবের ইঙ্গিতে অন্যান্য সঙ্গীগণকে এ কথা বলেনও, কিন্তু গুরুদত্ত নাম কে পাল্টাবে? একদিন নবদ্বীপ দাদা বললেন—আপনাদের যার যা খুশী বলুন, আমি আজ থেকে ওঁর শ্রীরাধারমণচরণ দাস নামেই পরিচয় দিব। কেউ আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে বলব---আমরা শ্রীরাধারমণচরণদাসদেবের গণ। সেদিন হ'তে কি জানি প্রভূর কি ইচ্ছা এই শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী নামই জন সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করল। যাদবদাস নামটি সীমাবদ্ধ কয়েকজনের মধ্যেই রইল।

ললিতা দিদি হাতযোড় করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন, 'ধন্যি বাবা তেজ, তাই তো ভাবি এমন মিলন হ'ল কি ক'রে? বিধাতা যোগ্যজনের সঙ্গেই যোগ্যজনের মিলন ঘটিয়েছেন।"

নবদ্বীপ দাদার সেবা-শিক্ষা দান

ললিতা দিদি একদিন বৈকালে ঝাঁজপিটায় বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের রাত্রের ভোগের জন্য তরকারী আমানি (কুটন) করিতেছেন। অদূরে নবদ্বীপ দাদা বসিয়া বসিয়া দিদির কার্য্য দেখিতেছিলেন। একটু সময় লক্ষ্য করিয়াই উঠিয়া আসিয়া দিদির নিকট হইতে বঁটিখানি লইয়া কিভাবে কত টুকু টুকু করিয়া তরকারী আমানি করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন। দিদিও তাঁহার নির্দ্দেশমত তরকারী প্রস্তুত করিয়া রান্না করিয়া যথাসময়ে ভোগ দিলেন এবং কি জানি কেন একটা পাত্রে

কিছু তরকারী প্রসাদ পৃথক ভাবে তুলিয়া রাখিলেন। সেদিন বড় বাবাজী মহাশয় মঠে উপস্থিত ছিলেন না, আসিবারও কোন স্থিরতা ছিল না। এদিকে নবদ্বীপ দাদাও সন্ধ্যারতির পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার নিজ ব্যবহারের জিনিষপত্র লইয়া কোথায় যেন চলিয়া গেলেন।

ললিতা দিদি অন্য দিনের মত সেবার কার্য্যাদি সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দির সম্মুখে বসিয়া অনুচ্চস্বরে নাম করিতেছেন। রাত প্রায় বারটা। হঠাৎ "গৌরহরিবোল" বলিয়া বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি তাড়াতাড়ি বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রান্তি আপনোদন করিবার জন্য একখানি পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গের কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন। বড় বাবাজী মহাশয় এক একটি করিয়া দিদির প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ললিতা! আজ হঠাৎ তরকারী প্রসাদ পাবার ইচ্ছা হচ্ছে কেন বল দেখি?"

দিদি—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কি উদ্দেশ্য আমি কি ক'রে বলব? তবে আদেশ করেন তো প্রসাদ এনে দিই।

বাবাজী—তরকারী প্রসাদ প্রস্তুত আছে নাকি?

দিদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বলিয়াই হাসিতে হাসিতে যেখানে সেই বাটি সমেত প্রসাদ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখান হইতে আনিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে ধরিলেন।

বাবাজী মহাশয় "জয়নিতাই জয়নিতাই" বলিয়া প্রসাদে দণ্ডবৎ করিয়া প্রীতিভরে গ্রহণ করিলেন। দুই একবার মুখে দিয়াই বলিলেন, "এ যে দেখছি নবদ্বীপের হাতে তৈরী করা ডাঁটা!"

দিদি—আজ্ঞে হ্যা, দাদাই বৈকালে ব'সে ব'সে এইভাবে আমাকে ডাঁটা তৈরী করা শিখিয়েছেন।

বাবাজী—নবদ্বীপ কোথায়?

দিদি—তিনি সন্ধ্যারতির পর প্রসাদ না পেয়েই কোথায় যেন চলে গিয়েছেন।

বাবাজী— দেখ, ঐ একটি সেবার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। সেবা ওর প্রাণ। কোন রকমে সেবার ত্রুটি দেখলে ও রেগে নানা প্রকার তিরস্কার তো করেই, সময় সময় মারেও। যদি তোমাদেরও কিছু বলে বা শাসন করে, তোমরা তাতে রাগ ক'র না। মনে মনে জানবে তোমাদের উপর নিতাইচাঁদের কৃপা হয়েছে।

দিদি—আমি তো সেবার কিছুই জানি না। কিভাবে কখন কি রকম সেবা করতে হয়, সেবকের সেবায় সেব্যের সুখ হ'ল কি না, কিভাবে তা অনুভব

করতে হয়, এসব কিছুই তো আমার জানা নেই।

বাবাজী—সব জানতে পারবে, ঐ নবদ্বীপই তেমাদের সব বুঝিয়ে দিবে। ওকে বাইরের বেশভূষা দেখে চিনতে পারা যায় না। ওর ভিতরে যে নিতাইচাঁদ কি অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন, তা তাঁর কৃপা না হ'লে কেউ বুঝতে পারবে না, জানতে পারবে না।

এদিনকার প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইয়া উঠিয়া গেলেন। সকলে অধরামৃত বন্টন করিয়া লইলে বাটিতে যাহা একটু রহিল, তাহাই দিদি পরমানন্দে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

এই ঘটনার ছয় সাত দিন পরে নবদ্বীপ দাদা মঠে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর এমনই লীলা যে, আজও বড় বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটায় উপস্থিত নাই। নবদ্বীপ দাদা নিজ নিত্য কৃত্যাদি সারিয়া প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিছু সময় পরে ললিতা দিদি কুসুম দিদিকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দাদা! সেবা সম্বন্ধে আমাকে কিছু উপদেশ দিন। আমি তো সেবার কিছুই জানি না।"

নবদ্বীপ—সেবা নানা জনে নানা রকম বলেন। সাধারণতঃ দুই রকম সেবাই দেখতে পাওয়া যায়। স্বকাম সেবা ও নিষ্কাম সেবা। যে সেবায় সেবকের কিছু পাবার আশা থাকে তাকে স্বকাম সেবা বলে। আর যে সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানে কেবলমাত্র সেব্যকে সুখী করার জন্য হয়, নিজের তাতে যা হয় হোক এই ভাব, তাকেই নিষ্কাম সেবা বলে। এই নিষ্কাম সেবা যিনি করেন তিনি তো কিছু চানই না, যাঁকে করেন তিনিও মনে মনে অনুভব করেন যে, এ সেবা বা এ শ্রদ্ধা আমাতে অর্পিত হয়নি, পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই প্রদত্ত হয়েছে কাজেই সেব্য ও সেবক উভয়েই আত্মোপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়। মহাপুরুষেরা এই জাতীয় সেবাকে উপাসনার সামিল বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের উপায় জানতে চেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট; তাতে তিনি স্নেহ সম্বোধনে বলেছিলেন, "ঈশ্বর লাভের আশায় ওপথ অবলম্বন ক'রে কি হবে? যে ঈশ্বর বহুরূপে তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রয়েছেন, তাঁদের সেবা ছেড়ে অজানা-অচেনা কার জন্য তুমি নির্ব্বিকল্প সমাধি চাও?" পরমহংসদেবের এই উপদেশ পেয়ে স্বামীজী সাধনা দ্বারা ঐশী শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।"

ফললাভের আকাঙ্ক্ষাহীন এই যে নিষ্কাম সেবা, এটি ভারতের নিজস্ব ভাব। এর সামান্য আদর্শ নিয়ে কত দেশ ধন্য হয়ে গেছে।

দিদি—দাদা! অতসব স্বকাম, নিষ্কাম, সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প বড় বড় কথা বুঝতে পারি না। দয়া ক'রে বুঝিয়ে দিন, সেবা ক'রে সেবক কিভাবে বুঝবে যে, সেব্য সুখী হ'য়েছেন?

নবদ্বীপ—(সহাস্যে) ঐ তো তোমাদের দোষ। কোন কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে গেলেই তোমরা একেবারে বোকা সেজে ব'স, তাহ'লে কি হয়?

দিদি—সত্যি বলতে কি দাদা, যাঁর কৃপা আকর্ষণে সংসারের কুটিল কুপথ ছেড়ে এই পথে এসে দাঁড়াতে পেরেছি, আমার তাঁকে ছেড়ে আর কোন কিছুই মন দিতে ইচ্ছে হয় না। আচ্ছা দাদা! তাঁর সেবা করলে কি আমার কিছু করা হবে না?

নবদ্বীপ—কে বলল হবে না। তাতেই তো হবে রে, তাতেই তো সব হবে, আর তাই করতেই তো আমি বলছি। সবসময় মনে রাখতে হবে, ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয়—মূল সম্পত্তি শ্রীগুরুচরণ। অকপটে গুরুসেবা দ্বারাই সমস্ত লাভ হয়। ভজন সাধন, জপতপ, নিয়মনিষ্ঠা, ধ্যান ধারণা যা কিছুই কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে চাই করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ। গুরুকৃপা না হ'লে কারুরই কৃপা পাওয়া যায় না। যদি সাধনপথে অগ্রসর হ'তে চাও, তবে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান কর। অমোঘ অক্ষয় গুরুকৃপা সঞ্চয় ক'রে গুরুদেবকে অগ্রগামী ক'রে তদানুগত্যে অগ্রসর হও, অতি দুরূহ কার্য্যও সহজ সাধ্য হবে—সুদুর্ল্লভ বস্তুও অনায়াস লভ্য হবে। এ সকল কথা কাঙ্গাল নবদ্বীপের নয়, সকল শাস্ত্রই একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছেন—"ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ"। শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"

আবার অন্যত্র উক্ত হয়েছে—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।"

স্থানান্তরে দেখতে পাওয়া যায়—"সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুং নত্বা প্রণমেদ্দেবতান্তরম্। সাক্ষাদ্বিষ্ণুসমং মত্বা পূজয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীগুরুর স্তব-বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যস্যপ্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"

এভাবের প্রমাণ তুমি শাস্ত্র খুললেই দেখতে পাবে, আমি আর কত বলব। মোট কথা গুরুদেবের কৃপা ছাড়া গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

তারপর তাঁর সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি সুখ ময়; তাঁর যাতে সুখ হয় আর তিনি যা ক'রে সুখ পান, নিজেকে তাতেই সুখী হ'তে হবে। সব সময় মনে রাখবে সেবকের দেহ, মন, প্রাণ সম্পূর্ণ সেব্যের। তিনি আদর করতে পারেন, পদদলিত করতে পারেন, বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ক'রে কঠোর শাস্তি দিয়ে সেবককে লাঞ্ছিত গঞ্জিত এমন কি বিতাড়িতও করতে পারেন, তাতে সেবকের মনে কোনরূপ বিচার আসবে না। সেবকের মনে দঢ় ধারণা থাকবে যে, আমার বন্ধু আমার আত্মীয়, আমার আশ্রয় দাতা বা আমার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী একমাত্র শ্রীগুরুদেব। কাজেই আমার আর ঐ চরণ ছেড়ে কোথাও যাবার স্থানে নেই। ভালবাসার কপট অভিনয় দেখিয়ে আপন জন সেজে যারা তোমার দুঃখে কাতরতা দেখায়, মনে রাখবে তারা তোমার মিত্র নয়—পরম শত্রু। পতিব্রতা স্ত্রী পতির শাসনে বা তাড়নে উৎপীড়িতা হ'য়ে যদি পতি ছাড়া অন্য কাকেও আশ্রয় করে বা করতে যায়, তাকে যেমন লোকে অসতীগণে গণ্য করে, শ্রীগুরুসেবকেরও ঠিক সেই অবস্থা।

আচ্ছা, একটা কথা ভাব দেখি; ছোট ছেলেকে কোন দোষের জন্য যদি মা তাড়ন, ভর্ৎসন বা প্রহার করেন, তা হ'লে সে কি করে?

দিদি—সে আর কি করবে, মা-মা ব'লে কাঁদতে থাকে।

নবদ্বীপ—শুধু কাঁদে না, মা রাগ করে যত তাকে দূরে ঠেলে দিতে চান, শিশু ততই মাকে জড়িয়ে ধ'রে মুখপানে চেয়ে মা-মা ব'লে কাঁদে। শেষে মা'ও আর তাকে ফেলতে না পেরে হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন। আমাদের আশ্রয়দাতা শ্রীগুরুদেব ছাড়া আর কে আছে? তাই বলি তাঁকে ধরে থাক, সব ঠিক হবে। এর মধ্যে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেবা করতে হ'লে সেবার চাতুর্য্য শিখতে হবে।

দিদি—সে কি রকম দাদা! একটু খুলে বলুন?

নবদ্বীপ—কি ক'রে সেব্যকে সুখী করা যায়, তিনি কি ভালবাসেন, কোন্ জিনিস আজ তিনি প্রীতি ক'রে গ্রহণ করেছেন, কাল আবার সেই বস্তুটি কিভাবে সংগ্রহ ক'রে তাঁর সেবা করা যাবে, এইসব চিন্তা ও চেষ্টা থাকা দরকার। এছাড়া আর একটা মস্তবড় কথা, সবসময় সকল অবস্থায়ই নিজের অযোগ্যতা স্মরণ রাখতে হবে। স্বতন্ত্রতাবুদ্ধি আত্মসুখকামনা কোন রকমে এসেছে কি সব গড় বড় হ'য়ে যাবে।

দিদি—এ সব কি ক'রে হবে দাদা?

নবদ্বীপ—প্রার্থনা, শুধু চরণে অকপটে প্রার্থনা করবে, তিনি কৃপাশক্তি সঞ্চার ক'রে সব দুর্দ্দৈব সব বাধা বিপত্তি দূর ক'রে দিবেন।

দিদি—দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার উপদেশমত যেন নিজেকে তাঁর সেবায় ষোলআনা সমর্পণ ক'রে দিয়ে ধন্য হতে পারি।

নবদ্বীপ দাদা দিদির হাত দুইটি ধরিয়া "জয়গুরু জয়গুরু" বলিতে বলিতে উঠিয়া বলিলেন, "সেবার সময় বয়ে যাচ্ছে, দাদা (নবদ্বীপ দাদা বড় বাবাজী মহাশয়কে অনেক সময় দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন) হয়ত এখনি এসে পড়বেন, যাও সেবার কাজ কর গিয়ে।"

ললিতাদিদি ও কুসুমদিদি নবদ্বীপ দাদাকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

শুধু ললিতাদিদি নহেন, মঠের ছোট বড় সকলেই নবদ্বীপ দাদার কাছে নানাভাবে সময়োচিত উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। নবদ্বীপ দাদার অলৌকিক জীবন-কাহিনী কিছুদিন পূর্ব্বে "ভক্তি" পত্রিকায় প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তদানীন্তন রাজপুরুষগণের কৃপা কটাক্ষে (?) পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় আলোচনাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, প্রসঙ্গক্রমে যথাযথ স্থানে পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ দাদার সহিত মঠবাসীর যোগাযোগ ছিল। বড়বাবাজী মহাশয়ের কৃপা শাসনে নবদ্বীপদাদা শ্রীবৃন্দাবন যান এবং অল্পদিন পরেই আষাঢ়ী অমাবস্যায় স্বেচ্ছায় স্বাভীষ্ট ধামে গমন করেন। এই যে বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশাসন, এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। নবদ্বীপ দাদা বড়বাবাজী মহাশয়কে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দের প্রকাশ জ্ঞানে সেবা করেন এবং সেই ভাবেই প্রচার করিতে চাহেন, কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয়ের তাহা মনোমত না হওয়ায় একদিন আদেশ করিলেন, "আর যেন নবদ্বীপ আমার সঙ্গে দেখা না করে—তাকে বৃন্দাবনে যেতে বল" ইত্যাদি। এইসব কাহিনী 'চরিতসুধা' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দিদিকে পরীক্ষা

যেদিন হইতে দিদি পুরীধামে বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেইদিন হইতেই তিনি দিদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত

করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশের সহিত অকাতরে অফুরন্ত কৃপাশক্তি সঞ্চারেও কখনও কার্পণ্য করেন নাই। দিদি বড় বাবাজী মহাশয়ের তীব্র-সুকঠোর শাসন বিনা প্রতিবাদ হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয় তাহার ফলেই উত্তরকালে অভাবনীয় ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া অপার্থিব ভাব-রসাস্বাদনে নিজে ধন্য হইয়াছেন, অপর ভাগ্যবান জনকেও কিছু কিছু আস্বাদানের অধিকার দিয়া ধন্য করিয়াছেন।

বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশাসনের বহু ঘটনা নিভৃত লীলাস্থল ছিল শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জ। সেখানকার সেবা পূজা পূর্ব্বে যে ভাবেই চলুক না কেন, বড় বাবাজী মহাশয়ের আগমনের পর হইতে তাঁহারই নির্দ্দেশমত চলিত। প্রত্যহ দিনের বেলা এক সের চাউলের অন্নভোগ তখন হইত এবং সেই ভোগের প্রসাদ বড় বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাই ভক্তগণ কিছু কিছু অধরামৃতরূপে গ্রহণ করিতেন। ঝাঁজপিটা মঠ হইতে যে প্রসাদ আসিত, তাহাই ললিতাদিদি ও দুই তিনজনে সেবা করিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীরাধারমণ কুঞ্জে কোনও কারণে তিনবার রন্ধন করিতে হইয়াছিল। অনেকেই সেদিন সেখানে প্রসাদ পাইয়াছিলেন কিন্তু কি জানি কেন ললিতাদিদিকে প্রসাদ পাইবার কোনরূপ সুযোগ সেদিন দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য, রন্ধনকার্যাদি কিন্তু ললিতা দিদিকেই করিতে হইয়াছিল। আজ যেন বড় বাবাজী মহাশয়ের দিদির উপর একটু কড়া নজর। তিনি একটির পর একটি এমন কাজের আদেশ দিদির উপর করিতেছেন যে, ইচ্ছা থাকিলেও প্রসাদ গ্রহণের কোনরূপ অবসর দিদি পাইতেছেন না।

বড় বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় "জেনামঠ" হইতে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, অতি সূক্ষ্ম চিঁড়া ভাজা এবং নানাবিধ ফল মিষ্টান্নাদি আসিল। বড় বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করিতে করিতেই বলিলেন, "ঐ সব বস্তু ঠাকুর জাগিলে ভোগ লাগিবে, এখন এই ঘরেই আনিয়া রাখ।" দিদিও বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত সমস্ত জিনিষ তাঁহার ঘরেই তুলিয়া রাখিলেন।"

অপরাহ্ন চারিটার পর ঠাকুরের ঘর খোলা হইলে যথানিয়মে ভোগ লাগিল। এদিকে বাবাজী মহাশয় মুখহাত ধুইয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অবশিষ্ট প্রসাদ নিঃশেষে বন্টন করিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানেও ললিতাদিদি বাদ পড়িলেন। অন্তর্য্যামী সকল জানিলেও রঙ্গ করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো ললিতাকে তো দেওয়া হ'ল না? আচ্ছা, প্রসাদ কণিকামাত্র হলেই হবে, এই প্রসাদী বাসনে

যা লেগে আছে ওতেই ওর যথেষ্ট হবে।" এই বলিয়া বাসনগুলি দিদির দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

আজ সকাল হইতেই দিদি বাবাজী মহাশয়ের ভাব লক্ষ্য করিতেছেন। এখনকার ব্যাপারও দেখিলেন তথাপি কোন প্রতিবাদ না করিয়া আদেশমত বাসনগুলি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া একটু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং বাসনগুলি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া রাখিলেন। এখানে বলাই বাহুল্য যে, যে প্রসাদ দিদি গ্রহণ করিলেন তাহা সত্য সত্যই কণিকামাত্র। কিন্তু তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করিয়া আনন্দমনে "জয়গুরু" বলিয়া পুনরায় বাবাজী মহাশয়ের আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার প্রক্কালে বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত 'ভুবন সাউ'র বাড়ী হইতে পুরী, কচুরী, মণ্ডা ও অন্যান্য বহুবিধ মিষ্ঠান্ন এবং নানাবিধ ফল লইয়া এক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদও কিছু ছিল। বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীমন্দির দর্শনে যাইতেছেলেন; প্রসাদ উপস্থিত হইয়া মাত্র দণ্ডবৎ করিয়া উহা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সেই ভক্তকেই বলিলেন, "যাও, ললিতার হাতে দিয়ে বলবে—আমার অধরামৃত।"

প্রসাদের ডালি লইয়া ভক্তটি দিদির নিকট উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত দিদিকে সমস্ত বলিয়া প্রসাদের পাত্র তাঁহার হাতে দিলেন। দিদিও দণ্ডবৎ করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত প্রসাদ ঘরের মধ্যে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলেন।

বড় বাবাজী মহাশয় নিয়মিত দর্শনাদি শেষ করিয়া রাত্রি নয়টার পর মঠে ফিরিলেন। দিদির সহিত দেখা হইতেই সেই প্রসাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "সে প্রসাদ সেই ভাবেই ঘরের মধ্যে ঢাকা দেওয়া আছে।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন, "আমার অধরামৃত ব'লে পাঠালাম, তবু তুমি পাওনি কেন?"

দিদি—আপনি তো আমাকে পাবার জন্যে আদেশ করেন নি?

বাবাজী—হুঁ, বেশ বেশ, রাগ ক'রে নয় তো? আচ্ছা, যদি আদেশের অপেক্ষায়ই না পেয়ে থাক, তাহ'লে এ কথাটি যেন সব সময় স্মরণ থাকে। যাও, এখন আদেশ করছি, প্রসাদ পাও গিয়ে।

দিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদ পাইতে গেলেন।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে একদিন বড়বাবাজী মহাশয় দিদিকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন, সেদিন সারাদিন কিছু না খেতে দিয়ে একটার পর

একটা কাজের হুকুম ক'রে তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু এটা ঠিক জেনো যে, তোমাদের এভাবে তৈরী না করলে তোমরা শেষে সামলাতে পারবে না। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যেমন বাহ্যশৌচ করে, চিত্তের বাসনাকে ভোগের সুযোগ থাকলেও তা থেকে তুলে নিয়ে সংযত হওয়াকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা এবং সকলই আমার মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় ব্যবস্থা করছেন, এই ভাব মনে মনে দৃঢ় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।"

বিড়ালের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা

আজ বড় বাবাজী মহাশয়ের বদনমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর দেখা যাইতেছে। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি দেবী যেমন থমথমে ভীষণাকার ধারণ করে, আজ সমস্ত মঠের মধ্যেই যেন সেই ভাব। সকলেরই মনে আশঙ্কা হইতেছে কখন কি অঘটন ঘটে।

বাবাজী মহাশয় গম্ভীর ভাবে উন্মুক্ত গাত্রে মঠের আঙ্গিনায় বেড়াইতেছেন। দৃষ্টি নিম্নদিকে, হচ্ছে নামের মালা। বেলা অনুমান অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। ভক্তগণ যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে দিদি রান্নাঘরের পার্শ্বে বারান্দায় বসিয়া বাম হাতে কি যেন একটা মালিশ করিতেছেন। তিনটা সাড়ে তিনটার পর হইতে দিদির বাম হাতখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ যন্ত্রণা হইতেছে। মালিশ করিতে করিতে দিদি মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া "জয়গুরু জয়গুরু' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন।

বাবাজী মহাশয় বেড়াইতে বেড়াইতে নামের মালা হাতে করিয়াই দিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দিদি যন্ত্রণা-কাতর মুখে কি বলিতে যাইয়া বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। সে গম্ভীর মুখেভাব দিদির প্রাণেও ভীতির সঞ্চার করিল। বাবাজী মহাশয় একটু পরেই বলিলেন—"কায়মনে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে, এ বচনটি শুধু মুখে বললেই হয় না ললিতা! কাজের মধ্য দিয়েও দেখাতে হয়।"

দিদি উত্তর দিতে যাইয়া এক ধমক খাইলেন। বাবাজী মহাশয় পুনরায় বলিলেন, 'ঢের হ'য়েছে, আর সাফাই গেয়ে নিজের দোষ ঢাকতে হবে না। এখন ভাল চাও তো যার কাছে অপরাধ করেছ, তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।" বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

মালিশের কৌটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল, দিদি উঠিয়া গিয়া তাঁহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কখন কিসে এমন হইল।

ঝাঁজপিটা মঠের অধিকাংশ সেবার কার্য্যই তখন দিদির উপর ছিল। অন্যান্য সেবক সেবিকা যাঁহারা ছিলেন, যদিও তাঁহারা তাঁহাদের সাধ্যমত সেবাকার্য্যে আনুকূল্য করিতেন, তথাপি দিদিকে সমস্ত সময় সকল বিষয়েই দেখাশুনা করিতে হইত। কাজেই হঠাৎ এইভাবে দিদি অসুস্থ হওয়ায় সেবাকার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সমস্ত জানিয়াও কোনরূপে ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া একজন সেবক যাইয়া তাঁহাকে বলিল "ললিতা দিদির হাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়েছে, নিকুঞ্জ ভোগের যোগাড় করতে পারছেন না, আপনি অন্য কাকেও দিয়ে ভোগের ব্যবস্থা করতে আদেশ করুন।'

বাবাজী মহাশয় গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন, "কেন, হাতে সামান্য একটু ব্যথা হয়েছে তারজন্য সেবার কাজ বন্ধ করবার কি দরকার হল নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের ফলে জীবের যে সমস্ত ভোগ আসে, তা ভোগ না করলে চলবে কেন? তাকে গিয়ে বল—সেবার কাজ যেন ছাড়ে না, ছাড়লে যে দুঃখ পাচ্ছে তার চেয়েও বেশী দুঃখ পাবে।"

সেবক ভক্তটি আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া গিয়া দিদিকে সমস্ত বলিলে দিদি "জয়গুরু" বলিয়া উঠিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সেদিন কাটিয়া গেল, তাহার পরের দিনও সেইভাবে হাতে ফুলা ও যন্ত্রণা লইয়া দিদি সেবার কার্য্য করিলেন। সময় যাইতেছে কিন্তু যন্ত্রণার উপশম দূরের কথা বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। বাবাজী মহাশয় নিজ হইতে তো কিছু করিলেনই না, দু একজন ঔষধির কথা বলায় বলিলেন—"আত্মচৈতন্য না হ'লে বাহিরের ঔষধে কি ক'রবে? যদি ঔষধেই সমস্ত রোগ ভাল হ'ত, তাহলে আর জগতের লোক এত কষ্ট পেত না। ভগবৎ-সংসারে থেকে নিজেকে কর্ত্তা বা শাস্তা মনে ক'রে কাজ করলে তার জন্য শাস্তি পেতে হয়ই। সে কষ্টভোগ তাকে করতেই হবে। প্রতিটি কার্য্যে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার ক'রে চলতে হবে, তা না পারলে ভগবৎ-সংসারে থাকা বা আনন্দ পাওয়া সুকঠিন প্রভু যখন এসব চৈতন্য করিয়ে দিবেন তখনই দেখবে সব ভাল হয়ে গেছে।"

এদিকে বাবাজী মহাশয়ের এই ভাব, ওদিকে দিদি একটু অবসর পাইলেই চিন্তা করেন—তাই তো, কিছুতেই তো মনে করতে পাচ্ছি না যে, কি এমন গুরুতর পাপ করলাম। যার ফলে সেবায় বঞ্চিত হতে বসেছি।

আবার কখন কখন প্রভুর উপর অভিমান করিয়া ভাবেন "প্রভুও তো কই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না যে, কিসে আমার এমন হল ?' এই ভাবের ভাবনাচিন্তার মধ্য দিয়া সারাদিন কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিদি বসিয়া আছেন। কুসুম দিদি কুঞ্জ দাদার সঙ্গে আসিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন আছ দিদি! আজ যেন তোমাকে খুবই কাতর দেখছি?'

দিদি—মনোমত সেবার কাজে যোগ দিতে পারছি না, তার উপর কিসে এমন হ'ল, এইসব চিন্তা ক'রে মনটা খুব খারাপ লাগছে। দেখ ভাই, মুখে অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলি কিন্তু কাজে করতে পারি না। আমি তোমার হলাম, আমার যা কিছু ভার তুমি নিলে, মুখে তো খুব বলি কিন্তু কাজের সময় হয় কই। সত্যি সত্যিই যদি বলতে পারতাম, এটা যদি আমার অকপট প্রাণের প্রার্থনা হ'ত, তাহ'লে আবার আমি এটা-সেটা ভাবব কেন? শরীরে ব্যাধি এলে তার ভাবনা, এসব আর আমার হবে কেন যদি সকল ভার তাঁকে দিয়েই দিয়েছি? তা যখন হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে সত্যি সত্যি আমি ভার দিতে পারিনি, শুধু বচনে দিয়েছি।

কুসুমদিদি—দিদি! যিনি ব্যাধি দিয়েছেন, যিনি বিপদ দিয়েছেন, তিনিই তোমার সহ্য করবার শক্তি দিবেন। তুমি বিচলিত হয়ো না।

দিদি—না ভাই, আমি সেজন্য হতাশ হচ্ছি না। প্রারব্ধ আমাকে ভোগ করতেই হবে। তবে এই দুঃখ যে, আমার জন্য তোমরাও অশান্তি পাচ্ছ।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, যে যার কাজে চলিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে আরতির পর ভোগরাগাদি হইয়া সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গেলে দিদিও প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন এবং পূর্ব্বের মত ভাবিতে ভাবিতে কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষরাত্রে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় চমকিয়া উঠিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, "আমার মনে হয় সেদিন এই হাতে বিড়ালটাকে মারিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার হাত এইরূপে হইয়াছে।' আশ্চর্য্য ব্যাপার, মনে মনে এইরূপে চিন্তা করিতে করিতেই হাত নাড়িয়া দেখেন ব্যথা অনেক কম।

অবশিষ্ট রাতটুকু ঐ চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। প্রাতে উঠিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই যে হাতের ব্যথা বেশ ভাল হয়ে গেছে। কি ঔষধে ভাল হ'ল?"

দিদি—গৃহস্থ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণই চোরে চুরি করতে পারে, জাগলে আর কি চুরি করবার সুযোগ হয় ?

বাবাজী—বেশ বেশ, জেগেছ তো ? চৈতন্য হয়েছে ? কোন অপরাধে ঐরূপে হয়েছিল ধারণায় এসেছে ?

দিদি—আমার বোধ হয় সেদিন দুপুরবেলা মহাপ্রসাদ পাবার সময় সেই যে

বিড়ালটাকে মেরেছিলাম, তাতেই আমার হাতে এইরূপে ব্যথা হয়েছিল।

বাবাজী— বোধ হয় কেন, বিশ্বাস কর, নিশ্চয়ই সেইজন্য তোমার এত ভোগ।

দিদি—আচ্ছা, বিড়ালকে কৃষ্ণসেবার বাদী ব'লে যখন রাধারাণী পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন, তখন তাকে তাড়ালে অপরাধ হবে কেন ? এই তো কয়েকদিন পূর্ব্বে এই মঠেই রান্নাঘরে ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত করা ভোগের দ্রব্যে মুখে দিয়েছিল ব'লে সব দ্রব্য নষ্ট ক'রে ফেলা হ'ল। তবুও কি তাকে আদর করতে হবে।

বাবাজী—বিড়াল কৃষ্ণসেবার বাদী হতে পারে, কিন্তু তা ব'লে সে কৃষ্ণ বা বৈষবের অধরামৃতের ভাগী হবে না, এ সিদ্ধান্ত কোথায় পেলে? জীবমাত্রই যখন কৃষ্ণদাস, তখন বিড়ালও কৃষ্ণদাস। দাসের কষ্টে প্রভুর কষ্ট। আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি দণ্ডবৎ করবার বিধান শাস্ত্রে আছে। সে তোমার উপকার করুক আর নাই করুক, ভগবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিকেই তুমি অবজ্ঞা করতে পার না। কেন না, তা হলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে অবজ্ঞা করা হয়। প্রাণীমাত্রের দ্বারাই কোন না কোন আনুকূল্য পাওয়া যায়। ত্রিবিধ আশ্রমই রজোগুণ বা তমোগুণের অনিষ্টকারিতা স্বীকার করেছেন। "নিন্দাশূন্য নম্রভাব সবারে স্তবন। অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণ বন্দন।' প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া, কায়মনোবাক্যে সকলকে সন্তোষ করা, যথালাভে সন্তুষ্ট থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসেবন মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। রাজর্ষি জনক, মহারাজ অম্বরীষ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির আচরণ স্মরণ কর দেখি?

দিদি আমাদের মত অসংযত বহির্ম্মুখ জীবের ঐরূপে হবার আশা করাও বিড়ম্বনা নয় কি ?

বাবাজী—ও কি বলছ ললিতা! প্রভুর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। যখন তোমাদিগকে ভগবৎ-সংসারের সেবক সেবিকা ক'রে নিতাইচাঁদ পাঠিয়েছেন, তখন যোগ্যাযোগ্য সম্ভব অসম্ভব তিনি বুঝবেন। তোমাদের কর্ত্তব্য প্রাণপনে তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলা। যাঁরা কৃপাসিদ্ধ তাঁদের এইটাই সাধন জানবে।

দিদি—যদি সাধন করতেই হ'ল, তাহলে আর কৃপা কি হ'ল?

বাবাজী—কৃপার সাধনভজনে আর সাধনের সাধনভজনে অনেক পার্থক্য। কৃপাসিদ্ধদের নিজ চেষ্টায় কিছু উপার্জ্জন করার আবশ্যক হয় না, কেবল কৃপাপ্রাপ্ত বস্তু যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য যত্ন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধদের সাধন বস্তু-প্রাপ্তির জন্য নয়, প্রাপ্তবস্তু রক্ষার জন্য। তোমাদের পক্ষে যাতে কৃপাপ্রাপ্ত বস্তু রক্ষা হয়, তার জন্য অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূলে বর্জ্জন করতে পারলেই যথেষ্ট হবে।

দিদি—আমি অত শত বুঝি না। বিশেষ কিছু যে করতে পারব সেরূপ সামর্থ্যও নেই। যে অমূল্যনিধি কৃপা ক'রে দিয়েছেন, যাতে তা নষ্ট না হয় সযত্নে রক্ষা করে ভোগ করতে পারি, তার ব্যবস্থাও আপনাকেই করতে হবে। সত্যই আমি শক্তিহীন, যখন যেমন দরকার শক্তি দিয়ে যোগ্য ক'রে নিন, এইটিই প্রার্থনা।

বাবাজী—তা না হয় করা হ'ল। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে এই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, সে বিষয়টা একটু ভেবে দেখছ কি? আমি সেদিনের সেই বিড়াল মারার ঘটনা আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করেছি। বল দেখি, কি নৃশংসতার কাজ তুমি সেদিন করেছিলে? তোমরা উদরপূর্ত্তি ক'রে মহাপ্রসাদ পাচ্ছ, আর ক্ষুর্ধার্ত্ত একটা জীব একমুষ্টি প্রত্যাশী হয়ে তোমাদের কাছে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত তো হলই, উপরন্তু প্রহার খেল। আচ্ছা, ভাব দেখি, লোকালয়েই যদি ওরা ঐরূপে প্রহার খেয়ে বিতাড়িত হবে, তা হ'লে ওদের উপায় কি? ওরা যাবে কোথায় ?

এইভাবের বহু উপদেশ দিয়া, নানাবিধ শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা কিভাবে চলিতে হইবে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া বাবাজী মহাশয় নিবৃত্ত হইলে দিদি সাষ্টাঙ্গে বাবাজী মহাশয়কে ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

বলাবাহুল্য, দিদি আশ্রমের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া সেই বিড়ালটাকে ধরিয়া আনিলেন এবং নানা প্রকার মিষ্ট বাক্য বলিয়া তাহাকে কিছু, আহার্য্য দিয়া তাহার নিকট কাতর ভাবে নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরাধারমণের কৃপায় সেইদিন হইতে দিদির হাতের বেদনা ও ফুলা একেবারে নিরাময় হইয়া গেল।

ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল দুইদিন পূর্ব্বে বেলা দুটো আড়াইটার সময়। মঠের সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। ললিতা দিদি, কুসুম দিদি, বিনোদিনী দিদি প্রভৃতি কয়েকজন প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। বড় বাবাজী মহাশয়ের আদেশ—প্রসাদ পাইবার সময় কেহ বাজে কথা বলিতে পারিবে না। তাই ইঁহারা নানাবিধ লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে প্রসাদ পাইতেছেন। হঠাৎ একটা বিড়াল সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

কয়েকদিন পূর্ব্বে রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকিয়া ভোগের দ্রব্যাদিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশে প্রায় তিরিশ সের চাউলের অন্ন ও তদুপযোগী ডাল-তরকারী সমস্ত মাটিতে গত করিয়া পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছিল। এবং অতি সন্তর্পণে ঘর পরিষ্কার করাইয়া পুনরায় ললিতা দিদিকে দিয়া রন্ধন করাইয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। সেই দিন হইতে মঠের সকলের মনেই বিড়ালের উপর একটা কেমন অশ্রদ্ধা ভাব জন্মিয়াছিল। তাই আজ

বিড়ালটি যেমন উঁহাদের নিকটে আসিয়া ম্যাঁও' করিয়া ডাকিয়াছে, অমনি দিদি তাহাকে বাম হাতে মাথার উপর একটা চাপড় মারিয়াছেন। যদিও চাপড়টি খুব জোরে মারেন নাই তথাপি বিড়ালটির মুখে ঘরের মেঝেতে ঠুকিয়া যাওয়ার সে আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সেইজন্যই দিদির হাতের যন্ত্রণা ও ফুলা আর তার ফলেই বড় বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ কৃপাশাসন ও দিদিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সব উপদেশাদি দান।

আর একবার দিদি ভোগ রান্নার বাসনের উপর অসাবধানতা বশতঃ পাদ-ধৌত জল ফেলিয়া কয়েকদিন পায়ের যন্ত্রণার কষ্ট পাইয়াছিলেন। শেষে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হয়েছে। অনুসন্ধান ক'রে তারজন্য অনুতপ্ত হও, ভাল হয়ে যাবে।' সেবারেও চিন্তা করিতে করিতে উপরোক্ত ঘটনা মনে হওয়ায় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সম্মুখে অপরাধ ক্ষমা চাহিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া রোগমুক্ত হন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত তথাকথিত বাবুরা এসব বিশ্বাস তো করিবেনই না বরং গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস করাইবার মত যুক্তি হয় তো আমি দেখাইতে পারিব না, তর্ক করিবার ক্ষমতাও হয়ত আমার নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সত্য ঘটনা, যাহা চোখের সামনে ঘটিয়াছে, গোপনে নিভৃতকক্ষে নয় দশজনের সম্মুখে প্রকাশ্যে, তাহা প্রকাশ করিতে কুঠিত হওয়ার কোন কারণই আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। অধিকন্তু আমার মনে হয়, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস আনয়ন জন্য এ সকল ঘটনা প্রকাশ না করাই অন্যায়। তাই দিদির জীবনী প্রকাশ করিতে যাইয়া যতটুকু যেখানে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি ভক্ত পাঠকগণকে তাহা উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম, পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

রোগীর সেবা তাঁরই সেবা

একবার পুরীতে রথযাত্রার অব্যবহিত পরেই কলেরার অত্যন্ত প্রকোপ দেখা দেয়। একটি উৎকলবাসিনী বৃদ্ধা ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া দৈবক্রমে মঠের আশ্রয়ে আসিয়া পড়েন। ললিতা দিদি তাঁহার সর্ব্ববিধ সেবাশুশ্রূষার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে রোগমুক্ত হইলেও দুর্ব্বলতাবশতঃ নিজে হাতে করিয়া কিছু খাইতে পারেন না। কাজেই দিদি তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিতেন।

দিদি একদিন বিশেষ কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার খাবার দিতে বিলম্ব

হইয়াছিল, স্মরণ হাওয়ামাত্রই খাবার লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত সহকারে মুখে তুলিয়া দিতে উহা মাটিতে পড়িয়া গেল। পুনরায় তুলিয়া দিতে বুভুক্ষু উৎকলবাসিনী বৃদ্ধা অজ্ঞাতসারেই দিদির একটি আঙুলে কামড়াইয়া দেয়। তাহাতে ক্ষত হইয়া দিদির দৈনন্দিন সেবার কার্য্য বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে।

দিদির মনে বড় ক্ষোভ। বড় বাবাজী মহাশয়ের সেবার কার্য্য কিছু করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য দিদির সেবার অভাবে বাবাজী মহাশয়েরও যে অসুবিধা না হইতেছে তাহা নহে। কারণ, ললিতাদিদি যেভাবে যেটির পর যেটি বাবাজী মহাশয়ের মনোমত করিয়া দিতেন, অন্য কেহ সেরূপভাবে পারিতেন না। তাই দিদির দুঃখ

আজ বাবাজী মহাশয় আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় অন্যান্য মঠবাসীদের সঙ্গে দিদিও গিয়া তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তগণ যাহার যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়ও যথাযথ উত্তর দিতেছেন। ক্ষত স্থানে কোনরূপ আঘাত লাগে সেই ভয়ে দিদি হাতখানি বাবাজী মহাশয়ের পালঙ্কের উপর একবারে রাখিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের এক পদাঘাত সজোরে দিদির হাতের উপর ক্ষতস্থানে পড়িল। দিদি মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন। ক্ষতস্থান হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজরক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই দিদির শুশ্রুষায় ব্যস্ত হইলেন। কিছু সময় পরে দিদির চৈতন্য হইলে সকলে ধরাধরি করিয়া বসাইয়া দিলেন।

বাবাজী মহাশয় পালঙ্কের উপর থাকিয়া দিদির অবস্থা সকলই দেখিতেছেন। দিদি উঠিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া বাবাজী মহাশয়ও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ললিতা! সেবা করছিলে কার ? তোমার ঠাকুর কি তোমার সেবা-গ্রহণ জন্য ঐরূপে রূপে ধ'রে আসতে পারেন না ?’

ললিতা— আমি যে চিরবহির্ম্মুখী, পদে পদে ঠেকেও যে আমার চৈতন্য হচ্ছে না।

বাবাজী—তোমার অপরাধ কোথায় বুঝতে পেরেছ? যদি বুঝে থাক, তবে অপকটে এদের সামনে সব কথা প্রকাশ ক'রে বল।

ললিতা — এতক্ষণে আপনার কথায় আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমি সেদিন সেই বৃদ্ধা রোগীণীকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে মনে করছিলাম—একে সেবা করতেই যদি আমার এত সময় লেগে যায়, তবে আর আমার শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা কখন হবে? ঠিক এইরূপে ভাবনার পরেই আমার এই দুর্দ্দশা। আমি

আমার এই কৃত অপরাধের জন্য সকলের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বাবাজী— এ সকলের কাছে ক্ষমা চাইলে হবে না। যাও, যার কাছে অপরাধ করেছ, তার কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ক্ষমা চাও। তোমাদের দেখছি কিছুতেই চৈতনা হবে না। ঐ যে পণ্ডিত মশাইরা বলেছেন না—'শর্করাশতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতম্। পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে।।"

বলা বাহুল্য, দিদি বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত বৃদ্ধার নিকট যাইয়া করযোড়ে সমস্ত নিবেদন করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা ক্ষত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন*

যতদিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট দিদির থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, ততদিনই প্রত্যেকটি কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার কৃপাশাসন দ্বারা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পরও ঐকান্তিক, বিশ্বাস ভক্তি বলে দিদি এরূপ কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান কালে কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, যদি কৃপা করিয়া প্রকাশ করান, তবে যথাযথ স্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

দিদির নানা ব্যবহার

পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে আমরা দিদির কোন দেবদেবীর উপরই যে অশ্রদ্ধা ভাব ছিল না, তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গীবেশ ধারণের পর বড় বাবাজী মহাশয়, নবদ্বীপ দাদা, গোবিন্দ দাদা প্রভৃতির শিক্ষা ও আচরণের দ্বারা এমনভাবে সখীজীবনে আচার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে, অনেক সময় বড় বড় পণ্ডিত মহাশয়দিগকেও ঐ সমস্ত দর্শন করিয়া বলিতে হইয়াছে— অপূর্ব্ব, অতুলনীয়, অদ্ভূত!

শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমনের পরে পুরীধামে অবস্থান সময়েও মঠে সত্যনারায়ণ পূজাদি হইত, তবে নবদ্বীপে আসিয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যেক মাসে সংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে এবং একটা শনিবারে শনিপূজা ও রবিবারে দশোপচারে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোন বৃহৎ উৎসব পর্ব্ব হইলে তাহার পর একদিন শ্রীমন্দির হইতে রাজরাজেশ্বরকে আনিয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজার ব্যবস্থা করিতেন। পূজার জন্য দ্রব্যাদির আয়োজন বিষয়ে দিদি কখনও

* পরমারাধ্য বড় বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপদ-পরশে দীন লেখকেরও একটি অতি ভীষণ ক্ষত বিনা ঔষধে ভাল হইয়াছিল। এবং তদানীন্তন বিলাত ফেরৎ ডাক্তার সাহেব আর এল, দত্ত মহাশয় উহা দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত অনেক আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি লেখকের 'আত্মকাহিনী'তে আছে।

কোনরূপে কার্পণ্য করিতেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই যথাবিধি দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন।

বৈশাখ মাসে ইন্দ্রপূজা, ভাদ্রমাসে বিশ্বকর্মা পুজার সময়ে কলঘরে বিশ্বকর্ম্মা পূজা, দুর্গাপূজার সময় একখানি বড় চিত্রপটের সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া ষষ্ঠীর দিন হইতে বিজয়া দশমী পর্যন্ত যথাবিধি চণ্ডীপাঠাদি দ্বারা কাত্যায়নীর পূজা করাইতেন। দিদি বহু পরিশ্রমে একটি দুর্গাপূজা-পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া হরিভক্তিবিলাস, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যবস্থা মতে সংস্কার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই নিয়মেই পূজা হইত।

উপযুক্ত পুরোহিত এবং তন্ত্রধারক থাকিলেও দিদি তাঁহাদের কাছে থাকিয়া সমস্ত কার্য্য দেখাশুনা করিতেন। কালীপূজার সময়ও ঐরূপ চিত্রপট রাখিয়া মায়ের পূজা হইত। এছাড়া ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, পূর্ণিমা, রাস, দোল, অন্নকূটে প্রভৃতি যাবতীর পর্ব্বই যথাযথভাবে পালন করিতেন। এমনকি মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথির আরাধনাও দিদির নিকট বাদ পড়ে নাই।

সমাজবাড়ীতে ঝুলনযাত্রা উৎসব শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চৌদ্দদিন করিতেন। অক্ষয়তৃতীয়ায় জলকেলী, চন্দনযাত্রার সময় ঠাকুরকে নানা আভরণে বিভূষিত করিয়া সুসজ্জিত চৌদোলায় চড়াইয়া কীর্ত্তনসহ নগর ভ্রমণান্তে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় লইয়া যাওয়া হইত। এই সময় তিনদিন দিদি সমাজবাড়ী হইতে বাহির হইতেন। বড়ালঘাটে যাইয়া দিদি নৌকায় উঠিতেন। ভাগ্যবান বলাই মিস্ত্রি তিন দিনই দিদিকে ঘাটের উপর হইতে কোলে করিয়া লইয়া নৌকায় তুলিয়া দিতেন। ঐ ভাগ্যবান যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় দিদি নিজহস্তে সকল গুরুভ্রাতাদের কপালে কাজল চন্দনাদির ফোঁটা দিতেন এবং নানাবিধ পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ দিতেন।

এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব দর্শন-লালসায় নবদ্বীপ বাতীত অনেক দূর-দূরান্তর হইতেও ভক্তগণ সমবেত হইতেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় রামদাদাও ঐ সময় যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আসিয়া দিদির নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার হাতে ফোঁটা গ্রহণ করিতেন।

নবদ্বীপে বড় বাবাজী মহাশয়ের শুভাগমনেই একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহার উপর আবার এই ললিতা দিদির আগমনে ভাবটা যেন আরও একটু জোরাল হইয়া উঠিল। সর্ব্বসাধারণে তো আসা-যাওয়া করেই,

পণ্ডিত মহাশয়রাও সময় সময় দল বাঁধিয়া আসিয়া দিদিকে দেখিয়া যান। জনসমাজে কিভাবে যেন প্রচার হইয়া পড়িল যে, ললিতা সখী নামী লোকটি পুরুষদেহধারী, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। গুরুর আদেশে সখীবেশ ধারণ করিয়াছেন। বোধহয় পণ্ডিত মহাশয়গণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই আসিতেন যে, এতবড় পণ্ডিত হইয়া স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া নিজ প্রতিভাকে কেমন করিয়া চাপা দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া আছেন তাহা দেখিতে।

আখড়ায় আখড়ায়, মন্দিরে মন্দিরে, বাবুভায়াদের বৈঠকখানায়, এমনকি দু'পাঁচ জন মিলিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতেও দিদির সম্বন্ধেই নানা প্রকারের সত্য-মিথ্যা আলোচনা চলিয়াছে। যার যেমন জ্ঞান, যার যতটুকু ধারণা করিবার শক্তি, সে সেই ভাবেই দিদির ভাবের ও বেশের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। কয়েকজন প্রচার করিয়াছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ইনিই নবদ্বীপে 'চৈতন্য চতুষ্পাঠীতে এক ব্রহ্মচারীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। আবার কেউ বলেন, রাজার ছেলে চক্রান্তে পড়িয়া বিষয় বৈভবে বঞ্চিত হইয়া এইভাবে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন। কেউ বলেন, বিএ পাস করিয়া মাথা খারাপ হওয়ায় নিজেকে এইভাবে সাজাইয়াছেন। কেউ বলেন, বিয়ে করেছিলেন, বৌ ম'রে যেতে শোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। এমন কি খুনী আসামী সাজাতেও কেউ কেউ কসুর করেন নাই। যাঁহারা দিদির পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন, তাঁহারা এইসব ভিত্তিহীন আলোচনা শুনিয়া মনে মনে হাসিতেন মাত্র।

"ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ" নানাবিধ রুচির লোক নানাপ্রকার আলোচনা করিবে এ আর আশ্চর্য্য কি! কোনরূপে আলোচনা কাহারও রুচিকর না হইলে ঘোর প্রতিবাদ উঠে, কেহ কেহ দিদির নিকট আসিয়া সকল কথা জানানও। দিদি কিন্তু কোনরূপে বিচলিত না হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া একে একে বিদায় করেন। অন্তরঙ্গ কাহাকেও পাইলে বলেন, "নবদ্বীপবাসী কি আলোচনা করবার আর কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না? একটা নগণ্যা অদৃশ্যা অস্পৃশ্যার কথা নিয়ে এত মাতামাতি করেছেন কেন?' এই সময় বাধ্য হইয়াই দিদিকে অনেক সময় ঘরের মধ্যে থাকিতে হইত। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মঠের সেবকগণ তাঁহাকে বাহিরে আসিতে দিতেন না। বাহিরের লোকের সহিত বিশেষভাবে মেলামেশা করিলেও দিদির নিয়মিত কার্য্য-পদ্ধতির কোনরূপে পরিবর্তন হয় নাই। যে তিথিতে যেভাবের পূজা অর্চ্চনা করা প্রয়োজন, দিদি নিখুঁতভাবে তাহা করিতেন। যদিও মঠের নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত

দ্বারাই দেবদেবীর পূজা অর্চনার কার্য্য করা হইত, তথাপি দিদি নিজে উপস্থিত থাকিয়া কি প্রণালীতে কিভাবে অর্চ্চনাদি করিতে হইবে, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। কখনও ইহার ব্যতিক্রম হইতে আমরা দেখি নাই।

এক সময় শ্রীধাম নবদ্বীপের কয়েকজন পণ্ডিত দিদির এইসব বিধিব্যবস্থা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "শাড়ী প'রে ঘরের কোণে ব'সে থাকলে কি হবে, ওঁর কাছে আসল কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। বাপ রে বাপ, সব কাজে কি সূক্ষ্ম, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!"

বৈষ্ণব বাবাজীর মঠে দেবীর পূজা হয়। প্রথম প্রথম এই বিষয় লইয়া নবদ্বীপের বৈষ্ণব বাবাজী মহলে বেশ একটু সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন সকলে মিলিয়া বিশেষতঃ কয়েকজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত দিদির সহিত প্রকাশ্য আলোচনা করিয়া ও সেবা-পূজা পদ্ধতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা কোনর অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে।' তখন সকলে শান্ত হন। এই সময়েই পণ্ডিত মহাশয়গণের বিশেষ আগ্রহে বড় বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বনির্দ্দেশমত দিদিকে একখানি দুর্গাপূজো পদ্ধতি লিখিতে হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত্য সেই পদ্ধতি অনুসারে সমাজ বাড়ী ও ইঁহাদের মতাবলম্বী ভক্তগণ নিজ নিজ বাড়ীতে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহাশয়গণ দিদির সহিত আলোচনা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেও সমালোচনা একেবারে বন্ধ হইল না। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট একদল বৈষ্ণব যাইয়া নালিশ করিলেন দুর্গাপূজা সম্বন্ধে। প্রভুপাদও তখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে দিদির সহিত একমত ছিলেন না। কাজেই আলোচনার সুযোগ মিলিল।

একবার মহাষ্টমীর দিন বাগান বাড়ীতে দিদির নির্দ্দেশমত পূজা চলিতেছে, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় অযাচিত ভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা না করিয়া প্রভুপাদকে পূজাস্থলেই বসাইলেন। প্রভুপাদও পুরোহিত ও তন্ত্রধারকের পূজা-পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পূজা অন্তে প্রভুপাদ ধীর কণ্ঠে দিদিকে বলিলেন— "সখীজি! পূজা তো দেখলাম কিন্তু প্রচলিত পূজা পদ্ধতির সঙ্গে যেন স্থানে স্থানে অমিল হচ্ছে মনে হ'ল। এ পদ্ধতি কোন্ বিধি অনুসারে সংগৃহীত হয়েছে?"

দিদি—প্রভু। দাসীকে এ আবার কি জাতীয় পরীক্ষা করছেন? আপনার অবিদিত কি আছে ? আমি তো নিজের মনগড়া কিছু করিনি। 'আনন্দবৃন্দাবন-চম্প্ গ্রন্থে কাত্যায়নী দেবীর পূজার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, শ্রীগুরুদেবের আদেশমত

আমি তো সেই অনুসারেই পূজার ব্যবস্থা করেছি।

প্রভুপাদ—গ্রন্থখানি একটু আলোচনা করতে ইচ্ছা হয়।

দিদি — সে আর বেশী কথা কি, দয়া ক'রে ভিতরে গেলেই হয়। এই বলিয়া দিদি প্রভুপাদকে সঙ্গে লইয়া নিজের ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় গেলেন। সেখানে বসিয়া "আনন্দবৃন্দাবন-চম্প্" গ্রন্থের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ দিদির পূজা-পদ্ধতির সহিত গ্রন্থের বর্ণনা অবিকল মিল দেখিয়া এবং স্থানে স্থানে লীলাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব দিদির নিকট শুনিয়া আনন্দাতিশয্যে সময় সময় কাঁদিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শেষে উভয়ে উভয়কে দণ্ডবৎ করিয়া প্রেমপরিণত হৃদয়ে গদগদ কণ্ঠে প্রভুপাদ দিদিকে বলিলেন—

"আজ আমার সুপ্রভাত, সন্দেহ নিরসন তো হ'লই, ভজন-রাজ্যেরও একটি নতুন পথের সন্ধান গুরুকৃপায় মিলে গেল।'

বলা বাহুল্য, অতঃপর বহুক্ষেত্রে প্রভুপাদ এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া দিদির সংগ্রহীত পূজাপদ্ধতি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এঁরা কারা

নবদ্বীপে আগমনের পর হইতেই তিনটি লোকের উপর দিদির কেন জানি না একটু বেশী শ্রদ্ধাভক্তি দেখা যাইত। অবশ্য কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব কখনও দেখান নাই। তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে যাঁহারা যতটুকু পাবার যোগ্য, এই তিনটি লোকের বেলা কেমন যেন তিনি একটু অন্যপ্রকার ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা কে, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিদির নিকট আসিতেন আর দিদিই বা ইঁহাদের ভিতর কি ভাব দেখিয়া এ জাতীয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন তাহা দিদিই জানেন।

এই তিনটি লোকের নাম—১। দেদার বক্স। ২। বিদেশী মেথর। ৩। মুরারী মুদ্দফরাস্। ইঁহারা বাগানবাড়ীতে আসিলে দিদি ইঁহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইয়া দণ্ডবতাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানাইতেন এবং যখন যাহা ঠাকুরের প্রসাদ থাকিত তাহা দিয়াই ইঁহাদের সেবা করিতেন। আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, ইঁহারা স্বতন্ত্রভাবে কখনও আসিতেন না। যখন আসিতেন তিনজনে একত্রেই আসিতেন।

একদিন দিদির বসিবার বারান্দার সম্মুখে উঁহারা বসিয়া দিদির সহিত কথা বলিতেছেন। জিতেনবাবু প্রভৃতি নবদ্বীপের কয়েকজন সেখানে উপস্থিত। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কিছু বাল্যভোগের প্রসাদ পাইয়া উঁহারা চলিয়া গেলেন। হরিসভার নিকট থাকেন এক ভক্ত (নাম দিতে আপত্তি করিয়াছেন)

উঁহারা চলিয়া যাইবার পর তিনি দিদিকে উঁহাদিগকে এরূপ সম্মানাদি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দিদি প্রফুল্ল অন্তরে বলিলেন—"ভাই! এঁরা তিনটি বিশুদ্ধ সত্ত্বের আধার! এঁদের ভিতরে আমি সত্য সত্যই ব্রহ্মণ্যভাব বর্ত্তমান দেখতে পাই। আমার একথা শুনে তোমরা হয়ত মনে দুঃখ পাবে, কিন্তু আমি অকপটে তোমাদের কাছে বলিব, এঁদের সেবা ক'রে আমি বড়ই সুখ পাই। তোমাদের বল্‌তে কি, এঁদের একটু সেবা করলে কর্ত্তার (বড় বাবাজীর মুখে যেন আনন্দ ফুটে উঠে। তোমরাও লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ভাই! আমার আর কি আছে? তাঁর সুখ হ'লেই আমার সুখ। একদিন দাসীকে কৃপা ক'রে শ্রীমুখে বলেছিলেন—'গুরুসেবক গুরু সেবা ক'রে চরণপানে তাকাবে না, সেবক চাইবে গুরুদেবের সুখের পানে ও মুখের পানে।'

শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত রামদাদার মুখে শুনেছি শ্রীগুরুদেব বলেছিলেন—"তোমার গুণ ব'লে কোন কিছু নেই, এই কথা সব সময় স্মরণ রাখবে। কাজেই তোমার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা কেউ বললে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবে। তারপর গতজীবন চিন্তা ক'রে দেখবে ঐ জাতীয় কোন দোষ ব্যবহারে প্রকাশ বা মনে জেগেছিল কি না। যদি অনুসন্ধানে না পাও তবে ভবিষ্যৎ জীবনে ঘটতে পারে ব'লে প্রাণে প্রাণে স্বীকার ক'রে নিবে। আর বুঝবে, অন্তর্য্যামীরূপে শ্রীগুরুদেব হৃদয়ে ব'সে তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দিদি যেন কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টি উর্দ্ধ। কাছে যাঁহারা ছিলেন ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে দিদি বলিলেন, "আবার বলিয়াছিলেন—

'আর একটা কথা, খবরদার ভাই! খোসা দেখিস না, ঠকে যাবি—পারিস তো ভিতরটা দেখিস। এবার প্রভুর প্রচ্ছন্ন অবতার, তাঁর শক্তি প্রচ্ছন্নভাবেতেই বেশী খেলবে। সাজগোজে বড় অভিমান। গিরিশবাবুকে শিশিরবাবুকে দেখতো?' বলব কি ভাই, এইসব কথা স্মরণ হ'লে আর আমি এঁদের শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারি না।"

দিদির এইসব অকপট অথচ যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তটি আর কোন কথা বলিলেন না। প্রণাম করিয়া চালিয়া গেলেন। যাইবার সময় কাঁদ কাঁদ স্বরে কেবল বলিলেন—"দিদি! ছিটেফোঁটা দয়া ক'রে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিও।"

দিদির বাহিরে গমনাগমন

বঙ্গাব্দ ১৩১২ সাল ১২ই ফাল্গুন রবিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বড় বাবাজী মহাশয় আমাদের পার্থিব দৃষ্টির অন্তরালে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। নবদ্বীপের

বাগানবাড়ীতেই তাঁহার পূর্ণ সমাধি দেওয়া হয়। এইদিন হইতেই ঐ বাগানবাড়ীর নাম আর একটি বাড়িয়া যায়। সকলে উহাকে সমাজবাড়ী বলিতে থাকেন। বর্ত্তমানে ঐ সমাধির উপর বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের একটি অষ্টধাতুর প্রমাণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং নিত্য অতি পারিপাটিরূপে সেবা চলিতেছে। বলিতে কি, ইহাও আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদিরই অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি।

বড় বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের পর দ্বিতীয় দিনে ললিতাদিদি পুরী হইতে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। কয়েকদিন পূর্ব্বে পুরীধামে বড়বাবাজী মহাশয়ের সামান্য অসুস্থ-সংবাদ যায়। তখন সেখানকার সেবকবৃন্দ দিদির নির্দ্দেশমত ঝাঁজপিটায় নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তারপর কয়েকদিন আর কোন ভালমন্দ সংবাদ না পাইয়া দিদি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং নামযজ্ঞ বন্ধ করিয়া দিয়া কুঞ্জ দাদা, বিশ্বম্ভর দাদা, অপরাদাদা ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য গুরুদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপাভিমুখে রওনা হন। সে সময় কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ অসিতে হইলে কৃষ্ণনগর দিয়া আসিতে হইত। উঁহারা কৃষ্ণনগরে নামিয়া আসিতে আসিতে স্বরূপগঞ্জের নিকট আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, গতকল্য বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাধি হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ শ্রবণ করিয়া দিদি উন্মাদিনীর মত হা-হুতাশ করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সঙ্গীগণের প্রাণপন চেষ্টায় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "হায় কি হল" "হায় কি হল" বলিতে বলিতে নিজের মাথার বড় বড় চুলগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া মুঠা মুঠা করিয়া ফেলেতি লাগিলেন। গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায় সঙ্গীগণ কোন রকমে দিদিকে নৌকায় করিয়া নবদ্বীপে আনিয়া উপস্থিত করেন।

বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমাধিস্থনে যেভাবে দিদি আক্ষেপ করিয়া আছাড়ি পাছাড়ি করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারাই জানেন, ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। যাহা হউক চারদিনেরদিন যথারীতি মালসা-ভোগ দিয়া ১০।১২ দিন নবদ্বীপে থাকিয়া আবার পুরী চলিয়া যান। এবং সেখানকার মঠের সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রায় আড়াই মাস পরে পুনরায় নবদ্বীপে আগমন করেন।

এই যে দিদি বাগানবাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করেন, তদবধি নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া অপ্রকট কাল পর্য্যন্ত বাগানবাড়ী ত্যাগ করিয়া কোথায় যান নাই। বৎসরের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন দিদি বাগানবাড়ী হইতে বাহির হইতেন। চন্দনযাত্রা উপলক্ষে তিন দিন, গঙ্গাপূজা করিতে ১লা বৈশাখ একদিন বড় বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকট

তিথি উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব শেষে রাত্রে সঙ্কীর্ত্তনসহ গঙ্গাস্নানে একদিন। এইদিন গঙ্গার ঘাটে যে বিরাট ভোগ গঙ্গা দেবীকে নিবেদন করিয়া জলজন্তুগণের উদ্দেশ্যে তিনি সমর্পণ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই এক দর্শনীয় ব্যাপার। বহু লোক সে সময় এই উৎসব দর্শন করিবার জন্য গঙ্গাতীরে সমবেত হইতেন।

নানাবিধ পক্কান্না মিষ্টান্নাদি, বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ সাদা অন্নভোগ বড় থালায় করিয়া সাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। তথায় দিদি নিজে গঙ্গাজল তুলিয়া নিবেদন করিয়া দুইহাতে করিয়া জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিতেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই কোথা হইতে অসংখ্য ছোট বড় মৎস্য আসিয়া পরমানন্দে তাহা ভোজন করিত। দিদি কিছু সময় করজোড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভোজনলীলা দর্শন করিয়া স্নানান্তে আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেন। দিদির অপ্রকটের পর এখনও এই উৎসব আশ্রমের সেবকগণ যথা-নিয়মে করিয়া থাকেন, তবে তদ্রূপ বিরাট আকারে অনুষ্ঠিত হয় না।

চন্দনযাত্রা উৎসব

একবার চন্দনযাত্রায় কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই দিদির শরীর খুব অসুস্থবোধ হইতেছিল। চন্দনযাত্রা আরম্ভের দিন সকাল হইতেই খুব ভেদবমী আরম্ভ হইল। চরণামৃত ছাড়া কোন ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ গ্রহণ করিতে দিদি বরাবরই নারাজ। এবার নবদ্বীপের আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং দিদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া মঠের সেবকগণ ডাক্তারবাবুকে ডাকিলেন। যথাসময়ে আসিয়া ডাক্তারবাবু দিদিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এ সময় নবদ্বীপে এইভাবের কলেরা বেশ দেখা যাচ্ছে আজ সপ্তাহ দুই মধ্যে প্রায় ত্রিশজন এই রোগে মারা গিয়েছে আপনারা খুবই সাবধানে এঁকে রাখবেন, নিয়মিতভাবে ঔষধ খাইয়ে পুনরায় বৈকালে আমাকে সংবাদ দিবেন।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভক্তগণ হতাশপ্রাণে দিদির সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া শেষে শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুপাদকে দিয়া অনুরোধ করাইয়া মাত্র দুইবার সময়মত ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন নাই। পূর্ব্বের মতই ঘন ঘন ভেদবমী হইতেছে, সকলেই সন্ত্রস্ত।

এই অবস্থার মধ্যেই দিদি নন্দদাদাকে ডাকিয়া যথাসময়ে ঠাকুর লইয়া চন্দনযাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। ভক্তগণও পূর্ব্ব ব্যবস্থামত কীর্ত্তন সহযোগে চতুর্দ্দোলায় করিয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোরকে লইয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ আয়োজন

করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু কাহারও মনে সুখ নাই। দিদি কীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে যাইতেন, তাঁহার স্নেহপ্রীতির টানে সকলে যাইত। আজ দিদিই রোগশয্যায় শুইয়া আছেন। ইঁহারা আর কি করিয়া কার সঙ্গে আনন্দ করিতে যাইবেন? কিন্তু উপায় নাই, দিদি আদেশ করিয়াছেন, কাজেই যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সকলে মিলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পত্র-পুষ্প-স্তবকে সুসজ্জিত চর্তুদ্দোলায় উপর সিংহাসনে যুগলকিশোরকে বসাইয়া চারিজনে বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। দিদি সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রার উদ্দেশ্যে দুটি হাত অতি কষ্টে কপালে ছোঁয়াইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

সেবকগণ সময়োচিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত। দিদির চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দেহে অসম্ভব কম্প দেখা যাইতেছে নন্দদাদা কাঁদিতে কাঁদিতে দিদিকে ডাকিলেন, ঠিক এই সময় একজন সেবক ঔষধ দিতে গেলে দিদি একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন—"তোরা কি আমাকে সেবা-সুখেও বঞ্চিত ক'রে রাখতে চাস্? কেন ওসব ছাই-ভস্ম আমায় দিচ্ছিস্? (ইঙ্গিতে বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাজঘর দেখাইয়া) ওখান থেকে একটু চরণামৃত এনে আমার মুখে দে।"

সেবক ছুটিল বড় বাবাজী মহাশয়ের ঘরে। সেখান হইতে চরণামৃত আনিয়া দিদিকে খাইয়াইয়া দিলে দিদি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে সংবাদ আসিল ঠাকুর বড়াল-ঘাটে আসিয়াছেন। আর যায় কোথা! দিদি ২।৪ জন সেবককে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে বড়াল-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সকলেই সন্ত্রস্ত। দিদির দুর্ব্বল শরীর, এইভাবে চলিয়াছেন, কখন কি হয় এই চিন্তাই সকলের মনে জাগিতেছেন। কিন্তু না জানি কাহার শক্তি সকলকার অলক্ষ্যে তাঁহার দেহে সঞ্চারিত হইয়া আজ তাঁহার প্রাণ বল্লভের লীলা-রসাস্বাদনে তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছে। দিদির কোনদিকে লক্ষ্য নাই, মৃদুমৃদ্যুস্বরে "জয়গুরু জয়গুরু" বলিতে বলিতে একমনে চলিয়াছেন।

যথাসময়ে ঘাটে উপস্থিত হইয়া অন্যান্যবারের ন্যায় নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। তাহাদের মুখে ঘন ঘন হরিধ্বনি, মধ্যে মধ্যে মহিলাগণের উলুধ্বনি গঙ্গার ঘাটের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। একদল যুবক এক একবার 'বড় বাবাজী মহারাজ কি জয়' 'ললিতা মাই কি জয়' ধ্বনি দিতেছে। আমরা যে কয়জন কিছু পূর্ব্বেও রুগ্না ললিতা দিদির শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, সকলে একধারে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিতভাবে দিদির

লীলাখেলা দেখিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে ঠাকুর শ্রীমন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলে দিদি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ও রজে গড়াগাড়ি দিয়া নিজের ঘরের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। এখন দিদিকে দেখিয়া কে বলিবে যে, ইনিই কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীচরণ-চিহ্ন

একদিন অপরাহ্নে কয়েকজন ভক্তসঙ্গে দিদির ঘরের সম্মুখস্ত বারান্দায় ব্রজলীলা আলোচনা হইতেছিল। সম্মুখে একখানি মোটা গদী-আসন পাতা ছিল। কাহার জন্য সে আসন পাতা হইয়াছিল, তাহা অপর কেহ জানেন না, দিদিই জানেন। আসনখানির উপরের কাপড়টি গাঢ় কালো রংয়ের ছিল।

প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ অবিরাম গতিতে বন্যার স্রোতের ন্যায় আসিয়া বক্তা ও স্রোতা সকলকেই ভাবসাগরে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। বিশেষ কার্য্যে দিদিকে কয়েক মিনিটের জন্য উঠিয়া যাইতে হইল। কিন্তু প্রসঙ্গ বন্ধ হইল না। ভক্তগণ তখনও নিজেদের মধ্যে যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছেন। সকলেই লালী-রসাস্বাদনে ডগমগ। দিদি ফিরিয়া আসিবেন এবং পুনরায় লীলারস বিতরণ করিবেন; সেই পতীক্ষায় আমরাও বসিয়া আছি।

যথাসময় দিদি আসিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। বসিয়াই সম্মুখস্থ আসনখানির দিকে চাহিয়া দেখেন কালো কাপড়ের উপর ছোট ছোট কয়েকটি ধূলামাখা পদচিহ্ন। দিদি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন এবং ভক্তগণকেও দেখাইলেন কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ পদচিহ্ন কোথা হইতে কিভাবে আসিল! আসন পাতিবার পর এত ছোট পদবিশিষ্ট কোন বালক-বালিকা তো এখানে আসে নাই! সকলেই পদচিহ্ন দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা অতি সন্তর্পণে দর্শনার্থীকে দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে হাত লাগিলে দাগগুলি লপ্ত হইয়া যায়, সেইজন্য কাহাকেও ঐ চরণচিহ্নে হস্ত দিতে দিতেছেন না।

এদিকে দিদি অন্তরঙ্গ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করিতেছেন—ব্যাপার কি? এক ভক্ত আর এক ভক্তকে বলিলেন—ঠাকুর নিজে বলিয়াছেন "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"। এখানকার লীলাপ্রসঙ্গ শুনিতে তিনি আসিয়াছিলেন নাকি? অন্যভক্ত উত্তরে বলিলেন—"তা ললিতাদিদি যেভাবে ব্রজলীলা আলোচনা করছিলেন, তাতে তাঁর উপস্থিতি আশ্চর্য্য নয়।"

১ম ভক্ত আপনারা যে যা-ই বলুন না কেন, আমার মনে দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, এ নিশ্চয়ই আপনাদের বাঁকা ব্রজবিহারীর রঙ্গ।

এইভাবের নানাপ্রকার অলোচনা চলিতে লাগিল। শেষে আসনের উপরের কালো কাপড়খানি অতি সন্তর্পণে কাটিয়া লইয়া একখানি ছবির ফ্রেমে কাঁচ দিয়া বাঁধাইয়া রাখা হইল।

বহুদিন পর্য্যন্ত পদচিহ্নগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত। অনেক দূরদেশাগত ভক্ত বাগানবাড়ীতে আসিয়া দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। দিদির ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় যেখানে বসিয়া লীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা হইতেছিল, সেইখানেই দরজার উপরে ঐ বাঁধান ফ্রেমটি টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল। এখন যদিও পদচিহ্নগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু সেইখানে সেইভাবে ফ্রেমটি টাঙান রহিয়াছে এবং সে অত্যাশ্চর্য্য পদচিহ্ন প্রকাশ-লীলার সাক্ষ্য দিতেছে।

বালকবেশে আদেশ

সাধন-জগতে সাধক যত অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার নির্জ্জনতা ভাল লাগে। ভজন-রস আস্বাদনে বাধা দেয় জনকেলোহল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন—"সাধন করবে মনে, বনে আর কোণে।"

নবদ্বীপে গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সাধন-মহিমা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু, দর্শনার্থীর আগমন হইতেছে। নিজেকে আবরণ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই জনসমাগম কমিতেছে না। শেষে তিনি এক ফিকির করিলেন লোক-সংঘট্ট হইতে আপনাকে দূরে রাখিবার জন্য। গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সমাজবাড়ীর ঝাউতলার নিকটস্থ একটি ভগ্ন শৌচাগারের মধ্যে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

বড় বাবাজী মহাশয়ের অদর্শনে সকলকেই অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখিয়া একদিন তিনি দিদিকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তোরা কখনও মনে করিস না যে, সে (বড় বাবাজী মহাশয়) অপ্রকট হ'য়ে তোদের ছেড়ে কোথাও চলে গেছে। তোদের দৃষ্টির বাইরে আছে মাত্র। ইচ্ছে করলেই তাকে দেখতে পাবি। আমরা এখনও দেখি, কত কথা বলি।"

দিদি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন আবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাজ দেখাইয়া বলিলেন—"এইখানেই সে সর্ব্বদা থাকে এবং থাকবেও। বৃথা হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি ? দেখবার ইচ্ছা প্রবল হ'লেই তাঁকে দেখতে পাবিরে দেখতে পাবি।" দিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের

সমাজ প্রদক্ষিণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

বাগানবাড়ী যখন বড় বাবাজী মহাশয়ের হাতে আসে তখন উহার মধ্যে একটি স্থানে খুব বড় একটি বাঁধান তুলসীমঞ্চ ছিল। কি জানি কি উদ্দেশ্যে বড় বাবাজী মহাশয় এটি দেখাইয়া নিজ সঙ্গীদের একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার স্থান এইখানে।" লীলাময়ের লীলাভঙ্গী বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই, আমরা শুধু যতটুকু কৃপা করিয়া দেখাইতেছেন, ততটুকু দেখিয়াই জীবন ধন্য করিতেছি। সেদিন বড় বাবাজী মহাশয় সঙ্গীদের যে স্থানটি দেখাইয়াছিলেন ভবিষ্যতে সেই স্থানেই বড় বাবাজী মহাশয়ের পূর্ণ সমাধি দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে তাহার উপরেই মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে।

বড় বাবাজী মহাশয়ের সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ সময়ে একটি সুন্দর বালক মঠে উপস্থিত হইয়া দিদিকে বলিয়াছিলেন—"তোরা যে দেখছি গুরুর সমাজ-মন্দির তৈরী নিয়েই মেতে আছিস, পরম গুরু কি কেউ নয়? তাঁর সমাজ যে ধূলোবালিতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।"

বালকটি মাত্র এই কথা কয়টি বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দিদি দেখিলেন কথাও শুনিলেন, আর যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও দেখিলেন এবং কথা শুনিলেন কিন্তু কর্ম্মব্যস্ততায় কেমন যেন তন্ময় হইয়া কেহই পরিচয় লইলেন না। বালকটি অদর্শন হইলে তখন সকলের চৈতন্য হইল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আর তাহার কোনরূপে সন্ধান মিলল না।

এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন—বড় বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটের মাত্র দুই দিন পরেই তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ গৌরহরি দাস মহান্ত মহারাজ অপ্রকট হন। বড় বাবাজী মহারাজের সমাজের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের জমিতেই ইঁহার সমাধিস্থান। ললিতা দিদি পূর্ব্বোক্ত বালকটির কথা ঠাকুরেরই প্রত্যাদেশ স্বরূপে মানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই পরমগুরুদেবের সমাজ-মন্দির প্রথমে নির্ম্মাণ করাইয়া পরে শ্রীগুরুদেবের সমাজ-মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

বাগানবাড়ী প্রাপ্তি ও নিতাই-গৌরের আগমন

নবদ্বীপবাসী প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদাস দাস (কাঁসারী) মহাশয়ের পৌত্র মহীতোষ দাস মহাশয় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অর্থের প্রয়োজন বশতঃ বাগানবাড়ীটি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করায় ৫০০৲ টাকা অগ্রিম বায়না দেওয়া হয়। শেষে দলিল লিখিয়া ৩০০০৲ টাকায় বিক্রয় কোবলা করিয়া দিবার সময় মহীতোষবাবু ঐ ৫০০৲ টাকা ফেরত দিতে চাহিলে দিদি বলিয়াছিলেন, "দাদা! ও পাঁচ শত টাকা তো

মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের জন্য দেওয়া হইয়াছে, উহা আর ফেরৎ দিতে হইবে না।" তাহা ছাড়া বড় বড় তিনটি ঝাউগাছের দরুন আরও তিন শত টাকা দেওয়া হইল।

এই ব্যাপারে শুধু মহীতোষ বাবু নহেন, যাঁহারা বাগানবাড়ী যাহাতে বাবাজী মহাশয়ের হাতে না যায় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন কি বাগানের মূল্য বাড়াইয়া মালিকের মন ভাঙ্গাইতেও যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বিস্মিত হইয়া গেলেন। অনেকে প্রকাশ্যেই বলিতে লাগিলেন যে, "এ বাবাজীরা সাধারণ বাবাজী নয়, এদের প্রাণ খুব উচ্চ ধরণের, এরা মঠের খুব উন্নতি করবে" ইত্যাদি।

বাংলা ১৩১২ সালের বসন্ত পঞ্চমী দিনে বড় বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের ভোগরাগ্যাদি দিয়া বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করেন। তারপর নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে কীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া কলিকাতা রওনা হইয়া যান এবং ভাগ্যবান মাণিকলাল মল্লিক মহাশয়কে বাগানবাড়ী খরিদ সম্বন্ধে অর্থাদি দেওয়া ও দলিলাদি করিবার নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রথম বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় যে সকল প্রভু-সন্তান, আচার্য্যসন্তান ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণের বিশেষ সাহায্য ও সহানভূতি পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবাস অঙ্গনের প্রভুপাদ শ্রীপ্রতাপচাঁদ গোস্বামী, হরিদাস মহান্ত, ভাগবতদাস মহান্ত, তারাপ্রসন্ন বাগচী, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস রায়, সত্যনাথ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পরে বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, রাণাঘাটের সৌরীন্দ্র মোহন দে চৌধুরী, সদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তের সহিত দিদির পরিচয় হয়। সকলের নাম প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার।

একদিন বৃদ্ধ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে দিদির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দিদি শ্রীগুরুদেবের ও পরম গুরুদেবের সমাজ-মন্দির নির্মাণ কার্য্যে রাজমিস্ত্রীর সহিত কি কথা বলিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়া ফিরিয়া করযোড়ে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—"দেখ ললিতা। আজ থেকে বার বৎসর পরে দুটি ব্রাহ্মণ-সন্তান অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার এখানে আসবেন, তাঁহাদের যত্ন ক'রে রেখো, মঙ্গল হবে।'

বলা বাহুল্য, ঠিক বার বৎসর পরেই অযাচিত ভাবে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহযুগল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিদি যথাবিধি অভিষেকাদি করিয়া

শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষভাবে সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অদ্যাপিও সেই নিয়মে সেবা চলিতেছে।

চন্দনযাত্রার পদত্রয়

"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সর্ব্বত্র মাগি লবে ইষ্টভক্তি বর।।"

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর মহাশয়ের এই উক্তি দিদির জীবনে বহুভাবে বহু সময়ে বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়া আমরা সার্থক হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বশ্রম কাহিনীতে কিছু কিছু পরিচয় পাঠকগণ পাইয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পর পুরীধামে ঝাঁজপিটা মঠে এবং নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর সব দেবদেবীর পূজার্চ্চনাদির মধ্য দিয়া কিছু কিছু, ঘটনা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পরেও বলিবার ইচ্ছা রহিল। আজ আর এক প্রকার আস্বাদনের সংবাদ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

চন্দনযাত্রার সময় সুসজ্জিত চৌদোলায় ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকায় যাওয়া হয়। সেখানে সময়োচিত নৃত্য কীর্ত্তনাদি সহ নৌকা বিহারান্তে মঠে ফিরিবার সময় নবদ্বীপের 'পোড়ামা তলা' ঘুরিয়া আসা হয়। একবার ওখানে মায়ের মন্দির সম্মুখে চৌদোলা নামাইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতেছেন। কিছুসময় খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হওয়ার পর দিদি নিজে পদ ধরিলেন—

'যোগমায়া যোগেশ্বরী দেবী পৌর্ণমাসী।
তোর দ্বারেতে চাঁদের বাজার উঠে দেখ মা আসি।।
(সবার) হাতে চাঁদ পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে।
চৌদিকে চাঁদের মালা নাচে কুতূহলে।।
কি ছার গগন-চাঁদ এ চাঁদের আগে।
(তাই) দশনখে দশখণ্ড হৈয়া রহে অনুরাগে
যমুনায় নৃত্য রাস করি নৌকাপরি।
তুয়া দরশনে এলেন কিশোর কিশোরী।।
এই কর মা জগদম্বে! করুণা করিয়া।
সুখে থাকুক যুগল লীলা- রসেতে ডুবিয়া।।
আশীর্ব্বাদ কর মাগো! প্রণতি চরণে।
লয়ে যাই যুগল চাঁদে নিকুঞ্জ কাননে।।"

মায়ের নিকট এই পদ নানাপ্রকার আঁখর দিয়া দিদি সঙ্গীগণ-সঙ্গে বহু সময় কীর্ত্তন করিলেন। 'ললিতা সখী নিজে মায়ের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন' এই

সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল। যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেই ভাবেই কীর্ত্তন শ্রবণ এবং ললিতা মাকে দর্শন উভয় আকাঙ্ক্ষার টানে ছুটিয়া আসিলেন। দিদি মায়ের কাছে গান শেষ করিয়া ধীরে ধীরে মহাদেবের নিকট চলিলেন। সেখানেও কিছু সময় সঙ্গীগণের কীর্ত্তন হইবার পর দিদি পূর্ব্বের ন্যায় নিজে পদ ধরিলেন

"গোপগোপী হিতকারী দেব গোপেশ্বর।
(হের) তুয়া দরশনে এলেন কিশোরী কিশোর।।
তুমি দেব নিরঞ্জন অনাদির আদি।
(দে'খ) যুগল-রসাস্বাদে যেন কেহ না হয় বাদি।।
এ হেন করুণা কর দেব আশুতোষ।
(মোদের) গুরু গুরুজন যেন থাকয়ে সন্তোষ।।
করিয়ে প্রণতি আশিষ কর ত্রিপুরারী।
(মোরা) যুগলসহ কুঞ্জে যাই সব সহচরী।।'

এইভাবে যোগমায়া যোগেশ্বরী ও গোপেশ্বর দেবের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া যুগল লইয়া গমন করিতে করিতে গান ধরিলেন—

"নেচে নেচে যায় গো মোদের যুগল রাধাশ্যাম।
যুগল রাধাশ্যাম গো রূপ রসময় ধাম।।
আধ কনককাঁতি নব বিজুরী ভাঁতি
আর রসে ঢর ঢর নবঘন শ্যাম।
(আধগলে) বনফুল মালা বামে চূড়াটি হেলা
আধগলে গজমতি দোলে অবিরাম।।
কিয়ে কমলে ভ্রমর কিয়ে চাঁদেতে চকোর
চাতকিনী বিনোদিনী নবঘন শ্যাম।
কিয়ে জলদ কোলে নব বিজুরী খেলে
কত রস বরিখয়ে নয়ানে নয়ান।।
করে মোহন মুরলী রাই অঙ্গে পড়িছে ঢলি
অঙ্গে অঙ্গে হেলাহেলি যেন রতি-কাম।
যত সখী মঞ্জরী সবে যায় সারি সারি
মাঝে কিশোর কিশোরী অপরূপঠাম।।।
নাচে ময়ূর ময়ূরী গায় শুক আর শারী
ফুলে ফুলে ভ্রমরা ভ্রমরী করু গান।

(দোঁহার) বয়ানে বয়ান (দোঁহার) নয়ানে নয়ান
কুবলয় চাঁদ মিলল একঠাম।।
কিবা অপরূপ রূপ দুঁহু নবরস ভূপ
রসে তনু গর গর রসময় ধাম।।"

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন—কি জাতীয় ভজন, কি জাতীয় ভাব আর কি জাতীয় নিষ্ঠা সহকারে সর্ব্বত্র অকপট প্রাণে ইস্ট-সেবা প্রার্থনা। আজ আমরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত তো বটেই, নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যেও সামান্য ঘটনা লইয়া 'আমার মত ঠিক' 'আমার ঠাকুর বড়' 'আর সব ভুয়া' ইত্যাদি বলিয়া ঝগড়া মারামারি করিয়া মরিতেছি। হায়রে অদৃষ্ট!!

শারদীয়া পূজার আদেশ

স্বগণ-সঙ্গে ঝাঁজপিটা মঠে বড় বাবাজী মহাশয় বসিয়া পৌরাণিক প্রসঙ্গ করিতেছেন। বেলা প্রায় সাড়ে চারটা। হঠাৎ দুর্গাপুজার প্রসঙ্গ উঠিল। একজন ভক্ত বলিলেন—এই শারদীয়া পূজার প্রচলন কখন হয় এবং কে করেন?

বাবাজী—শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধের জন্য অকালে বোধন ক'রে দেবীকে জাগিয়ে এই পূজা করেছিলেন। তবে পূর্ব্বে যে মায়ের পূজার ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। বসন্তকালে বাসন্তী পূজা হইত, এখনও বহু স্থানে হয়। দুর্গার একটি নাম বাসন্তী। এই প্রসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে। মাকে অকালে আবাহনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র পুরোহিত নিয়োগ করতে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির আদেশ—অকালে মাকে সে-ই জাগাতে পারবে, যার একদিনের জন্যও মাতৃ আরাধনায় বাধা পড়ে নি। শেষে বৃহস্পতিই আদেশ করলেন যে, রাবণের নিকট যাও। তখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণের নিকট সমস্ত বিষয় জানালে রাবণ নিজ-নিধন কামনায় পূজার আয়োজন জেনেও সানন্দমনে পৌরোহিত্য স্বীকার ক'রে নিলেন। রাক্ষস হলেও শরণাগতের বাসনা পূরণে কার্পণ্য করতে পারলেন না। বাবা! মহৎ যে হয়, তাঁর সমস্ত কার্য্যই বিশেষ বিচারণীয়।

ভক্ত—বাবা! রাবণের কথা অন্য এক সময় শুনব, এখন এই পূজার কথা কিছু বলুন।

বাবাজী—এ পূজার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই যে এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

এই বলিয়া সংক্ষেপে সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটি বলিয়া শেষে ললিতা দিদিকে বলিলেন—"আগামীকাল শারদীয়া দুর্গাপূজার অধিবাস, তাই জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কাল হ'তে এই মঠে

জগদম্বার পূজা আরম্ভ হবে, তোমারা সব বন্দোবস্ত কর।”

ললিতা—কিভাবে কি আয়োজন করতে হবে, প্রতিমা কোথায় পাওয়া যাবে, পূজক-পুরোহিতই বা কাকে ঠিক করা হবে, সব ব'লে দিন?

বাবাজী—মায়ের চিত্রপট রেখে তাঁর সম্মুখে ঘট-স্থাপনা ক'রে যথাবিধি পূজা হবে। সকলেই মায়ের সন্তান, যাকে তিনি কৃপা ক'রে অঙ্গীকার করবেন সে-ই পূজা করবে। সেজন্য ভেবো না।

ললিতা—কি কি দ্রব্য প্রয়োজন?

বাবাজী—মায়ের পূজায় লাগবে অনুরাগ মাখানো প্রাণ, মন, আত্মত্যাগ, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির লোভ, আত্ম সুখ-বিবর্জ্জিত কাম অর্থাৎ প্রেম, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রভৃতি। আর এদিকের পূজায় চাই তুলসী, বিল্বপত্র, আম্রশাখা, ফুল, চন্দন, দুর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, পক্ককদলী, অন্যান্য ফল মিষ্টান্নাদি। মোট কথা কৃষ্ণপদে সেবা, ভক্তি, রতি, মতি কামনায় যতপ্রকার উপহার দিবার বাসনা থাকে ইচ্ছামত মাকে তা দিতে পার। এছাড়া অন্য কোন বিধি বিধান জানবার আবশ্যক মঠবাসী তোমাদের নেই। যারা ঐশ্বর্য্য গন্ধহীন রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবের উপাসক, তারা সবদেবদেবীকেই পূজা ক'রে তাঁদের কৃপা গ্রহণ করবে। মনে রেখ যোগমায়ার কৃপা ভিন্ন কোনমতেই অভীষ্ট লাভ হবে না। ব্রজগোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত ও গোপেশ্বর মহাদেবের পূজা ক'রে তবে কৃষ্ণকে পতিভাবে পেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কাত্যায়নী পূজার পর গোপীগণের সম্মিলিত প্রার্থনা---“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ।।”

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় পুনরায় ললিতাদিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ললিতা! যাও, তুমি সঙ্গীদের নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই সব সংগ্রহ হয়ে যাবে। যদিও যথেষ্ট সময় নেই, তবু মনে হয় নিতাইচাঁদ যখন প্রাণে ইচ্ছা জাগিয়েছেন, তখন তিনি বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না।”

ললিতাদিদি মঠবাসী সঙ্গীগণকে লইয়া যথাদেশ পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরদিন অধিবাস হইয়া যথানিয়মে তিনদিন পূজা হইল। বড় বাবাজী মহাশয় নিজেই মায়ের পূজা করিলেন। উদ্দেশ্য—স্নান, পূজা, ধ্যান, জপ প্রভৃতি যাবতীয় মন্ত্রেরই যে একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণ-ভক্তি বা কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি, তাহাই সকলকে দেখাইয়া দেওয়া।

সেইদিন পূজা উপলক্ষে একটি বিশেষ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন—সর্ব্বাগ্রে শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া ভোগের সমস্ত উপচার তাঁহাকে নিবেদন করিয়া

দিয়া সেই প্রসাদ দেবীকে সমর্পণ করা। বলা বাহুল্য, অদ্যাবধি বাবাজী মহাশয়ের গণের মধ্যে ঐ নিয়মেই পূজা হইয়া থাকে। ললিতাদিদিও নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে বড় বাবাজী মহাশয়ের নিয়মসকল অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপুজার যে পদ্ধতি আছে, মূলতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া কেবল উহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কামনা-সূচক মন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তে আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ বর্ণিত কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তি প্রার্থনাময়ী মন্ত্রগুলি সংযোজিত করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় ব্রজকুমারীগণের কৃষ্ণানুরাগ পরিপাটিময় পূজার ধারা ধরিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, পরে দিদি এই সকল মন্ত্রাদি যথাযথভাবে সাজাইয়া পূজা পদ্ধতি লিখিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলোচনা কালে দিদি একথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ যথাস্থানে তাহা লক্ষ্য করিবেন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে।

রাজর্ষি বনমালী রায়কে কৃপা

শ্রীবৃন্দাবনবাসী রাজর্ষি বনমালী রায় একবার সস্ত্রীক মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া রথযাত্রার সময় পুরীতে গিয়াছিলেন। সঙ্গীগণের ইচ্ছা সমুদ্রের ধারে একটা ভাল বাড়ীতে থাকেন। তাঁহারা রাজর্ষির মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদার কোনরূপে হানি না হয় সেইভাবে যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করিয়াও উপযুক্ত বাড়ী পাইলেন না। অবশেষে ঝাঁজপিটায় আসিয়া বড় বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদিগকে নিজের ঘরে থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে বলায় ললিতাদিদি বলিলেন—"এ ঘর খুব ছোট এবং এ ঘরে ভালরূপে আলো বাতাস পাওয়া যাবে না, এখানে কি আপনাদের মত লোকের থাকবার সুবিধা হবে?

বনমালীবাবু—দিদি! আমি যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি তাদের কি মনোভাব জানি না, কিন্তু আমার কথা—আমি শুধু, জগন্নাথ দর্শন বা নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতির বাসনা নিয়েই আসিনি। আমার প্রাণের একান্ত বাসনা—যে কয়দিন প্রভু এখানে রাখেন সেই কয়দিন আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া বাবাজী মহাশয়ের মধুময় সঙ্গসুখ ভোগ করি। ভাল দোতলা তেতলা ঘরে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের কষ্ট না হয়। এইভাবে আপনাদের একজন সঙ্গী মনে ক'রে আমাকে আপনাদের কাছে রাখলে আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করব।

বড় বাবাজী মহাশয় রাজর্ষি'র কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ললিতা দিদিকে ঘর পরিষ্কার করিয়া দিতে বলায় তিনি অতি সত্বর যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজর্ষিকে ঘরে বসাইয়া বাবাজী মহাশয়কে চুপি চুপি বলিলেন—"বনমালী বাবুর শরীর ভাল নয়। ইঁহার আহারাদির জন্য কি স্বতন্ত্র কোনরূপে ব্যবস্থা হবে?"

বাবাজী - দেখ ললিতা! ইনি যদি মঠের বাইরে কোথাও থাকতেন, তাহ'লে তুমি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে। যখন ইনি তোমাদের মত মঠবাসী হ'লেন বিশেষতঃ নিজ সঙ্গীগণকেও কাছে রাখলেন না, তখন বুঝতে হবে ইনি কোনরূপে স্বতন্ত্রতা চান না। তাই বলি ঠাকুরের যখন যেরূপ ভোগ হবে তাই বৈষ্ণব সেবা অন্তে ওঁকে দিবে। তাই হবে ওঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ্য।

বনমালীবাবুকে বলিলেন "যখন যাহা প্রয়োজন হবে স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা না ক'রে সরল প্রাণে নিতাইচাঁদের সংসারের সেবক-সেবিকাদের জানালেই সুখী হব।"

বনমালীবাবু—আমার জন্য আপনারা কোনরূপ ব্যস্ত হবেন না, আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেয়েই নিজেকে বেশ সুস্থ বোধ করছি। কৃপা ক'রে বৈষ্ণব-অধরামৃত দানে কৃতার্থ করবেন। আমি সরলভাবেই বলছি, আমার জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হবেনা, বরং করলে দুঃখই পাব।

যে কয়দিন বনমালীবাবু, মঠে ছিলেন পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে কাটাইয়া ভিক্ষান্নে পরমপরিতোষ পূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "জীবনে এমন সুযোগ এত আনন্দ কখনও পাই নাই, আর মিলিবে কিনা শ্রীরাধাবিনোদই জানেন।"

লীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা ও নিত্যানন্দ রামদাস

বড় বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই ললিতাদিদি, বৃন্দাদিদি ও কুসুমদিদি প্রভৃতির উপর রাতে রূপ, অভিসার ও মিলনলীলা কীর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। লীলা নিত্য, এই ভাবপুষ্টির জন্য কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তির বেশাদি পরিবর্ত্তন দ্বারা লীলাসকল প্রকটরূপে প্রদর্শিত হয়। কোনও বিশেষ নৈমিত্তিক লীলা কোনদিন থাকিলে সেইদিন তদনুযায়ী শ্রীমূর্ত্তির বেশ রচনা করিয়া ঐ লীলানুযায়ী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

মহারাসলীলা আস্বাদন জন্য মন্দিরের সম্মুখে একখানি খড়ের বড় ঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং শোলা-দ্বারা ষোলটি সখী, ষোলটি কৃষ্ণ ও শ্রীমতীর মূর্ত্তি

প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আশ্রমস্থ সখীবেশধারী সেবিকাগণকে নানারূপ লীলা-গান এবং নানাবিধ নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষার আদেশ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক সখীকেই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রশিক্ষা করিতে বলায় ললিতাদিদি একদিন বলিয়াছিলেন, "একজনে আর কয়টা যন্ত্র ব্যবহার করবে?"

বাবাজী—ব্যবহার নয় ললিতা! সকলের সব যন্ত্র অভ্যাসের উদ্দেশ্য হ'ল, কোনও একজনের অভাবে লীলাভিনয়ে কোনরূপ অঙ্গহানি হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

ললিতা—এতগুলি যন্ত্র একজনের পক্ষে শিক্ষা করা কি সম্ভব? তবে আপনার কৃপা হ'লে সবই হতে পারে।

বাবাজী—এক একটি বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ পূর্ব্বক লীলাগত হয়ে স্বীয় যুথেশ্বরীর নিকট অকপট প্রার্থনা করলে অসম্ভব কার্যও যে অতি অনায়াসে সম্পন্ন হতে পারে, এ বিশ্বাস রাখ কি ? একমাত্র কৃপা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করলে কার্য্য সিদ্ধি তো হবেই না, উপরন্তু স্বতন্ত্রতা দোষে দুষিত হবে। ললিতা! জেনে রাখ, প্রাণে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আনুগত্য না এলে প্রাপ্তি তো দূরের কথা লীলা-স্ফুর্ত্তিই হবে না। এখানে হয়ত বলবে, লীলা তো নিত্য, তবে কেন দর্শন হবে না ? লীলা নিত্যই প্রকট বটে কিন্তু দর্শন সকলের সব সময় হয় না। ভাগ্যবান জনই শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কখন কখন দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হন। প্রাচীন পদকর্তা বলেছেন—"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল। সেই দেখে যার আঁখি হয় নিরমল।" জন্ম-জন্মার্জ্জিত তমসাঘন তিমিরে অন্ধ-আঁখি করুণাময় শ্রীগুরুদের কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন লেপনে পরিস্ফুট করিয়া দিলে তবেই লীলাদর্শন ভাগ্যে ঘটে। বড়বাবাজী মহাশয় তাঁহার আশ্রিত জনকে বিশেষতঃ ললিতাদিদি, রাধাবিনোদিনী দিদি ও কুসুমমঞ্জরী দিদির উপর এক এক সময় এমনই কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন যে, উঁহারা একেবারে বাহ্যস্মৃতি ভুলিয়া লীলা-সমুদ্রে ডুবিয়া দিনের পর দিন বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। বহু চেষ্টা দ্বারা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

একবার প্রভুপাদ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামী মহোদয়ের কলিকাতা বেনেটোলার বাড়ীতে খুব সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল; বড়বাবাজী মহাশয় রামদাদা ও অন্যান্য সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ললিতাদিদি, বিনোদিনী দিদি কুসুমমঞ্জরী দিদিও ইঁহাদের সঙ্গে আছেন। কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ হইতেছে। কি কীর্ত্তনীয়া, কি শ্রোতা সকলেই যেন কোন এক অপ্রাকৃত আনন্দ সাগরে হাবুডুবু, খাইতেছেন।

গোস্বামী প্রভু বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, তুমি আমার বড়দিদি। তুমি

দাসী আমিও দাসী। তুমি রতিমঞ্জুরীর দাসী আর আমি অনঙ্গমঞ্জীর দাসী। এই বলিয়াই বড়বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নানাপ্রকার ভঙ্গীসহকারে নাড়িয়া নাড়িয়া গান ধরিলেন—

"নবদ্বীপ নাগরী আগরী গোরা রসে। কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাসে।।
ভাবভরে ভাবিনী পুলেক ভরে ভোরা। শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা।।
গোরা রূপ গুণ অবতংস পরে কানে। দিবানিশি গোরা বিনা আন নাহি জানে।।
গোরচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়। যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায়।।
গোরচনা হরিদ্রার পুতুলি করিয়া। পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণ ফুল দিয়া।।
প্রেমনেত্রে প্রেমজল বহে অবিরল। তার অভিসিঞ্চে গোরার চরণ যুগল
পীরিতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল। পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল।।
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরত্রিক। কঙ্কন শব্দ ঘণ্টা আনন্দ অধিক।।
অঙ্গ গন্ধ ধূপ ধুনা বহে অনুরাগে। পূজা করি দরশ পরশ রস মাগে।।
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। "লোচন" বলে এতদিন জ্ঞান-শেল গেল।।"

কখন বড়বাবাজী মহাশয় এক একটি অক্ষর দিতেছেন আর গোস্বামী প্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে উভয়ে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া ললিতাদিদিকে বলিলেন—"তোমরা অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? নৃত্য কর।" রামদাদাকে বলিলেন—"তুমি কীর্ত্তন ধর।"

প্রথমে ইঁহারা একটু লজ্জা লজ্জা ভাব দেখাইলেন, কিন্তু রামদাদার কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব" অক্ষর শুনিয়া আবেশভরে আত্মবিস্মৃত হইয়া বহু সময় নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইল, সকলে প্রভুপাদের চরণে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুপাদ ইঁহাদের চিবুকে ধরিয়া আব্দার করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, একদিন আমিও তোদের মত ঘাগরা কাঁচুলী প'রে এই মত নৃত্য করতাম, আমাকে দেখে তোদের এত লজ্জা কিসের? আয়, আমার সামনে বসে সকলে একসঙ্গে প্রসাদ পাবি আয়।"

এইখানেই রামদাদাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় রামদাদা বলিয়াছিলেন—রামদাস। প্রভুপাদ শুনিয়াই বলিলেন—"এতদিন শুধু রামদাস ছিলে, আজ থেকে 'নিত্যানন্দ রামদাস' নাম হল।" বড়বাবাজী মহাশয় প্রভুপাদের কথা শুনিয়া "জয় নিত্যানন্দরাম' 'জয় নিত্যানন্দরাম' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। পরস্পরের মধ্যে চোখের ভঙ্গী দ্বারা না জানি কত কথাই হইল। শেষে উভয়ে উভয়ের নিকট দৈন্য-নিবেদন দ্বারা বিদায় লইয়া যথা নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।

ফণীদাদার নবজীবন লাভ

ললিতাদিদির পরদুঃখকাতরতার বহু ঘটনা 'চরিত-সুধায়' বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকালের বহু ঘটনা দিদি প্রকাশ করিতে দেন নাই। কেহ প্রকাশের আগ্রহ করিলে বলিতেন—"যাকে উপলক্ষ্য করে ঘটনা ঘটে, তার উপর প্রভুর অপার করুণা জানবে। সেই করুণা স্মরণ ক'রে কৃতার্থ হও। করুণাময়ের কথা ভুলে, করুণার কর্ত্তাকে ছেড়ে বাজে ডালপালা নিয়ে এত মাতামাতির প্রবৃত্তি কেন?" মোট কথা তিনি যাহা কিছু ঘটে, তাহা শ্রীরাধারমণেরই লীলা বলিয়া গ্রহণ করেন। এমন বহু ঘটনা পুরীতে, নবদ্বীপে কিংবা বাংলার বাহিরে অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। সকল স্থানেই সকল ঘটনার প্রধান অংশ দিদির কর্ম্মের সহিত জড়িত, তথাপি তিনি তাঁহার নিজের কথা বলিতে নারাজ ছিলেন। অন্য কেহ বলিতে গেলেও বাধা দিতেন। এই জন্যই 'চরিত-সুধায়' আমাদের জানা অনেক ঘটনাই স্থান পায় নাই, কারণ তাহার প্রধান অংশ দিদির কার্য্যের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল।

পুরীর একটা ঘটনা শুনুন—কিভাবে দিদি তাহার প্রধান অংশ নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া সবই শ্রীরাধারমণের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আস্বাদন করুন।

সেবার পুরীতে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। শান্তির জন্য নানাস্থানে নানাপ্রকার পূজা, পাঠ, যাগযজ্ঞ, মন্ত্র পুরশ্চরণাদি করা হয়; কিন্তু শান্তি না হইয়া রোগ মহামারীরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অন্যান্য অনেকে দল বাঁধিয়া নগর-কীর্ত্তন বাহির করিয়াছেন; কিন্তু কি জানি কেন বড়বাবাজী মহাশয় তখন পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন বাহির করেন নাই।

একদিন জগমোহনে বড়বাবাজী মহাশয় স্বগণসঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন এমন সময় শ্রীজগন্নাথের কণ্ঠ মালাটি খসিয়া পড়িল। পশুপালক পাণ্ডা মালাটি আনিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের গলায় দিয়া বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ হইল, আপনাকে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করিতেই হইবে। সেদিন জগমোহনে কীর্ত্তন করিয়া সেই কীর্ত্তন লইয়াই পশ্চিম দরজা দিয়া বাহির হইয়া মার্কণ্ডেয়সাহি দিয়া বড়বাবাজী মহাশয় ঝাঁপজিটায় অসিলেন।

পরদিন সকলে সমবেত হইলে বড়বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আজ নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় সংকীর্ত্তন মহাসমর উপস্থিত, কেউ যেন এ সমরে যোগদান করতে পরাঙ্মুখ না হয়। আজ এই সংকীর্ত্তনমণ্ডলী হ'তে যে আলাদা হবে তার জন্য নিতাইচাঁদ দায়ী নন।" এই বলিয়া কীর্ত্তন লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন।

সঙ্গীগণ সকলেই প্রাণের আবেগে কীর্ত্তন করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে বড় বাবাজী মহাশয় মত্তসিংহ ন্যায় 'জয় নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার দিতেছেন। সে গম্ভীর হুঙ্কার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কাঁপিয়ে উঠিতেছেন। এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন সম্প্রদায় সহ বড় বাড়বাবাজী মহাশয় এমনভাবে পথে যাইতেছেন যেন কোনও পলাতক অপরাধীর অনুসন্ধান চলিতেছে।

ফণীদাদার আজ যে কি দুর্দ্দৈব জুটিয়াছে জানি না, তিনি কিছু সময় পরে ধীরে ধীরে সংকীর্ত্তনের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। এদিকে সাতসাহি ঘুরিয়া শ্রীরাধাকান্ত দেবের সম্মুখে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ আসিল যে, ফণীর দাস্তবমী হইতেছে, পেটে অসহ্য বেদনা, ক্রমে ক্রমে চলৎশক্তি রহিত হইয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ছটফট করিতেছে।

বড়বাবাজী মহাশয় উন্মুক্ত গাত্রে মঠের একধারে বসিয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন। এমন সময় ললিতাদিদি ছুটিয়া আসিয়া ফণীদাদার শোচনীয় অবস্থার কথা বলিলেন। বাবাজী মহাশয় ধীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী ছেড়ে পৃথক হওয়াতে ওর ঐরূপ হয়েছে, নিতাইচাঁদের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে কখনই বিপদ হ'ত না। তার উপর আবার ও আউলিয়া মঠে গিয়ে লোভবশতঃ কতকগুলি খিচুড়ি খেয়েছে। সেগুলি অপ্রসাদী ছিল।"

ললিতা—একে বালক, তাতে রোগী, এখন তাকে বলাও যা কাঠের পুতুলকে বলাও তাই। যা হবার হয়েছে, এখন একবার আপনি চলুন।

বাবাজী—আমি গিয়ে করব! তোমরা পাঁচজন তার বান্ধব আছ, যা করবার হয় কর।

ললিতাদিদি ছাড়িলেন না, অনেক করিয়া বুঝাইয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে ফণীদাদার ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি কিছু সময় তাহাকে বিশেষভাবে দেখিয়া বলিলেন—"অবস্থা খুবই শোচনীয়, জীবনের আশা কম; তবে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী সেবা ক'রে কর্ত্তব্য পালন কর।" এই বলিয়াই গম্ভীর মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিদি ছাড়িবার পাত্র নন, তিনিও তাঁহার পিছু পিছু যাইয়া বড়বাবাজী মহাশয়ের কাছে বসিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য, এই জল-জ্যান্ত ছেলেটা মারা যাবে আর আপনি তার কোন প্রতিবিধান করবেন না? তবে যে আপনারা এত নামের বড়াই করেন তা কে বিশ্বাস করবে?"

দিদির কথাগুলি যেন কেমন ভাববিহ্বলাবিষ্ট ব্যক্তির মত শুনা যাইতেছে।

এবং বাবাজী মহাশয়ের উপর যেন দাবী করিতেছেন উহাকে ভাল করিয়া দিবার জন্য। বাবাজী মহাশয় দিদির কথা শুনিয়া বলিলেন—"জীব নিজ নিজ কর্ম্মদোষে কষ্ট পায়, সেজন্য ভগবানের উপর দোষারোপ করা উচিত নয়।"

ললিতা—আমি ভগবানের দোষ দিইনি, দোষ দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা ইচ্ছা করলেই জীবনের এইসব দুর্দ্দৈব খণ্ডন ক'রে দিয়ে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারেন। আপনাদের অবহেলাতেই জীব ঐরূপ বিপদে পড়ে হাবুডুবু খায়।

দিদির ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া বড়বাবাজী মহাশয় অন্তরে আনন্দিত হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া আরও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা প্রকাশ মানসে একটু যেন ক্রুদ্ধ ভাবেই বলিলেন—" তবে কি তোমার মতে এইরূপ সামান্য সামান্য রোগ ভাল করবার জন্য বা মামলায় জয়লাভের জন্য অথবা লোকের কাছে সাধু বলে বাহবা পাবার জন্য নামের কাছে প্রার্থনা করতে হবে? আর প্রার্থনানুযায়ী কাজ না হলেই তোমার মতে নামের কোন শক্তি নেই বলতে হবে। ললিতা! এরূপ ধারণা বড়ই হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক।"

ললিতা—না, আমি তো নামের উপর কিছু বলিনি। আমি বলছি আপনাদের ইচ্ছার কথা। আপনারা এদের একটু মঙ্গল ইচ্ছা করলেই ভগবান সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে বাধ্য হবেন।

এদিকে ফণীদাদার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চালিয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ হিম, লোক চিনিতে পারিতেছে না, শরীরের রঙ নীলবর্ণ হইয়া কণ্ঠস্বরও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দিদির নিকট সংবাদ আসিলে দিদি পুনরায় বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন। এবার বড়বাবাজী মহাশয় একটু নরম সুরে বলিলেন—"একবার বাবাকে বল।" (আমাদের বলিতে ভুল হইয়াছে। বড়বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু গৌরহরিদাস মহান্ত মহারাজ এই সময় কিছুদিন ঝাঁজপিটায় ছিলেন।) দিদি বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত মহান্ত মহারাজকে বলায় তিনি বলিলেন—"ওসব আমি আর কি করব, যা হয় যাদবকে করতে বল।"

এইভাবে কথায় কথায় সময় যাইতেছে অথচ রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে, তাই ললিতাদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দেখুন, এই বাপবেটা দুই জনেই উপস্থিত, যদি এই ছেলেটা মারা যায়, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মঠের অন্য সকল ছেলেদের কণ্ঠি ছিঁড়ে দিয়ে আমি তাদের সংসারে পাঠিয়ে দেব, এবং জগতে নাম ও মহতের যে কোন শক্তি নেই—এই কথাই ঘোষণা করব। আপনারা জগতের উপকারের জন্য এসেছেন। জীবের জন্য আপনাদের

প্রাণ কাঁদে; তবে এই ছেলেটা কি জীবের মধ্যে নয়? সামান্য অপরাধে এর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হ'ল?"

বড় বাবাজী মহাশয় আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ বাবাজীকে দণ্ডবৎ করিয়া ফণীদার নিকটে গিয়া মাথার কাছে বসিলেন। ললিতাদিদি পায়ের কাছে বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ পূর্ব্ব হইতেই মৃদুস্বরে নাম করিতেছিলেন, এখন বড় বাবাজী মহাশয়কেও দিদিরকে পাইয়া খুব উচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" হঠাৎ ফণীদাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নাই; সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, নিশ্চল, নিস্পন্দ।

বড় বাবাজী মহাশয় পদ্মাসনে বসিয়া 'হা নিতাই' বলিযা হুঙ্কার করিয়া দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ফণীদাদার মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। এই সময় তাঁহার লোচন যুগল আরক্তিম ও ঢুলুঢুলু, কাহারও সহিত যেন অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে কথা বলিতেছেন এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। কিছু সময় এইভাবে থাকিবার পরই ফণীদাদার দেহে স্পন্দন দেখা গেল। ললিতাদিদির ব্যস্তভাবে এই কথা বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিতে যাইয়া চাহিয়া দেখেন— যেস্থানে বড় বাবাজী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেস্থানে তিনি নাই, তাঁহার পরিবর্তে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ তেজস্বী এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার নয়ন যুগল রক্তবর্ণও হল মুষলধারী এবং পরিধানে নীল বসন।

দিদি বেশী সময় সে অপূর্ব মূর্ত্তির পানে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, একবার দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ দেখ কি অপূর্ব দর্শন।" দিদি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

এদিকে অতি অল্পসময় মধ্যেই ফণীদাদার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। বড় বাবাজী মহাশয়ও সকলকে অতি সন্তর্পণে নাম করিবার আদেশ দিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

সেবায় সতর্ক দৃষ্টি

ঝাঁজপিট মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সময় সময় বিভিন্ন প্রকার বেশ করা হয়। একবার রাইরাজা বেশ করিবার জন্য বড় বাবাজী মহাশয় দিদিকে আদেশ করার দিদি বললেন—'রাত্রে ১০ টার পূর্ব্বে বেশ হওয়া সম্ভব না। কারণ, অভিসার কীর্ত্তন করে নিকুঞ্জ যুগল মিলন করিয়ে তারপর যা হয় করতে পারি।"

বড় বাবাজী মহাশয় আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন দিদির সেবা নিষ্ঠা দেখিয়া কিন্তু

লোকাপেক্ষ্য আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য বলিলেন—'কয়েকটি শিক্ষিত লোক সন্ধ্যার পরই আসবেন বলছেন এবং তাঁরা তোমাদের বেশ রচনার পারিপাট্য দেখতে চান।" ললিতাদিদি যেন কেমন একটু সন্দিহান দৃষ্টিতে বড়বাবাজী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য সহকারেই বলিলেন—"এখন হতে আমরা সেবার পারম্পর্য্য বজায় না রেখে বড়লোক ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জন করতে আরম্ভ করি, এইরূপই কি আপনার আদেশ?"

বাবাজী—না ললিতা! আমি সেভাবে কথা বলিনি। তোমরা ঠিক ঠিক ভাবানুযায়ী কার্য্য করবে, তাতে যদি আমার কথা রক্ষা নাও হয় তবু আমি রাগ করব না বা আনন্দ ভিন্ন আমার দুঃখ হবে না। তোমরা ভাবানুযায়ী সেবা করে নিজেরা ধন্য হও আমাকেও ধন্য কর। সত্যকথা বলতে কি ললিতা। লোকাপেক্ষায় তোমাদের ভাবের অভাব ঘটে কিনা সেইটি পরীক্ষার জনাই আজ তোমাদের ঐ ভাবের কথা বলছিলাম। নিতাইচাঁদ তোমাদের সর্ব্বদা স্ব-ভাবের সুদৃর নিষ্ঠা বজায় রাখবার শক্তি দিন, তাঁর চরণে আমার এইটিই প্রার্থনা। যাও, প্রাণের আশা মিটিয়ে মনের মত ক'রে যুগলের সেবা কর গিয়ে। আমার কথায় মনে কিছু দুঃখ করনা।

সেবা বিষয়ে বড় বাবাজী মহাশয়ের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অনুগত জনের প্রতি মৌখিক আদেশ ছাড়াও অনেক সময় লিখিত আদেশ দিয়া যথাযথভাবে তাহা প্রতিপ্রানিত হইতেছে কিনা সংবাদ লইতেন। ঝাঁপপিটা মঠে ললিতাদিদিকে এক সময় বড়বাবাজী মহাশয় নিজহস্তে ঠাকুরসেবা ও বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অন্যান্য বক্তব্য লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন—"ঠাকুর-মন্দিরে দিবারাত্র অবিরামভাবে একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিবে। ঠাকুরদের ভোগে একমাত্র দেশী গুড় ছাড়া অন্য কোন মিষ্টি লাগিবে না। মঠের মধ্যে কোনরূপে তৈল প্রবেশ করিবে না। দেশলাইয়ের আগুনে কোন কার্য্য হইবে না, এমন কি আশ্রমে দেশলাই রাখিবেও না। সন্ধ্যার পরে কেহ মঠের বাহির হইবে না। তামাক, গাঁজা, ভাং প্রভৃতি কোনরূপে মাদকদ্রব্য মঠের কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না বা মঠের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। একবেলা ঠাকুরের রান্না হইবে। এবং বৈকালে শ্রীজগন্নাথদেবের যে মহাপ্রসাদ আসেন, তাহা শ্রীগণেশ মহাপাত্র এবং গদাধর রথকে পুরণ করিয়া দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহাই সকলে মাধুকরী করিবে। মঠে ত্রিসন্ধ্যা নামকীর্ত্তন করিবে। তোমরা ব্যতীত দুই মূর্তি দ্বারা শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের নিয়মিত কীর্ত্তন রক্ষা করিবে। ঘৃতপক্ক ছাড়া তৈলপক্ক কোন দ্রব্যে

ঠাকুরের ভোগ হইবে না।" ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শুধু পত্র লিখিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যথা নিয়মে সেবাকার্য্য চলিতেছে কিনা জানিবার জন্য যেখানেই থাকিতেন পত্র লিখিতেন, মধ্যে মধ্যে লোকও পাঠাইতেন। ললিতাদিদিও যথাসাধ্য চেষ্টায় আদেশ পালনে সর্ব্বদা দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। ঝাঁজপিটা মঠে যতদিন দিদি ছিলেন, ততদিন বড়বাবাজী মহাশয়ের নির্দেশমতই সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাগানবাড়ীতে নূতনভাবে সেবার ব্যবস্থা করিতে পূর্ব্বনিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে সে পরিবর্ত্তনে সেবার বিষয়ে কোনরূপে কার্পণ্য বা অন্য কোন প্রকার সহিত কিছু, যে করেন নাই, ইহা নিশ্চিত।

বাসুদেব মহারাজের প্রসাদে নিষ্ঠা

বিশ্বাস কেহ কাহাকেও হাতে করিয়া তুলিয়া দিতে পারে না। তবে যেভাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস জন্মায়, কোথাও কোথাও সেইভাবের পরিপোষক কার্য্যে একজন অপরজনকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারে মাত্র। কোথাও যুক্তি দিয়া, কোথাও বা নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়া, আবার কোথাও বা আচরণকারীর অজ্ঞাতসারে গ্রহীতা তাহার প্রয়োজন মত ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ললিতাদিদির বিশ্বাস ছিল অচল অটল হিমালয়ের মত। মহাজন বাক্য—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" একথাটি একেবারে দিদির হৃদয়ে স্বর্ণক্ষরে খোদিত হইয়াছিল। এই বিশাসের বলেই দিদি অনেক সময় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেন।

বড় বাবাজী মহাশয় একবার অন্যান্য উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন— "উপাসনা লইয়া কাহারও সহিত বাদানুবাদ করিবে না।" একা ললিতাদিদি নন, অন্যান্য অনেক ভক্তের সম্মুখেই এই উপদেশ বাক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তদের অনেককে এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়েছে। বাধ্য হইয়া নয়, উপযাচিতভাবে অন্যভাবের ভক্তকে নানারূপ শ্লেষপূর্ণ রহস্যবাক্য বলিয়া ক্ষণিক আনন্দানুভব করিতে অনেককেই দেখিয়াছি। কিন্তু দিদি কখনও কাহারো ভজন বিষয় লইয়া এমন কোন কথা বলেন নাই, যাহাতে তাহার মনে কোনরূপ ক্লেশ হয়। যে ভাবের উপাসককে যে কোন বেশেতেই তিনি দর্শন করিতেন, তাঁহাকেই অকপট চিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা সম্মান দিতেন। কেউ কিছু বলিলে বলিতেন—"যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।"

প্রসাদে নিষ্ঠা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ললিতাদিদির জীবনে যেন মূর্ত্তিমান হইয়া

দেখা দিয়াছিল। ডাক্তার কবিরাজের তাজ্য বহু মরণাপন্ন রোগীকে দিদি অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস বলে ঠাকুরের চরণামৃত দানে সুস্থ করিয়াছেন। 'চরিত সুধায়', অনেক বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এ স্থানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

পুরীতে থাকিতেন এক মহাত্মা। সকলে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই জানিতেন। নাম শ্রীমৎ বাসুদেব মহারাজ। একমাত্র স্নান যাত্রার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে কয়দিন অদর্শনে থাকেন, সেই কয়েকদিন ছাড়া তিনি ধাম ছাড়িয়া কোথাও থাকিতেন না। সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র ঐ কটি দিন হয় আলালনাথে, না হয় কাশীধামে বা অন্য কোন তীর্থস্থানে গমন করিতেন। কোন কোন বৎসর কলিকাতার ভক্তগণের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া পোস্তার সন্নিকট শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতেন। এতদঞ্চলের ভক্তবৃন্দ ঐ সময় তাঁহার সদানন্দময় মূর্ত্তি সন্দর্শন ও মধুময় সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আমরাও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত বহুবার ঐস্থানে তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

একবার কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ গিয়েছেন তাঁহার এক ভক্তের আহ্বানে। ভক্তটির বাড়ী বুড়শিবতলায়। ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ললিতা সখীর আশ্রম এখান থেকে কত দূর? আমি যখন নবদ্বীপ আসিয়াছি তখন একবার তাহার ওখানে দেখা করিয়া না গেলে সে দুঃখ পাইবে। ভক্তটি পরেরদিন বৈকাল বেলায় ২।৩ জন বন্ধু সঙ্গে বাসুদেব মহারাজকে লইয়া বাগানবাড়ীতে গেলেন।

প্রিয়নাথদাদা, মধুদাদা, নন্দদাদা প্রভৃতি অনেকেই তখন বাগাবাড়ীতে ছিলেন। একচক্রা হইতে ত্রিভঙ্গদাদা রথযাত্রায় পুরী যাইবেন বলিয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করিয়া আজ্ঞা লইতে আসিয়াছিলেন, তিনিও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মহারাজকে লইয়া দিদির নিকট উপস্থিত হইলেন। দিদি যেন আনন্দে কেমন একরম হইয়া একেবারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া করযোড়ে নানাপ্রকার দৈন্যবাক্যে নিজের ও আশ্রমবাসীগণের সৌভাগ্য জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব মহারাজ দিদিকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম 'জয়গোপাল' বলিয়াই সম্বোধন করেন। অনেকক্ষণ নানাবিধ প্রসঙ্গ হইবার পর বাসুদেব মহারাজ নিজেই বলিলেন—"জয়গোপাল! আমি এখানে প্রসাদ পাব কবে?"

দিদি—সে সৌভাগ্য মঠবাসীর কবে হবে তা আপনিই বলুন?

"বেশীদিন তো এখানে থাকা সম্ভব হবে না, কাজে কাজেই আগামীকাল্যই আসব।" এই বলিয়াই আর অন্যান্য দুই চারটি কথা বলিয়া মহারাজ সেদিন চলিয়া গেলেন।

এদিকে দিদি মধুদাদা ও নন্দদাদা প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হইবে। নন্দদাদা বলিলেন—"পুরীতে একমাত্র মহাপ্রসাদ ছাড়া তিনি অন্যকিছু গ্রহণ করেন না। এখানে কি আর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করবেন? আমার মনে হয় ফলমূলাদির ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়।" অন্যান্য সকলে তাহাতেই মত দিলেন।

পরদিন পরামর্শমত নানাবিধ ফলমূলাদি একখানি বড় সাদা পাথরে করিয়া ভোগ লাগাইয়া রাখা হইল। যে ঘরে ভোগের অন্নপ্রসাদাদি রাখা হয় সেই ঘরের একপার্শ্বে পৃথক্ আসন করিয়া ঐ পাথর সমেত ফলফলাদি চাপা দিয়া রাখা হইল। অন্নপ্রসাদ ও অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি অন্যদিকে রহিল।

যথাসময়ে বাসুদেব মহারাজ আসিয়া দর্শন দিলেন। দিদি স্বহস্তে চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। কিছু সময় পরে নন্দদাদার আহ্বানে সেবা করিবার জন্য ঐ প্রসাদ পাইবার ঘরে গেলেন। দিদি বাহিরে থাকিয়া কিভাবে কি করিতে হইবে বলিয়া দিতে লাগিলেন। বাসুদেব মহারাজ দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ জয়গোপাল! তুম্ ভিতর ঘুঁস্তা নেই কাহে?"

দিদি—আমি নীচু জাতি, দেব দ্বিজের ভোগমন্দিরে প্রবেশের অধিকার আমার নেই।

মহারাজ—আরে নেহি নেহি, উস্‌বাৎ দুস্‌রি জায়গামে বোলো। আও, ভিতর্ আও।

দিদি আদেশমত ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটু দূরে বসিলেন। নন্দদাদা ফলের পাথরখানি আনিয়া বাসুদেব মহারাজের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। বাসুদেব মহারাজ পাথরের দিকে চাহিয়াই বলিলেন—"এৎনা ফল-প্রসাদ খানেস অন্নপ্রসাদ ক্যায়সে পায়েগা? এ নন্দবাবা! ইস্‌সে থোড়া পৃথক্ পাত্রমে হামকো উঠা দেও।"

সকলেই একটু বিস্মিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইবার কারণ—যে বাসুদেব মহারাজ নিজ জনের হাতেও অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি আজ বৈষ্ণব বাবাজীদের মঠে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন কেন? তারপর আরও বিস্ময়ের কথা, দিদিকে অন্ন-প্রসাদ আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিদি "জয়গুরু জয়গুরু" বলিতে বলিতে একখানি ভোগের পারস আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া করজোড়ে অন্য আদেশের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ভোগের অন্নাদি যেখানে রাখা হইয়াছিল, তাহার নিকটেই বাসুদেব মহারাজের জন্য আসন করা হইয়াছিল। তিনি পারসখানির দিকে চাহিয়া "জয় জনার্দ্দন" বলিয়া অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনাদির দিকে দৃষ্টি দিলেন। এবং একটা ছোট গামলায় পরিপূর্ণ অন্ন-প্রসাদ দেখিয়া বলিলেন—"ওটা কি?"

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে পারসখানি বাসুদেব মহারাজকে দেওয়া হইয়াছিল উহাতে সূক্ষ্ম আতপের অন্ন ছিল। আর যে গামলার অন্ন দেখিয়া বাসুদেব মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন ওটা কি?—সেটায় ভিক্ষার চাউলের অন্ন ছিল। নন্দদাদা ও দিদি উভয়েই বলিলেন—শ্রীগুরুদেবের আদেশমত আমরা ভিক্ষার চাউলের অন্নেরও ভোগ দিয়া থাকি।

মহারাজ—হাম্‌কো এহি অন্ন দেও।

দিদি—বাবা; ও পাঁচমেশালী চাউল, আর চাউল মোটা, ও কি আপনার যোগ্য!

মহারাজ—দেখো জয়গোপাল! ওহি চাউল নামসে পায়দা হুয়া, আউর এ চাউল রূপেয়াসে পায়দা হুয়া। ইস্‌সে ওহি বহুৎ দামী বহুৎ মিঠা আউর বহুৎ উপ্‌কারী। দেও, দেও হামকো ওহি অন্ন দেও।

ভিক্ষার চাউলের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে বাসুদেব মহারাজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিদি মহারাজের আগ্রহাতিশয্যে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ভিক্ষার চাউলের অন্ন আনিয়া দিলেন। মহারাজও পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

পরম তৃপ্তিতে ভোজন শেষ করিয়া বাসুদেব মহারাজ প্রসাদের মহিমা, ভিক্ষার অন্নে প্রভুর কিরূপ সন্তোষ এই সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। শেষে বলিলেন—তোমরা মঠবাসী, এই নামের দ্বারা সংগৃহীত অন্নের প্রসাদই পাইবে। আর বাবু ভায়াদের এই টাকায় কেনা অন্নের প্রসাদ দিবে।

সেই অবধি দিদি এই আদেশ পালনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং মঠের কোন ছোট যৌবনোচিত কুৎসিত ব্যাধির কবলগ্রস্ত হইয়াছে জানিলে বলিতেন—"তুমি আর কিছু ভালমন্দ খাইবে না, কেবল ভিক্ষার চাউলের অন্নের প্রসাদ নুন লেবুও জল মাখিয়া খাইবে।" বলা বাহুল্য, হতভাগ্য লেখক এ সম্বন্ধে দিদির নিকট হইতে দুই-একটি গোপনীয় তত্ত্ব জানিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

এ দিনের এই প্রসাদ পাইবার ঘটনা ক্রমে ক্রমে প্রচার হইয়া গেল। প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের সম্মুখেই অনেককে দিদি বলিয়াছেন—"মহতের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" আমরা কি বুঝিব? তাঁহারা এইভাবে নিজে আচরণ করিয়া আমাদের মত মোহান্ধের মোহান্ধকার ঘুচিয়ে দিলেন।

রাজরাজেশ্বর শীলামূর্ত্তি প্রাপ্তি

একবার রথযাত্রার পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে বাসুদেব মহারাজ বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তিনরোজ অন্নপ্রসাদ মিলা নেই, আজ সঙ্কল্প কিয়া হিঁয়াপর অন্নপ্রসাদ পায়েঙ্গে।'

প্রভুর লীলাভঙ্গী পাঠকগণ অস্বাদন করুন। মঠে সেদিন কিছুই ছিল না। সকালে ভিক্ষায় যাহা সংগ্রহ হইয়াছিল সমস্তই রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইয়া সকলে প্রসাদ পাইয়াছেন। অপরাহ্ন সময় কোথায় কি ভাবে মহাত্মার সেবার উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে সেই বিষয় লইয়া নন্দদাদার সহিত দিদি পরামর্শ করিতেছেন। নন্দদাদা বলিলেন—"দিদি! একবার ভাণ্ডার ঘর খুলে দেখ না কিছ, আছে কি-না ?'

দিদি—আরে পাগলা, সকালে তো আমিই সব বের ক'রে দিয়েছি, থাকলে তো আমি বলতামই।

নন্দ—তবে এখন কি করা যাবে বল দেখি?

দিদি—তুমি ভাই ওঁকে (বাসুদেব মহারাজকে) স্নান করবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আহ্নিক পূজোর যোগাড় ক'রে দাও। আমি এদিকে দেখি কি ভাবে কি করা যায়। হ্যাঁ, আর এক কথা—ওঁর সঙ্গে তো পূজারী নেই, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর "কে রসুই করবে?"

নন্দদাদা-দিদির আদেশ মত স্নানের যোগাড় করিয়া দিয়া আহ্নিকের আয়োজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রসুই করবে?"

মহারাজ—কেন, মেয়ে রসুই করবে। (দিদিকে বাসুদেব মহারাজ মেয়ে বলিয়া সম্বোধন করিতেন)।

এই সংবাদ দিদিকে দিতে যাইয়া দেখেন, দিদি ডাণ্ডার ঘরের দরজা খুলিয়া কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিতেছেন। নিকটে যাইয়া 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াই ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখেন, দুইখানি বড় বড় কাঠের বারকোষে নানাপ্রকার সামগ্রী সমেত অতি সূক্ষ্ম কামিনীভোগ আতপ চাউল ও স্বতন্ত্র একটা পাত্রে গব্যঘৃত সহ দুইটি সিধা সজ্জিত রহিয়াছে। আবেগভরা কণ্ঠে নন্দদাদা বলিলেন—"দিদি! কে দিয়ে গেল ?" দিদি নন্দনাদাকে ধরিয়া—"ভাই রে, হতভাগিনী আমি এত দেখে এত পেয়েও বিশ্বাস করতে পারছি না। একবার সিধার বহরটা দেখ! আমি তো শত চেষ্টায়ও এমন বিশুদ্ধ ও ভাল জিনিস যোগাড় করতে পারতাম না। এ নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ত্তামশায়ের কীর্ত্তি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

নন্দ—দিদি! এখন ওসব ভাববার বা বিচার বিবেচনার সময় নয়, সন্ধ্যা হয়ে গেলে আর মহারাজের সেবা হবে না। আগে তুমি রসুই চাপাও, মহারাজকে জিজ্ঞেসা করেছিলাম—কে রসুই করবে? তিনি বললেন—মেয়ে রয়েছে, আবার কে রসুই করবে ?

চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া 'জয় শ্রীগুরুদেব, জয় শ্রীগুরুদেব বলিতে

বলিতে দিদি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন এবং অতি অল্প সময় মধ্যেই রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইয়া বাসুদেব মহারাজকে প্রসাদ পাওয়াইয়াছিলেন।

সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া ও শ্রীমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া মহারাজজী দিদির বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তগণ সময় বুঝিয়া যাহার যতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে দিদিও দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণাদি সারিয়া সেই প্রসঙ্গ স্থানে আসিয়া বসিয়াছেন। সেবা, শ্রীগুরুকৃপা ও মহতাগমন যে গৃহস্থের মঙ্গল সাধন করে ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা একটু একটু হইল। শেষে প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি নিজেই দিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মেয়ে! তুমি তো এখানে অনেক শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেছ, কিন্তু শ্রীমন্দিরে শালগ্রাম সেবা নেই কেন ? আমার ইচ্ছা তুমি এক মূর্ত্তি শালগ্রাম এখানে রাখ।'

দিদি—আমি তো এঁদের কাউকেই নিজ ইচ্ছায় বসাই নি, এঁরা স্ব-ইচ্ছায় কৃপা ক'রে এসে বসেছেন। যদি তিনি সেইভাবে এসে ব'সে আমাদের কৃতার্থ করেন, উত্তম। আমার তাতে আপত্তি করবার কি আছে ?

অন্যান্য দুই-একটি কথার পর সে দিনের প্রসঙ্গ শেষ হইল। বাসুদেব মহারাজ পরদিনও মঠে প্রসাদ পাইয়া গেলেন। এইবার সকলে মিলিয়া সেই সিধার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনেকে অনেক কথা বলিলেন; কিন্তু দিদির সেই এককথা—'এ তোমাদের কর্ত্তার কীর্ত্তি।"

রথযাত্রার পরে একদিন একটি পার্শেল আসিয়া উপস্থিত। খুলিয়া দেখা গেল, একটি রাজরাজেশ্বর শিলামূর্ত্তির সহিত ১০।১২টি ছোট-বড় নারায়ণশিলা। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসঅঙ্গনের পূজারী আসিয়া এক মূর্ত্তি শিলা প্রার্থনা করিলেন। তখন কুঞ্জদাদা মঠে ছিলেন। তিনি রাজরাজেশ্বর শিলাটি তুলিয়া রাখিয়া বাকি শিলাগুলি পূজারী ঠাকুরের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। তিনিও উহার মধ্য হইতে তাঁহার পছন্দমত একটি গ্রহণ করিয়া বাকি কয়টি ফেরত দিলেন।

যথা সময়ে অভিষেকাদি করিয়া রাজরাজেশ্বরকে শ্রীমন্দিরে রাখা হইল। বলাবাহুল্য, সেইদিন হইতে মঠে যখন যেকোন নৈমিত্তিক পর্ব্বাদি হয়, সকল সময়েই ঐ রাজরাজেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া যথাযথভাবে পূজাদি করা হয়। এই রাজরাজেশ্বরের শুভাগমনের পর হইতেই মঠের শ্রীমন্দিরাদির ও অন্যান্য যাহা কিছু, উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

এই ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, সে দিনের মঠের অবস্থা দর্শন করিয়া মহাত্মা বাসুদের মহারাজের অন্তরে প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—'পরানুগ্রহমাত্মভাবম্"। অর্থাৎ অপরকে অনুগ্রহ করাই বৈষ্ণবের স্বভাব।

তার্কিক হয়তো এখানে তর্ক তুলিয়া বলিবেন—"বাসুদেব মহারাজ একবার হয়তো ইহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন, অমনি সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছিল? আমরা বলিব না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিলেন— হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাহাই হয়। বিউগল একটি বৈদেশিক বাদ্যযন্ত্র, উহার শব্দ এক যোজন যায়। ব্রজের শব্দ দ্বাদশ যোজন যায়। কিন্তু ভক্তের আহ্বান, সে যে অবস্থায় যে স্থানে বসিয়াই করুক না কেন, "ক্ষণাৎ আক্রম্যতে জগৎ।"

নারদপঞ্চরাত্রে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বমুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভূতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ।।

অর্থাৎ মুক্তি আদি সিদ্ধি সকল এবং নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ সকল দাসীর ন্যায় আসিয়া হরিভক্তি মহাদেবীর সেবায় নিয়োজিত হয়।

দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে

নবদ্বীপ শ্রীবাস-অঙ্গনের সম্মুখস্থ গঙ্গাঘাটের বাঁধানো চাতালে বসিয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। আমি চারুদাদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় গঙ্গার স্রোত উক্ত বাঁধানো ঘাট হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। ভ্রমণান্তে আমরা বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় শুনিলাম একজন অপরজনকে বলিতেছে— "বাগানবাড়ীর ললিতা সখীর ভাব বাহির থেকে কিছু বোঝা যায় না তাই! গলায় তুলসী মালা, কপালে তিলক, বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে দীক্ষিত, সর্ব্বদাই "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামকীর্ত্তন করে, অথচ বার মাসে তের পর্ব্বের কোনটাই বাদ দেয় না। বিশেষ ক'রে দুর্গাপূজার সময় ঘটাটা যেন একটু বেশী বেশী রকমই দেখা যায়।"

২য় বন্ধু—বেশ তো, তাতে হয়েছে কি?

১ম বন্ধু বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় যে বলেছেন—"না পূজিবে দেবীদেবা, না করিবে প্রসাদ ভক্ষণ।" অন্যত্র বলেছেন—"অন্যদেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহরি" ইত্যাদি। তারপর পণ্ডিত মহাশয়দের কাছেও শুনি—বৈষ্ণব সাধকদের পক্ষে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য দেবতার পূজা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল।

চারুদাদা আমাকে বলিলেন—"দাড়াও দীনেশ। এরা কি বলে একটু শুনি। সখীজীর কথা যখন উঠেছে, তখন শেষ পর্যন্ত এরা কি সিদ্ধান্তে গিয়ে দাঁড়ায়, তা শোনার দরকার আছে।" আমরা দুজনেই দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

২য় বন্ধু — ভাই! গোস্বামিপাদগণ জীবের সন্দেহ নিরসন জন্য নানাভাবে নানা শাস্ত্রে এ সব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব ব'লে স্বীকার ক'রে তিনিই যে সর্ব্বারাধ্য, তাঁর আরাধনা করলে যে আর কোন দেবদেবীর আরাধনা করা আবশ্যক হয় না এ বিষয়ে বিষদভাবে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। গাছের গোড়ায় জল ঢাললে তাতেই যেমন তার শাখা প্রশাখার পরিপুষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করলেই সাধকের সকল দেবদেবীর অর্চ্চনা হয়ে থাকে। তবু অনেকে বিশেষতঃ ললিতা সখীমা কেন এরূপ করেন, এ বিষয়ে আলোচনা তুলে ভালই করেছ। এ বিষয়ে একটা মীমাংসা হওয়া বিশেষ দরকার।

সখীজীকে আমরা বাইরে যেরূপে দেখি যা তিনি নিজেকে যেরূপ অবলা অশিক্ষিতা ব'লে প্রকাশ করেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি তা নন্। সখীজীর মত নানা শাস্ত্রপারদর্শী আচারনিষ্ঠ লোক সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আমার মনে হয়, আমরা মনগড়া একটা সিদ্ধান্ত না ক'রে তাঁর কাছে যাই চল, ভাল নয় কি ?

১ম বন্ধু—না ভাই ! আমার তাঁর কাছে গিয়ে এ জাতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ভীষণ ভয় হয়। কোথায় কি দোষ বেরবে।

২য় বন্ধু—ভয় কি? আর তাতে দোষই বা কি? চল, চল।

উভয়ে বাগানবাড়ীর দিকে চলিল, আমরাও তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। পথে যাইতে যাইতে কেবল শুনিতে পাইলাম—একজন অপরজনকে বলিতেছে "আমি কিন্তু কিছু বলতে পারব না ভাই! যা বলতে হয় তুমিই বলবে।"

বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখি, দিদি রান্নাবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাধবীলতা গাছের মাচা মেরামত করাইতেছেন। আমাদের বা ঐ বন্ধুযুগলকে আর কিছু বলিতে হইল না। দিদি দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "জয় গুরু। জয় গুরু। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। এতদিনে ধাম দর্শনের সুযোগ হল?" উক্ত দুইজনার একজন "সুযোগ নয়, সৌভাগ্য বলুন' এই বলিয়া সহাস্যে উভয়েই দিদিকে দণ্ডবৎ করিলেন। দিদি তাঁহাদের লইয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন।

আমরা বুঝিলাম ইঁহারা দিদির পূর্ব্বপরিচিত। দুই চারিটা অন্য কথার পর দ্বিতীয় বন্ধুটি দিদিকে বলিলেন, "আমার এই বন্ধুটি নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের 'না পূজিবে দেবীদেবা, না করিবে প্রসাদ ভক্ষণ" এবং 'অন্যদেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহার' এই পয়ার দুইটির অর্থ কি এবং আপনি কেন দুর্গাপূজা, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করেন, বৈষ্ণবের এই সব করা কর্ত্তব্য কি না, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানতে চান। আপনার সময় হবে কি?'

দিদি—সময়ের অভাব কি, তবে তত্ত্ব আলোচনার আধিকার কি আমার আছে? আপনি তো পণ্ডিতলোক, আপনিই একটু বলুন না।

২য় বন্ধু—আমাদের পাণ্ডিত্য চেয়ারে ব'সে ছেলে ঠেঙাবার বেলায়, তত্ত্ব কথার আমরা কি জানি। দয়া ক'রে যদি একটু বলেন তবে কৃতার্থ হই।

দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তরে বুঝিলাম ইনি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। যাহা হউক, দিদি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

এই সব কথার ভিতর অনেক রহস্য আছে। বিশেষভাবে আলোচনার সময় এখন না, তবে যতটকু সম্ভব করা যাউক। প্রথমেই একটি কথা বলি,—লোচন দাস ঠাকুর একস্থানে বলিয়াছেন "সর্ব্বদেব পুজিবে না হবে তৎপর। সর্ব্বত্র মাগিলবে কৃষ্ণভক্তি বর।।' তারপর শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে একস্থানে বলিয়াছেন—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।'

অর্থাৎ শ্রীহরিকেই আরাধ্যদেবরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে। কেননা দেবগণের যিনি ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীহরি। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে কখনও কোন মতে অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

এই অবজ্ঞা করিতে নিষেধ করিয়া গোস্বামিপাদগণ যে অর্চ্চনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, একথাও মনে করা চলে না। অবজ্ঞা না করা আর অর্চ্চনা করা এককথা নয়। এই ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গোস্বামিপাদ দেখাইয়াছেন—"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।।" — ভাঃ ৩।২৯।৩৪

বৈষ্ণব কবি একছত্র পয়ারে ইহার অর্থ করিয়াছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" তাহার পর অন্যত্র দেখা যায়—

"ব্রাহ্মণ চন্ডাল কুক্কুরান্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি।।
এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি।"

কাজেই যেখানে জীবমাত্রকেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান জ্ঞানে প্রণাম। দণ্ডবতাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের কথা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতিরূপ দেবদেবীগণকে পূজা করায় কি দোষ হইল?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামের বিদধাম্যহম।।'

অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি যে যে দেবতারই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করুক না কেন, আমি অন্তর্য্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির তক্তমূর্ত্তিতে ভক্তি দৃঢ় করিয়া দিয়া থাকি।

সাধারণতঃ স্থূলবুদ্ধি বশতঃ জীব ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে ভিন্নভাব নেই, সকলের ফলদাতাই একমাত্র তিনি। কাজেই যে যে ভাবেই তাঁহার পূজা করুক না কেন, তিনি সেই ভাবেই পূজকের অর্চ্চনার ফললাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।

বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ''—এ কথাটা তো সকলের মুখেই শোনা যায়। শঙ্কর যদি শ্রেষ্ঠতম বৈষ্ণবই হইলেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীগণের তাঁহার পূজো করিতে বাধা কি? শ্রীবৃন্দাবনে গোপেশ্বর মহাদেবের নিকট মস্তক অবনত করিতে কোন বৈষ্ণব আপত্তি করেন? কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি কামনায় যে গোপীগণ কাত্যায়ণী মহামায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন, এ কথা কি মিথ্যা ?

মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ, ইঁহারা কি যজ্ঞকালে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন নাই? শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কাটোয়া হইতে নীলাচল গমনকালে আবার নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে পথে যে সব দেবদেবীর মন্দির পাইয়াছিলেন, সে সব স্থানে কি তিনি প্রণাম দণ্ডবতাদি ও স্তব, স্তোত্র কীর্ত্তনাদি দ্বারা অর্চ্চনা করেন নাই ? কাজেই ইহাতে ভক্তিলোপের সম্ভাবনা কোথায়? তবে ঠাকুর মহাশয়ের উক্তির তাৎপর্য এই যে, বেদ ভাগবত আদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ ভগবত্তা বর্তমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহাতে ভগবত্তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তিনিই হন সর্ব্ববাদি সম্মত সর্ব্বরাধ্য

এই সর্ব্ববাদি সম্মত মতের বলেই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'না পূজিবে দেবীদেবা" ইত্যাদি। অর্থৎ আরাধ্যরূপে একমাত্র কৃষ্ণেরই পূজা করিবে। যাঁহারা এই কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অংশ কলা বা বিভূতি স্থানীয় দেবদেবীর আরাধনায় ব্যস্ত হন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর মহাশয় "অন্যদেব পূজক ধ্যানী দূরে পরিহার" প্রভৃতি পয়ার বলিয়াছেন।

মহাভারত পাঠ করিলে তাহাতে পাওয়া যায়—

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্তামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্।।"

সন্ধ্যারতির কাঁশার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দিদি 'জয়গুরু বলিয়া দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আমরাও আরতি দর্শন মানসে চলিয়া গেলাম। বন্ধুযুগল পরমানন্দ মনে "আবার কাল আসিব" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বলাবাহুল্য, ইঁহারা পরদিন যথাসময়েই আসিয়াছিলেন এবং দিদির অমৃতময় উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমার সেদিন উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নাই। কারণ, আমাকে পণ্ডিত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল।

গুণের আদর সর্বত্র

আমার মধ্যমাগ্রজ পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুখবোধিনী" নাম্নী একটি টীকা করিয়াছিলেন। তাহা মুদ্রিত হইয়া প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই নানাস্থান হইতে পণ্ডিত ও ভক্তগণ অনেক সময় দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোঁড়ার বাগানে আসিতেন। আমি তখন ঐ কোঁড়ার বাগানেই থাকি।

একবার রবিশাল জেলার অন্তর্গত শিকারপুর নামক গ্রাম হইতে আশুতোষ চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া দাদার সহিত দেখা করিয়া নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ যেমন নিষ্ঠাবান তেমনই ভক্ত। নবদ্বীপ যাইয়া কোথায় থাকিবেন, কোথায় আহারাদি করিবেন, সেই বিষয় লইয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়েন। দাদাকে বলায় দাদা আমাকে তাঁহার সহিত নবদ্বীপে পাঠাইয় দিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, বাগানবাড়ীতে যাইয়া ললিতা দিদির নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমার শাপেবর হইল। একে তো নবদ্বীপ যাওয়া, তাহাতে আবার দিদির কাছে।

আশুবাবুকে লইয়া যথাসময়ে আমি নবদ্বীপ গিয়াছিলাম এবং কয়েকদিন দিদির নিকটেই থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। দিদির সুব্যবস্থায় আশুবাবুর ও আমার সেখানে থাকিবার এবং আহারাদির কোনরূপে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। একদিন দুইদিন করিয়া ব্রাহ্মণ আটদিন সেখানে ছিলেন। আমিও বাধ্য হইয়া সঙ্গে ছিলাম। একদিন অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্গে দিদি আলোচনা করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে একটি ভক্ত বলিলেন—"মা ! অনেকে বলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিভেদ মানিতেন না, এবং সেই জন্যই তাঁহার ভক্তগণও মানেন না। এ কথা কি ঠিক?"

দিদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু মর্য্যাদা পুরুষোত্তম পুরুষ। তাঁহার নিকট কোন রকমেই কখন কাহারও মর্য্যাদার হানি হয় নাই বা হইতে পারে না। শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের সারমর্ম্মই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাই হয়তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে লোকের মনে হইতে পারে, তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। বাবা! তিনি সর্ব্বত্রই গুণের আদর করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়—

> "বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্
> মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পূনাতি স কুলং ন তু ভূরিমাণঃ।।"
>
> —ভাঃ ৭।৯।১০

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে শাস্ত্রের কথা অবহেলা করা চলে কি? ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে জাতি বা বর্ণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। "চণ্ডালোঽপি

দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।।" শাস্ত্র যখন এই ভাবের কথা বলিতেছেন, তখন কাহাকে বাদ দিবে?

ভক্ত—আমি কাহাকেও বাদ দিবার কথা বলিতেছি না, তাহা হইলে কি বুঝব জাতিভেদ প্রথা জীবকল্পিত?

দিদি—তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

আবার শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।"

আবার বলিতেছেন—'অন্ত্যজানসৃজৎ ব্রহ্মা তামসান্, শ্রমজীবিনঃ।"

কাজেই যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভগবানই গুণকর্ম্মাদিভেদে 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র চারিবর্ণের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের পৃথক পৃথক ভাবে আশ্রমাদিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন জাতিভেদ আধুনিক বা কোন বাক্তি বিশেষে কল্পিত বলা যায় কি করিয়া?

ভক্ত—এখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, এমন কি অনেক সাধুকেও জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে দেখি, এটা কি ঠিক?

দিদি—ঠিক কি ভুল আমি কি করিয়া বলিব? যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা ঠিক বুঝিয়াই করিতেছেন। যখন ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিবেন তখনই নিবৃত্ত হইবেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট এ জাতীয় বহু, প্রশ্ন উপস্থিত হইত, তিনি স্পষ্টই বলিতেন, "অনাদিকাল থেকে যা চ'লে আসছে তাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বাতুলতা।" তারপর তাঁহার নিজ আচরণে অতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদিও কোনরূপে ক্লেশ বা অসম্মান পায় নাই। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—"ভেদাভেদ প্রবৃত্তির ব্যবহার লইয়া প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণ আছে। একটু লক্ষ্য করিলেই তাদের কার্য্যাদি হইতে তাহা ধরা যায়।" তারপর গুণের ক্রিয়া অনুসারেই যে জাতির নির্ণয় হইয়াছে, এ কথা শাস্ত্রেরই কথা--"সর্ব্ববর্ণেঽপি তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।"

বোধ হয় প্রসঙ্গ আরও কিছুক্ষণ চলিত, কিন্তু হঠাৎ বাগানের পূর্ব দিকের একটি আমগাছ পড়িয়া যাওয়ায় সকলেই "কি হ'ল? কি হ'ল?' বলিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেল। দিদিও উঠিয়া পড়িলেন। আশুবাবু আমাকে বলিলেন—"বড় সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল, ভাগ্যে নেই, তাই কোত্থেকে একটা উট্‌কো উৎপাৎ এসে উপস্থিত হয়ে সব মাটি ক'রে দিল।'

সেবা ও স্মরণে দিদি

নিত্যধামে নিত্যালীলা যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বা হইতেছে, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ যে ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন বা করিতেছেন, যথাযথরূপে তাহার অনুশীলন করার নামই স্মরণ। সাধক ভক্তগণ স্মরণমননাদি দ্বারা সেই রস আস্বাদন করিয়া ধন্য হন। কারণ, ইহাই সাধকের পক্ষে সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্তির বিষয়। এই ভাব যাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনি ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপে যাজন করিয়া কালক্ষেপ করিতে পারেন না।

আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদি সর্ব্বদাই এইসব লীলা স্মরণে আবিষ্ট থাকিতেন। কোন্ সময় কি ভাবের লীলায় কোন্ জাতীয় বেশভূষা ধারণ করা প্রয়োজন, শতকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহাতে তাঁহার ভুল হইত না। বাহিরে যাঁহারা তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব জানেন না, তাঁহারা হয়ত তাঁহার এই বেশ পরিবর্ত্তনাদিকে ভোগের কোঠায় ফেলিয়া সমালোচনা করিবেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাব কিছু মাত্রও অবগত ছিলেন, তাঁহারা এই নব নব বেশ রচনার মধ্য দিয়াই তাঁহার লীলা-রসাস্বাদনের লক্ষণ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া ধন্য হইতেন।

এমন কি অনেক সময় আমাদের মত বহির্ম্মুখীর ভাগ্যেও দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে যে, দিদির নিকট বসিয়া কোন হাস্যরসের প্রসঙ্গ হইতেছে কিন্তু তিনি করুণ রসাত্মক শব্দ করিয়া চঞ্চলভাবে তদনুরূপ অঙ্গাদি চালনা করিতেছেন। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, গভীর তত্ত্বালোচনার সময় শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যেও দিদি হাসিতে হাসিতে "দেখ দেখ, রঙ্গ দেখ" বলিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়াছেন।

একদিন কয়েকটি বিদেশী ভক্ত সমাজবাড়ী দর্শনে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীযুগল কিশোরের আরত্রিক দর্শন করিয়া পরক্ষণেই সিংহাসন ও শ্রীবিগ্রহের বেশভূষার পরিবর্ত্তন ও যুগলের পরস্পর স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থানাদি দর্শন করিয়া কেমন যেন একটু বিচলিত চিত্তে দিদিকে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি প্রথমে কিছুই বলিতে চাহেন না, শেষে বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"অপ্রাকৃত প্রেম-রসময়ী পরকীয়া ভাবাত্মিকা নরলীলানুকারিণী ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধিকা জিউর সহিত নাগরেন্দ্র চূড়ামণির যখন যেখানে যেভাবে মিলনলীলা হইয়াছিল, এখানকার সেবক-সেবিকারা সেই সেই ভাবেই সেবা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এখন উভয়ে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করিলেও

আবার অভিসারের পরে যথাযথভাবে মিলিত হইবেন।

এ ব্যবস্থা আমরা মনগড়াভাবে করি নাই; বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুদের পুরীধামে ঝাঁজপিটা মঠ প্রাপ্ত হন। সেখানকার শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য ঐ পুরীধামেরই গঙ্গামাতা মঠের বিহারীদাস পূজারীর শিষ্য করুণাকর দাসকে ঝাঁজপিটায় আনয়ন করান এবং তাঁহার উপরেই শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সেবার ভার দিয়া নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন—কি ভাবে কোন্ নিয়মে সেবা হইবে। এই করুণ্যকর দাসকেই সখীবেশ ধারণের পর 'কুসুমমঞ্জরী দাসী' নামে অভিহিত করা হইত। শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশিত নিয়মটি এই—

কুঞ্জভঙ্গ হইয়া মঙ্গলারতির পরে রাধারাণী ও রাধাকান্ত পৃথক থাকিবেন। উভয়ের পৃথক স্নান, শৃঙ্গার, আরতি ও ভোগ হইবে। ভোগের পরে গোষ্ঠবেশ হইলে তবে রাধাকান্ত গোষ্ঠে গমন করিবেন; শ্রীমতীও সূর্য্যপূজার ছলে সখীগণ সঙ্গে রাধাকুণ্ড যাইয়া কৃষ্ণসহ মিলিত হইবেন। ঐ সময় পরমান্ন ভোগ হইয়া আরতি হইবে। আবার বেলা চারিটার সময় শীতলভোগ হইয়া উভয়ে পরপর পৃথক হইবেন। সায়ংকালে রাধাকান্তের গোধূলি আরতি এবং শ্রীমতীর আরতির পর জল আনিবার ছলে যুগল-মিলন হইয়া আরতি হইবে। আরতির পর পরস্পর পৃথক থাকিবেন। রাত্রি দশ দণ্ডের পর অভিসার হইয়া পুনর্ব্বার মিলন ও ভোগের পর নিকুঞ্জে আরতি হইয়া উভয়ের একত্রে শয়ন দেওয়া হইবে। শ্রীগুরুদবের নির্দ্দেশমত যেখানে যেখানে সেবার অধিকার পাইয়াছি, ঐ নিয়মেই আমরা সেবা করিবার চেষ্টা করি।"

যে ভক্তটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আমি অন্য কোথাও এ ভাবের সেবা দেখিনি, তাই আমার কেমন গোলমাল লাগ্‌ছিল, সেইজন্যই আপনাকে কষ্ট দিলাম।"

দিদির স্বহস্তলিখিত একখানি খাতাতে আমরা বৃষভানুনন্দিনীর কখন কোথায় কতদিন অবস্থিতি, তাহার একটি তালিকা পাইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"যদিও অপ্রাকৃত প্রেম-রসময়ী পরকীয়া ভাবাত্মিকা নরলীলানুকারিণী ব্রজলীলায় নিত্যনৈমিত্তিকাদি ব্যাপার সম্বলিত বিধায় শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী রাধিকা জিউর শ্রীযাবট বৃষভানুপুর বা নন্দালয়ে গতাগতি বা স্থিতিকালের নিয়ম বিধিবদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, তথাপি দিক্‌দর্শনরূপে এক বৎসর যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই লেখা হইল। নৈমিত্তিক কার্য্যানুরোধে ইহার বাতিক্রম হইয়া থাকে।

১। মাঘী শুক্লাপঞ্চমী হইতে আষাঢ়ী শুক্লাচতুর্থী পর্য্যন্ত পাঁচ মাস শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বর্ষাণে পিত্রালয়ে অবস্থান করেন।

২। আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী হইতে শ্রাবণী শুক্লাপ্রতিপদ পর্য্যন্ত সাতাশদিন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন।

৩। শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে হিন্দোলা উৎসব উপলক্ষ্যে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চৌদ্দদিন বর্ষাণে অবস্থিতি।

৪। ভাদ্রীয় কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত পাঁচদিন যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি।

৫। ভাদ্রীয় কৃষ্ণাষষ্ঠী হইতে কৃষ্ণানবমী পর্যন্ত চারদিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নন্দালয়ে অবস্থিতি।

৬। ভাদ্রীয় কৃষ্ণা দশমী হইতে শুক্লানবমী পর্য্যন্ত পনেরদিন নিজ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বর্ষণে অবস্থিতি।

৭। ভাদ্রীয় শুক্লাদশমী হইতে আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ পর্যাপ্ত বাইশদিন যাবটে অবস্থিতি।

৮। আশ্বিনী শুক্লা দ্বিতীয়া হইতে শুক্লানবমী পর্যন্ত অম্বিকা উৎসব উপলক্ষ্যে আটদিন পিত্রালয়ে অবস্থান।

৯। আশ্বিনী শুক্লাদশমী হইতে কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত উনিশদিন যাবটে স্থিতি।

১০। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হইতে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত দীপাবলি ও গোবর্দ্ধন পূজা উপলক্ষ্যে তিনদিন সমস্ত ব্রজবাসী সহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নীচে তাঁবুতে অবস্থিতি।

১১। কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বিতীয়া হইতে শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে তিনদিন বর্ষাণে অবস্থান।

১২। কার্ত্তিকী শক্লাপঞ্চমী হইতে মাঘী শুক্লাচতুর্থী পর্য্যপ্ত তিনমাস যাবটে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি।

১৩। বর্ষাণে ৬ মাস ১০ দিন, যাবটে ৫ মাস ১৩ দিন, নন্দালয়ে ৪ দিন, গোবর্দ্ধনে ৩ দিন, মোট ১২ মাস।

হরিসভায় বিদ্যারত্নের প্রতিমূর্ত্তি

একবার ঝুলন-পূর্ণিমার পর কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। রামকৃষ্ণপুর নিবাসী ভক্তবর সতীশচন্দ্র আঢ্য মহাশয় তখন বাগানবাড়ীতে ছিলেন। বিহারীদাস বাবাজীর সহিত সতীশবাবুর পূর্ব্বাশ্রমে বিশেষ পরিচয় ছিল। বেশাশ্রয়ের পর সে বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বিহারীদাস বাবাজী বলিলেন—"এবার আর যাবার

জন্যে তাড়াহুড়া করা চলবে না।' সতীশবাবু বলিলেন—"না না, আমরা সব একসঙ্গে যাব।' আমি কাহারও কথার কোন উত্তর না দিয়া "দেখি, ঠাকুর কি করেন" এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলাম।

দুই-তিনদিন পরে সঙ্গী বন্ধুরা চলিয়া আসিলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে ইঁহাদের সহিত বাগানবাড়ীতে থাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিলাম। আমি সরকারী কাকা, সকলেই আমাকে কাকা বলিয়া ডাকে। এমনও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বাবা-মা, ছেলে ও নাতি-নাতনীরা সকলেই কাকাবাবু বলে। আমিও অবলীলাক্রমে তাহাদের সকলের ডাকে সাড়া দিয়া থাকি।

একদিন বৈকালে বাগানবাড়ীর আঙ্গিনায় চাঁপাফুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছি। একজন মঠের সেবক আসিয়া বলিল—"কাকা! আপনাকে মা ডাকছেন।" আমি তাহার সঙ্গে দিদির নিকট যাইয়া দেখি দিদি সম্মুখে একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া একটু দূরে বসিয়া আছেন। আমি যাইতেই 'আসুন আসুন, এই আসনে বসুন বলিয়া আসনখানি দেখাইয়া দিলেন। আমি আসনটি তুলিয়া মেঝেতে বসিতে যাইতেছি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন—"না না, আসনে বসুন, নইলে দুঃখ পাব।" কি করি, ইতঃস্তত করিয়া দণ্ডবৎ প্রনামান্তে আসনেই বসিলাম।

"কদিন থাকা হবে?" দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বললাম—"এ সময় বাড়ীতে বিশেষ কোন কাজের তাড়া নেই, দুচার দিন থাকতেও পারি।'

দিদি—বেশ বেশ, দু-চার দিন কেন? এখন বেশ কিছুদিন থাকুন না ? এখন এখানকার জল হাওয়া মন্দ নয় আর বিশেষ কোন উৎসব পর্ব্বের জন্য জনসমাগমের সম্ভাবনা নেই। বেশ নিরিবিলিতে দিন কতক থাকুন না কেন?

আমি দেখি প্রভুর কি ইচ্ছা।

এইসময় সতীশবাবু নামের মালা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দিদি—অত হাসি কিসের আড্ডিমশাই ?

সতীশবাবু,—পণ্ডিত মশাইদের সিদ্ধান্ত শুনে হাসছি দিদি। ওঁরা বলেন কিনা 'নিতাই গৌর রাধেশ্যাম' নাম করলে...।

দিদি — (বাধা দিয়া) যাক, আর শোনবার ইচ্ছা নেই। অন্য প্রসঙ্গ হোক।

দিদির মুখে-চোখের ভাব দেখিয়া মনে হইল যেন ভিতরে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু বাহিরে অন্য কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন—

"আড্ডি মশাই। শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনেছি, বিদ্যা চার প্রকার—অর্থকরী যশস্কারী, বাদকারী ও সুতত্ত্ববোধিনী। ছেলেকে শিক্ষকের হাতে দিয়েই বলে

দেওয়া হল যাতে কোন রকমে একটা চাকুরী বাকুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া সেইরূপে একটা শিক্ষা দিবেন। এইটি হল অর্থকরী বিদ্যা। তারপর পরীক্ষা দিতে গিয়ে অপর ভাল ছেলেদের কাছ থেকে প্রশ্ন জেনে নিয়ে বা পরীক্ষককে গোপনে কিছু দিয়ে অথবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক পরীক্ষায় পাস ক'রে লোকের কাছে যশলাভ করার জন্য যে শিক্ষা, তাকে যশস্করী বিদ্যা বলে। আর সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্র প'ড়ে বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে গিয়েও প্রথমেই পণ্ডিত মশাইয়ের নিকট কুটতর্ক অভ্যাস ক'রে কিভাবে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ক'রে লোকের কাছে আপনাকে জ্ঞানী পণ্ডিত ব'লে প্রতিপন্ন করা যায়, এই জাতীয় শিক্ষাকে বাদকরী বিদ্যা বলে।

এই তিন প্রকার বিদ্যার্জ্জনের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হওয়া তো দূরের কথা বরং বৃদ্ধিই হয়। তাই পণ্ডিতগণ এই বিবিধ বিদ্যাকেই অবিদ্যা ব'লে বর্ণন করেছেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে বিদ্যাভ্যাস করা হয়, তাকেই সুতত্ত্ববোধিনী বিদ্যা বলে। এই বিদ্যাবলে অজ্ঞান ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়ে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বস্তুনির্দ্দেশ, বস্তুনির্দ্দেশ হলে নির্দ্দিষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির জন্য লালসা। সেই লালসাই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তৎতৎ বস্তুপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদর্শ নিয়ে সাধনা করিয়ে অভিষ্ট বস্তু প্রাপ্ত করায়। আপনি যে পণ্ডিত মশাইদের সিদ্ধান্ত শুনে হাসলেন, তা এই প্রথম তিন জাতীয় বিদ্যার মধ্যে পড়ে না কি? নীতিশাস্ত্রে বলেছেন—"দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বংযাতি কোকিলঃ। পীত্বা কর্দ্দমং পানীয়ং ভেকো মকমকায়তে।।'

এই সময় দুই তিনটি ভক্তসঙ্গে খড়দহের প্রভুপাদ শ্রীজীবেন্দ্র মোহন গোস্বামী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিদি শশব্যস্তে উঠিয়া আসন দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বসাইয়া "কখন শুভাগমন হ'ল, শ্রীঅঙ্গের কুশল তো?" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদও সংক্ষেপে দিদির প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন—'সখীদিদি! তোমার কাছে একটা বিষয় জেনে নিঃসন্দেহ হতে এসেছি। নিঃসঙ্কোচে বলবে তো ?"

দিদি—এ আবার কিভাবের পরীক্ষা প্রভু? আমি এমনকি জানি যে, আপনাকে ব'লে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করব ?

প্রভুপাদ—আমার জানবার বিষয় কোন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নয়, বিষয়টি হচ্ছে নবদ্বীপ হরিসভায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। শুনলাম তুমি নাকি এর ইতিবৃত্ত বেশ ভালভাবেই জান। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে আমাকে সেই ঘটনাটি বল।

দিদি আমি তো স্বচক্ষে কিছু দেখিনি প্রভু! তবে যেভাবে শোনা আছে

আপনাকে তা বলতে পারি।

প্রভুপাদ—তাই বল দিদিভাই!

দিদি — হরিসভা নাম হয় অনেক পরে, ওটা ছিল মথুরা নাথ পদরত্ন মহাশয়ের টোলবাড়ী। ঐখানেই নেহাল ক্ষ্যাপার ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশমত এক শুভক্ষণে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ঐ টোলবাড়ীর নাম হরিসভা হয়।

প্রভুপাদ—হ্যাঁ, এ বিষয়ে সেদিন মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট কিছু কিছু, শুনেছি। আমার জানবার বিষয় হচ্ছে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। তাই তুমি বল।

দিদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই-ই বলছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর পাঁচ-ছ বৎসর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয় পুত্র মথুরানাথের সাহচর্য্যে খুব আনন্দের সঙ্গেই প্রভুর সেবা করেন। একদিন অপরাহ্নে নামের মালা হাতে নিয়ে নাম করতে করতে ঠাকুরবাড়ীর চতুর্দ্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। সেই সময় একটি ঘরের মধ্যে নিজের একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখে পুত্র মথুরানাথকে জিজ্ঞেস করলেন—"মথুর! এ মূর্ত্তি এখানে কোত্থেকে এল? মথুরানাথ বিনীত ভাবে বললেন—"একটি ভাল কারিগর পেয়েছিলাম, তাকে দিয়ে আমিই এটি তৈরী করিয়ে রেখেছি।"

বিদ্যারত্ব মহাশয় শুনে গম্ভীরভাবে একটু সময় কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন — "তুমি শাস্ত্র পড়েছ মথুর! তুমি কি জান না যে, কোন মূর্ত্তি অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় ঘরে রাখতে নেই ? সেদিন এই পর্য্যন্ত, আর কিছু না ব'লে চলে গেলেন।

প্রায় ১৬/১৭ দিন পরে আবার সেই ঘরের কাছে গিয়ে দেখেন যে, মথুরানাথ মূর্ত্তিটি সেখান থেকে সরান বা অন্য কোন ব্যবস্থাও করেনি। তিনি পুত্রকে ডেকে একটু যেন ক্রুদ্ধভাবেই বললেন—"যদি একান্তই তুমি আমার এ মূর্ত্তি এখানে রাখতে চাও, তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে রাখ।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় তো চলে গেলেন। কিন্তু মথুরানাথের পিতৃদেবের আদেশ শ্রবণ ক'রে আনন্দাতিশয্যে চোখ দিয়ে দরদর ধারা বইতে লাগল। কেন না তাঁর মনোবাসনা পিতৃদের পূরণ ক'রে দিলেন। তিনি একটি ভাল দিন দেখে যথাবিধি পূজার্চ্চনাদি ক'রে মূর্ত্তিটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে স্থাপন করলেন।

প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন ক'রে পিতৃদেবকে সংবাদ জানাতে ও প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন, পিতৃদেব তাঁর ঘরে আসনের উপর স্থিরভাবে ব'সে আছেন। হাতে

শ্রীনামের মালা, নয়ন উন্মীলিত। কিছু সময় যোড় হাতে অপেক্ষা ক'রে থেকে যখন কোনরূপে সাড়া পেলেন না, তখন কাছে এগিয়ে গিয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেন যে, দেহে কোনরূপে স্পন্দন নেই, নয়নতারাও স্থির। অবস্থা দেখে বুঝা গেল, প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ ক'রে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। এখনও পর্যন্ত হরিসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠের একপার্শ্বে থেকে মথুরানাথের কীর্ত্তি দর্শকগণকে আনন্দ দিচ্ছে।

প্রভুপাদ—আচ্ছা দিদি! এভাবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং তার সেবা করা তুমি সমর্থন কর ?

দিদি—প্রভু! আমার ব্যক্তিগত সমর্থনে অসমর্থনে কি আসে যায়? আপনারা সমাজের শিরোমণি। আপনাদের ব্যবস্থা, আপনাদের আদেশ পালন সেইটাই তো আমাদের কর্ত্তব্য। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছি। যদি অভয় দেন তাহলে বলি।

প্রভুপাদ—না দিদি ! তুমি নির্ভয়ে, অকপটে তোমার প্রাণের কথা খুলে বল। তোমার সিদ্ধান্ত আর কেউ না নিলেও আমি নেবই।

দিদি—যাঁর কৃপায় সর্ব্বেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ প্রকাশ হ'য়ে সেবা দিয়ে ধন্য করেছেন, তাঁর পূজা করা কি অন্যায় ? তারপর অন্য দিক দিয়েও তো তিনি পূজ্য জন্মদাতা পিতা এবং শাস্ত্রজ্ঞানদাতা গুরু। সে অবস্থায় যদি মধুরানাথ পদরত্ন মহাশয় পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেই থাকেন, তাতে এমন কি দোষ হয়েছে কি না। তবে আপনাদের শাস্ত্রের কি আছে না আছে আপনারাই বলতে পারেন।

প্রভুপাদ—না দিদি। আর শাস্ত্রের কথা তুলে মন চঞ্চল ক'রে দিও না। তোমার যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তই আমার যথেষ্ট। সত্য কথা বলতে কি, আমার যা একটু সন্দেহ ছিল, তোমার ঐ শেষের দুটো কথায় সব সন্দেহ মিটে গেছে।

দিদি "জয়গুরু, জয়গুরু" বলিতে বলিতে করযোড়ে উঠিয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুও আসি দিদি, যদি থাকা হয় তবে আর একদিন আসব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দিনের সেই সময়কার প্রসঙ্গ এই খানেই শেষ হইল। সতীশবাবু কেবল বলিলেন—'শ্লোকটার ব্যাখা শোনা হ'ল না। আচ্ছা, অন্য সময় হবে।" আমরা যে যাহার কাজে বাহির হইয়া আসিলাম। একটু পরেই নাটমন্দিরে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পাঠ আরম্ভ হইবে। আমরা পাঠ শুনিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

ব্রজবালা ও সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তি

শিবপুর যষ্ঠীতলানিবাসী নারায়ণ চন্দ্র পাঠক মহাশয় প্রায়ই আমাদের কোঁড়ার বাগানের বাড়ীতে আসিতেন। একবার স্বামী সচ্চিদানন্দ ব্রজবালা পরেশ চন্দ্র দত্ত, সত্যচরণ দাস, কালীপদ দাস, উমাচরণ দাস প্রভৃতি। ১২।১৩ জন ভক্ত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন পূর্ব্বোক্ত পাঠক মহাশয় আমার দাদার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের পুতনামোক্ষন লীলা আলোচনা করিতেছিলেন। আমি ও আর একজন ছাত্র গ্রন্থ খুলিয়া আলোচনা শুনিতেছিলাম। সঙ্কীর্ত্তন উপস্থিত হইতেই আমরা সকলে উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দাদা অগ্রসর হইয়া ব্রজবালাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। ব্রজবালার মধুর নৃত্য এবং সুকণ্ঠ ও সুবাদক সত্যচরণের খোল বাজানার সঙ্গে সঙ্গে পদের এক একটি অক্ষর যেন সুধাবর্ষণ করিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা নৃত্যকীর্ত্তনান্তে সকলে বসিয়াছেন। আমি ও আমার ভাগিনা দুইখানি পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিতেছি।

ব্রজবালা বলিলেন—"দেখ, সখীদের উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি পদাকারে কীর্ত্তন করলে তাঁদের বর্ণনানুযায়ী শ্রীমুর্ত্তি যেন প্রকট হ'য়ে কীর্ত্তনকারীর সম্মুখে প্রকাশ পায়। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ গিয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর কি জানি কেন মনে হল একবার বাগান বাড়ীতে ললিতা সখীর কাছে যাই। তখন দুই তিনজন ভক্ত-সঙ্গে রওনা দিলাম।

যেতে যেতে কয়েকবার মনে হল সখীজীর মুখে একটু রূপের কথা শুনব! কিন্তু আমার মনের সঙ্কল্প কারও নিকট প্রকাশ করলাম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার, বাগানবাড়ীর বাহির থেকেই বাদ্যযন্ত্রের শব্দের সঙ্গে অতি উচ্চকণ্ঠের কীর্ত্তন শুনতে পেলাম। খুব তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি, ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির লোকে পরিপূর্ণ। কেবল শ্রীমন্দির হইতে নাটমন্দিরের খানিকটা পর্য্যন্ত একটু সরু রাস্তার মতন ফাঁক রয়েছে আর তারই পশ্চিমদিকে ললিতা সখী সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ব'সে কীর্ত্তন করছেন। দুই দিকে দুইটি মৃদঙ্গ, পশ্চাতে একটি হারমোনিয়াম ও কয়েকজন ভক্তের হাতে করতাল রয়েছে আর শ্রীমন্দিরের বারান্দার উপর পত্রপুষ্পাদিতে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীশ্রীযুগলকিশোর বিরাজমান।

নাটমন্দিরের পূর্ব্বদিকে ঝাউগাছের নিকট কিছুসময় দাঁড়িয়েছিলাম। সখীজী এক একটি পদ বলছেন আর সঙ্গীগণ সমস্বরে তার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ দোহারকি করছেন। কিছুসময় পরে তিনি উঠে ঐ ফাঁকা মতন স্থানটিতে নৃত্য আরম্ভ করলেন। এক একবার কটি দুলিয়ে নানা ভঙ্গি ক'রে নাচতে নাচতে শ্রীবিগ্রহের

দিকে যাচ্ছেন আবার সেইভাবেই নাটমন্দিরের দিকে আসছেন। চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন আনন্দোচ্ছ্বাস, ভক্তগণের মিলিত কণ্ঠে হরিবোল ধ্বনি, মৃদঙ্গ মন্দিরার গুরুগম্ভীর আওয়াজ আমাকে যেন কেমন বিহ্বল ক'রে ফেলল।

অতি অল্প সময় মধ্যেই আমার অন্তরের ভিতর যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। কখন যে আমি কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়েছি বা কতক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেছি, জ্ঞান হ'তেও তা ঠিক বুঝতে পারিনি।

কীর্ত্তনান্তে সখীজীর সঙ্গে একটু সময় আলোচনা ক'রে জানতে পারলাম যে, তাঁদের এখানে ঝুলনযাত্রা শুক্লা প্রতিপদ হ'তে আরম্ভ হয়ে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হয়। আমি যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন সপ্তমী কি অষ্টমী হবে। সখীজী অন্যান্য কথার পর বললেন — "এ সময় যে কয়দিন নবদ্বীপে থাকা হবে, সে কয়দিনই যেন দর্শন পাই।" আমি তাঁর অননুরোধে এবং যে আনন্দ সেদিন ভোগ করেছি তার লোভে দু-তিন দিন গিয়েছিলাম। তবে সবদিন কীর্ত্তন শোনা ভাগ্যে ঘটেনি। কোন কোনদিন সখীজীর সঙ্গে লীলাকথাপ্রসঙ্গ করেই চলে এসেছি। কি মধুর ভাব আর কি সুন্দর সুসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা প্রশ্নের সমাধান।"

ব্রজবালা এই কথার পর অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু তাঁহার প্রথম কথাটি "সখীদের উক্তি প্রত্যুক্তির পদ" কোথা হইতে সংগ্রহ করা যায় সেই চিন্তাই করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার প্রায় আট মাস পরে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি দাদার এক শিষ্যাকে লইয়া আমাকে নবদ্বীপ যাইতে হইয়াছিল। শিষ্যটি তাহার পূর্ব্ব পরিচিত একজনের আশ্রমে বড়ালঘাটের কাছে রহিলেন আর আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত বাগানবাড়ীতেই পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

দিদির সময় হউক না হউক, তিনি বসিতে পারুন না পারুন ভক্তগণ বৈকালে তাঁহার ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দার আসিয়া বসিবেনই। তারপর যখন নাটমন্দিরে পাঠ বা কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখন যাঁহার ইচ্ছা হয় উঠিয়া যান। আজ বৈকাল চারটা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি দিদি আসিতেছেন না। রাণাঘাটের কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন, দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইবেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল দিদি বিশেষ কি প্রয়োজনে উপরে গিয়াছেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সহিত আমরা বসিয়া নিজ নিজ খুশিমত আলোচনা করিতেছি। নন্দদাদা একখানি চিঠি হাতে করিয়া দিদিকে দিতে আসিয়া নীচে দেখা না পাইয়া বোধ হয় উপরে যাইতেছিলেন, এমন সময় দিদি আসিয়া উপস্থিত। দিদির হাতে একখানি ভাঁজ করা খাতা। দিদির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডবৎ প্রণাম, কুশল জিজ্ঞাসা, পরিচয় প্রদান ও গ্রহণের ঘুম পড়িয়া গেল। যাহা হউক, কেবলমাত্র দিদিকে দর্শন করিতে

যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দর্শন করিয়াই চলিয়া গেলেন। অন্যান্য যাঁহাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না অথচ যখন আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও একটু সময় থাকিয়াই বিদায় লইলেন। অবশেষে আমরা যে কয়েকজন রহিলাম, দিদির আসনের কাছাকাছি মিলিত হইয়া বসিলাম। নন্দদাদা দিদির নিকট বসিয়া পত্রখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, অসময়ে দিদির উপরে যাওয়া এবং হাতে খাতা, মুখের ভাব অত্যন্ত প্রফুল্ল; —এই সব দেখিয়া অন্য কে কি মনে করিতেছেন জানি না, আমার কেবলই মনে হইতেছে যে, নিশ্চয়ই কোন কিছু নূতন বস্তু লাভ হইয়াছে। কিছু বলিতেও পারিতেছি না, কিন্তু মনের মধ্যে বলি বলি ভাব তোলপাড় করিতেছে। সুযোগ জুটিয়া গেল। রোগা রমণ (খোলবাদক) কোথা হইতে আসিয়া দিদিকে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিতেই দিদি বলিলেন—"কি রকম বাবাজী মশায়! খবর কি?" রমণ একটু তোত্‌লা ছিল। "খবর ভাল" এই কথাটি বলিতেই বেশ একটু সময় লইল। আর বিশেষ কিছু না বলিয়া "আচ্ছা এখন যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে, পরে কথা হবে" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া দিদি খাতাখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠের পূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাগুলি পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না। কারণ, আমার নোটকরা খাতার ঐ স্থানটি আমার অসাবধানতায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দিদি পাঠ করিলেন—

ললিতা— হেমকমলিনী রাইবিনোদিনী
নব মধুকর কান।
নয়ন চষকে আশকে আশকে
করিতেছে মধুপান।।

বিশাখা— রাকাশশধর শ্যামল সুন্দর
রাধিকা চকোরী তায়।
উড়িয়া উড়িয়া সুধা পিয়া পিয়া
রসেতে ভাসিয়া যায়।।

চিত্র—(রাই-এর) নয়ন কমল শ্রুতি উতপল
হেরিয়া আনন্দ ভরে।
রসিক ভ্রমর নবনটবর
কাঁপিছে রসের ভরে।।

চম্পকলতা—নবজলধর রসে ঢর ঢর

রসিকশেখর রায়।
(হেরি) নব সৌদামিনী রাই বিকলিনী
বলে জড়াইতে চায়।।
রঙ্গদেবী—(রাই-এর) অধর যুগল পক্ক বিম্বফল
কাঁপিছে রসের ভরে।
নিরখি নিরখি শ্যাম শুকপাখী
ধৈরজ ধরিতে নারে।।
সুদেবী—(শ্যামের) বাহুসুবলিনী করীকর জিনি
দুলিতেছে অনুরাগে।
হেরি বিকলিনী রাইকমলিনী
সরস পরশ মাগে।।
তুঙ্গবিদ্যা— জিনি করী অরি ক্ষীণকটি গোরী
কিঙ্কিণী তছুপরি।
(হেরি) মত্তমাতঙ্গ শ্যামল ত্রিভঙ্গ
ভয়ে কাঁপে থরহরি।।
ইন্দুরেখা—(শ্যামের) নাভিসরোবর বক্ষ পরিসর
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি।
(ঐ দেখ) হিয়া দুলু দুলু আঁখি ঢুলু ঢুলু
কাঁপিছে কিশোরী গোরী।।
এতেক বচন শুনিয়া দুজন
আনন্দে মগন ভেল।
দুবাহু পসারি আপনা পাসরি
দুহুঁ দোঁহা কোলে নিল।।

দিদি পাঠ শেষ করিয়া খাতাখানি মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ঐটি লিখিয়া লইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন আর কিছু বলিলাম না। পরে দিদির অনুমতি লইয়াই পদখানি লিখিয়া লইয়াছিলাম। আজ প্রসঙ্গক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

গোবিন্দ দাদার শিক্ষা

গোবিন্দদাদার সহিত দিদির প্রথম মিলন শ্রীধাম পুরীতে। দিব্যদৃষ্টিতে গোবিন্দদাদা দিদির ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তখনকার বেশভূষা আচার-ব্যবহার ভিন্ন রকম দেখিয়াও কেমন যেন মুগ্ধভাবেই দিদিকে নিজের

কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। দিদির তখন ব্রহ্মচারী বেশ, নাম জিজ্ঞাসায় জানিলেন—গোপালকৃষ্ণ। যদিও দিদি শেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রথম দর্শনে কথোপকথন ছলে খুবই তর্ক-বিতর্ক" হইয়াছিল। তখনকার বেশ, তখনকার ক্রিয়ামুদ্রা, জীবনযাত্রা নির্বাহের নিয়ম-কানুন বা আহারাদি নানা বিষয় লইয়াই এক এক সময় গোবিন্দদাদার সহিত দিদির ভীষণ বাক্‌যুদ্ধ বাধিত। শেষে নবদ্বীপদাদার মধ্যস্থতায় মিটমাট হইয়া যাইত।

এই গোবিন্দদাদাই দিদিকে হাতে ধরিয়া খুঁটিনাটি সেবার কার্য্য সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। নবদ্বীপদাদার অপ্রকটের পরও গোবিন্দদাদাই শ্রীগুরুসেবা কিভাবে করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবের কোন্ সময় কোন্ জিনিসটি প্রয়োজন হইতে পারে, কোন সেবার একটি কিভাবে রন্ধন করিলে প্রাণকোটী সর্ব্বস্ব শ্রীমৎ রাধারমণদের তাহা আনন্দে গ্রহণ করিবেন, গোবিন্দ দাদা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া দিদিকে দিয়া তাহা প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন।

গোবিন্দদাদা নিজে খুব ভাল রন্ধন করিতে পারিতেন। নানাপ্রকার পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে দাদা সিদ্ধহস্ত; শুধু, একজন সহকারী চাই। দিদিকে পাইয়া দ্বিগণে উৎসাহে সমস্ত কার্য করিতে লাগিলেন। অকপট-ভাবে সেবার সহকারী হওয়ায় গোবিন্দদাদার রন্ধনপ্রক্রিয়া, সেবাপরিপাটী, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবায় অসাধারণ প্রিয়তা, দীন দুঃখী পতিত কাঙ্গালের প্রতি সুস্নিগ্ধ ব্যবহার-কৌশল সমস্তই যে পরবর্তীকালে দিদিতে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কুলদাবাবুর রাধাতত্ত্ব

একদিন হঠাৎ সুপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য ধর্মবক্তা পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি. এ. মহাশয় সমাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। দিদি অধম লেখকের সহিত "নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদ-খানির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কলিকাতা বৌবাজার-নিবাসী নবগোপাল দে, চাংড়িপোতার বলাই ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুলদাবাবুকে দেখিয়াই দিদি "আসুন আসুন" বলিয়া নিজ হাতে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন। কুলদাবাবু দণ্ডবৎ করিয়া বসিলে দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আসা হয়েছে? সব কুশল তো ?"

কুলদাবাবু—আজই এসে পৌঁছেছি দিদি। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে এক ধর্ম সভায় বক্তৃতা ছিল। তাই রাত্রে সেখানে ছিলাম, ভোরে সেখান থেকে এখানে এসেছি। শরীর তো ভালই আছে দিদি ! মন বড় চঞ্চল। কি ক'রে কি করা যায় বল দেখি ?

দিদি—বেশ লোককে প্রশ্ন করছেন; আমি আদার ব্যপারী, জাহাজের খবর নিয়ে কি করব ? আমি হলাম আপনাদের বাবাজী মহাশয়ের মঠের ভাঁড়ারী। আমার কাছে চাল, ডাল, তেল, নুনের খবর চান বলতে পারব; ওসব সাধনভজনের কথা শাস্ত্র সিদ্ধান্তের ব্যাপার, ওসব তো আপনাদের একচেটে, ওসব আপনারা জানেন।

কুলদাবাবু—দেখ দিদি! যারা তোমার কোন খবর জানে না তাদের তুমি ঐ সব কথা ব'লে বিদায় করতে পারবে, আমি তোমার ওসব কথায় ভুলব না। যাক্ এখন তুমিও ব্যস্ত আছ, আমিও পথশ্রান্ত। অন্য এক সময় এসে দেখা করব, একটু বিশেষ দরকার আছে। এবার কৃষ্ণনগরে বক্তৃতার বিষয় ছিল রাধাতত্ত্ব। ওখানে যেসব কথার আলোচনা হয়েছে, আমার সঙ্গী প্রকাশচন্দ্র তা নোট ক'রে এনেছে। বড় ইচ্ছে এ বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে বসে একটু আলোচনা করি।

দিদি—এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। প্রাণেশ্বরীর কথা শোনাবেন, তাতে আমার আপত্তি করবার কি কারণ আছে।

কুলদাবাবু—তবে আস্ছে কালই বৈকালের দিকে এসে বসা যাবে, এখন যাই। কুলদাবাবু চলিয়া গেলেন, আমরাও সন্ধ্যারতির পরে "আবার আসব" বলিয়া নবগোপালদাদার সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী চলিলাম। সেদিন সেখানে চাঁপাঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল গান ছিল।

পরদিন যথাসময়ে আসিয়া কুলদাবাবু, দিদির সহিত রাধাতত্ত্ব যেভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই পরে কুলদাবাবু পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিদি আলোচনা প্রসঙ্গে যে যে স্থানে যেসব সিদ্ধান্তদি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন, কুলদাবাবু পরে আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গেই কুলদাবাবু বলিয়াছিলেন—"অগাধজলসঞ্চারী বিকারুন তু রোহিত। গন্ডুষজলমাত্রেণ সফরি ফর্ফরায়তে।"

আমরা দু-চারখানা পুঁথি পড়েই মনে করি খুব পড়েছি। কত লম্ফঝম্ফ করি। আর দিদি লীলা-তত্ত্ব-সমুদ্রের অতলতলে তলিয়ে কত মূল্যবান মণিমাণিক্য পেয়েও কোনরূপে হৈ হৈ না ক'রে চুপচাপ ব'সে আছেন। ধন্য দিদি, ধন্য তুমিই ধন্য, তোমার সাধনাই ধন্য।

দিদির অনুভবে লীলাবর্ণন

কঠোর সাধনাদ্বারা সাধক কিছু কিছু অসাধারণ শক্তি লাভ করেন। অনেকে বলেন ইহা অষ্টসিদ্ধির একটি। সাধারণ ভাষায় ইহাকে সিদ্ধাই বলে। অনেক

ক্ষেত্রে এই সিদ্ধাই-ই সাধকের ইষ্টসাধনে বিঘ্ন আনিয়া সর্বনাশ করিয় থাকে। কেমন করিয়া সর্বনাশ হয় তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা।।
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অস্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ।।"—ভাঃ ১১।১৫।৪-৫

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কাম্যপ্রাপ্তি—এই আটটিকেই সাধারণতঃ অষ্টসিদ্ধি বলে। এতদ্ব্যতীত গুণহেতু সিদ্ধিও অনেকগুলি আছে।

"অনুর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়-প্রবেশনম্।।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্প-সংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ।।
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ।।" —ভাঃ ১১।১৫।৬-৮

অর্থাৎ অনূর্ম্মিমত্ত্ব—ক্ষুৎপিপাসারাহিত্য, দূরশ্রবণ, মনোজব অর্থাৎ মনের ন্যায় দ্রুতগতিতে যথেচ্ছাগমন, পরকায়প্রবেশ, স্বচ্ছন্দ মত্যু, অপ্সরাগণের সহিত দেবগণের ক্রীড়ানুদর্শন, সঙ্কল্পসিদ্ধি, অপ্রতিহতগতি, ত্রিকালজ্ঞত্ব, অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীত উষ্ণতাদিতে ক্লেশ বোধ না করা, পরচিত্তাদির অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অপরের মনের কথা জানা, অগ্নি সূর্য্য জল ও বিষাদির ক্রিয়া-সংরোধ ইত্যাদি।

এই সকল শক্তির যে-কোন একটি বা কয়েকটি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা প্রয়োগ করিবার দুর্ব্বার বাসনা সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। বুঝিতে দেয় না যে, ইহাই তাহার সাধনার চরম ফল নহে। সে তখন ঐ সিদ্ধির সামান্য সামান্য কাজ দেখাইয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুগ্ধ ব্যক্তি তখন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া নানাপ্রকার কায্যের জন্য অননুরোধ উপরোধ করিতে থাকে। দুর্দ্দৈব ঘটিলে এইখানেই সাধকের সাধনা শেষ হইয়া যায় এবং সে তখন অসম্ভবকে সম্ভব করাইয়া, সাদা কথায় ম্যাজিক দেখাইয়া তাহার ইষ্ট আরাধনার পথ বন্ধ করিয়া দেয়। কৃচিৎ দু-একজন এই দুর্ব্বার লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার মোহ এড়াইয়া সাধন পথে অগ্রসর হয়। ইহারাই মহাপুরুষ।

এই জাতীয় মহাপুরুষদিগের জীবনেতিহাস লেখা শুধু তাঁহার জীবনের

গোটাকয়েক স্থুল ঘটনা বিশ্লেষণের দ্বারাই পূর্ণ হয় না। মর্ত্ত্যবাসীর মৃত্যুভয়নিবারক অমৃতসাধনার ইঙ্গিত, ঘনঘোর অন্ধকারের বিরুদ্ধে উন্নত উজ্জ্বল আলোর প্রচার ও কি করিয়া একের আদর্শে অপর দশজনের মঙ্গল হইতে পারে তাহার কিছু জীবনীর মধ্যে থাকা দরকার। মানুষ যে শক্তির এক কণার অধিকারী হইয়া লম্ফঝম্ফ করে, সে শক্তি কাহার? কোথা হইতে কেমন করিয়া তাহা লাভ হইল? এই সকল বিষয় বিশেষ বিচার দ্বারা জানিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ কিভাবে কিরূপ আচরণ দ্বারা লব্ধভাব রক্ষা হইতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ললিতা দিদিকে প্রায়ই বলিতে শুনিতাম, "যথাবস্থিত দেহকে লক্ষ্য না ক'রে সর্ব্বদা সিদ্ধদেহভাবনার লীলাগত থাকবার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। যথাসাধ্য অষ্টকাল লীলাস্মরণ বিশেষ প্রয়োজন। শরীরগত না হ'লেও অন্ততঃ বাক্যে মনে নিজ ভাবগত থাকবার জন্য চেষ্টা করাই প্রধান সাধন। প্রাকৃত বিষয়ে অনাসক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করা দরকার। মায়া সম্বন্ধ হতে দূরে থেকে পরমার্থ সম্বন্ধ জাগাবার চেষ্টা করাই উচিৎ। শারীরিক না হ'লেও মানসিক ভাবে মায়ার রাজ্য হতে পৃথক ভাবে অবস্থান করার চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সাল ৩০শে শ্রাবণ এক ভক্তকে পত্র লিখিতে লিখিতে অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন— "....সর্বদা নিজের অভীষ্ট দেবের কথা স্মরণ, মনন, ধ্যান-ধারণায় থাকিও। হাতে সংসারের কাজ করিয়া মনকে অন্য রাজ্যে রাখিতে অভ্যাস করা ভাল। এখন ঝুলনলীলার সময়; দিবারাত্রে ঝুলন-কেলিবিলাস যাহা আস্বাদন করিয়াছ, তাহা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া, পল্লবিত করিয়া, শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি করিয়া, কলাচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রাণের প্রাণ যুগল- কিশোরের এবং সঙ্গিনীদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিবে। কখনও বা সঙ্গিনীদের পক্ষে থাকিয়া রসকলাচাতুর্য্যে প্রাণেশ্বরীকে লজ্জিতা, বিচলিতা, উত্তেজিতা করিতে চেষ্টা কর; আবার কখনও বা রসকলাকটাক্ষে নাগরেন্দ্রকে উত্তেজিত করিয়া বাক্‌চাতুর্য্যে পরাস্ত করিয়া প্রাণেশ্বরীর আনুগত্য স্বীকার করাও, কখনও কামকলাপরিপূর্ণ কটাক্ষে যুগলকিশোরকে বিলাসরসসাগরে ডুবাইয়া দর্শনস্পর্শনে সেবাপ্রসঙ্গে থাকিয়া সঙ্গিনীদের আনন্দবর্দ্ধন করতঃ জীবন ধন্য কর। বৃথা সময় নষ্ট করিও না। স্মরণ মনন দ্বারা কালাতিপাত করিবে। মঙ্গলময় শ্রীগুরুদের যখন যেভাবে যেখানে রাখিয়া সুখী হন, তাহাতেই সুখী হওয়া উচিত। ইতি

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের দিদি"

শ্রীমৎস্বামী গুরুগৌরবানন্দ (গৌরগোপাল গোস্বামী) মহারাজ বলিতেন—"আমার বাড়ী নবদ্বীপে হইলেও দিদি কখনও সেখানে যান নাই, অথচ আমার বাড়ীর কোথায় কি হইতেছে সমস্তই আমাকে বলিতেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতাম—"দিদি! আপনি কেমন করিয়া এসব জানিলেন?' দিদি রহস্য করিয়া বলিতেন—"আমি যে গভীর রাত্রে সারা নবদ্বীপ ঘুরে বেড়াই।" যাঁহারা জানেন দিদি নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন ছাড়া সমাজবাড়ীর বাহিরে কোথাও যান না, তাঁহারাও দিদির এই দূরদর্শন বিষয় চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্য হইতেন।"

পাঠকগণ কিছু, পূর্ব্বেই অষ্টসিদ্ধির আলোচনায় গুণহেতু সিদ্ধি সম্বন্ধে শুনিয়াছেন। এই সিদ্ধাইকেই চরমপ্রাপ্তি মনে না করিয়া যিনি অগ্রসর হইতে পারেন তিনি ইষ্টপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকের মুখে শুনিয়াছি —'অষ্টসিদ্ধি নবনিধি নাছদুয়ারে গড়াগড়ি যায়।"

দিদি সর্ব্বদাই লীলাস্মরণে থাকিতেন, কাজেই কখন কোথায় কি লীলা হইতেছে তাহার প্রতিবিম্ব সহজেই তাঁহার সুনির্ম্মল চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইত। বাংলা ১৩৪২ সালের ১২ই পৌষ পঙ্কজিনীকে পত্রে লিখিতেছেন—

"কল্যাণীয়া প্রীতিমঞ্জরী (দিদি পঙ্কজিনীকে প্রীতিমঞ্জুরী বলিয়া ডাকিতেন) প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে শ্রীসূর্য্যকুণ্ড হইতে আমরা যাবটে আসিতেছি। আজ মধ্যাহ্নে এক অপূর্ব্ব ঘটনা। প্রাণেশ্বরী সূর্য্যকুণ্ডে পূজার সম্ভার রাখিয়া শ্রীকুণ্ডের তীরে বকুলতলায় উৎকণ্ঠিতা। বড়ই কাতরা দেখিয়া শ্রীললিতাদিদি ও বৃন্দাদেবী কৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিকে নাগরেন্দ্র রাই বিরহে ব্যস্তসমস্তভাবে মধুমঙ্গলের সঙ্গে রাইমিলনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে শ্রীগিরিরাজের নিকট দিয়া শ্রীকুণ্ডের দিকে আসিতেছেন। এমন সময় পদ্মা এবং চন্দ্রাবলী জোর করিয়া নাগরেন্দ্রকে গিরিরাজের একটি গুহায় লইয়া গেলেন। পদ্মা চন্দ্রাবলীর সহিত শ্যামসুন্দরকে রাখিয়া মধুমঙ্গলকে লইয়া বাহিরে আসিলে মধুমঙ্গল অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। একটি বৃক্ষতলে ললিতা এবং বৃন্দাদেবীকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, আজ আমাদের যুথেশ্বরীর সৌভাগ্যের কথাটা ললিতাকে বলিতে হইবে। এইরূপে বিচার করিয়া ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ললিতে! চম্পামে তো তিনগুণ হ্যায়—রূপ, গুণ, সুবাস। ক্যা এক অপগুণ হ্যায় যো ভ্রমর না আতে পাশ।।" অর্থাৎ চম্পকবরণী শ্রীরাধাতে তিনটি গুণ—রূপ, গুণ এবং সুগন্ধ। কিন্তু মধু না থাকাতে ভ্রমররূপী শ্যামসুন্দর পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীতে মধুপানে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। শুনিয়া চতুরিণী ললিতা বলিলেন—"পদ্মে! চম্পামে তো বিচিত্র গুণ হ্যায়—রূপ, রস, গুণ, সুবাস। হর ফুল জানা ভ্রমর কো কভী না লেতে পাশ।।" অর্থাৎ পদ্মে। চম্পকবরণী আমার প্রাণেশ্বরীতে

এত গুণ, রস, রূপ, সুগন্ধি ও গরব রহিয়াছে যে, অন্য ফুলের মধুপান করে যে ভ্রমর, সে বহুবার প্রার্থনা করিলেও প্রাণেশ্বরী তাহাকে নিজের কাছে লয় না।

শুনিয়া পদ্মার মুখ কালো হইল। ললিতাদেবী অন্যদিকে চলিয়া যাইতেই মধুমঙ্গলের সঙ্গে দেখা হইল। তখন বৃন্দাদেবী বলিলেন—বটো! তোমার সখাকে চন্দ্রাবলীর সহিত মিলন করাইলে, এদিকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যে অতিশয় কাতরা। বটু বলিল—দেবি! সখাও রাইবিরহে অতিশয় কাতর হইয়া আমার সহিত শ্রীকুণ্ডে যাইতেছিলেন। উহারা জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইল, কি করে! আচ্ছা আমি দেখি। এই বলিয়া সেই গুহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জোরে চিৎকার করিতে লাগিল—"আরে বড় বিপদ, কংস-প্রেরিত এক প্রবল অসুর আসিয়া গোবৎস সব ঘিরিয়া লইয়াছে, গোপবালক ব্যাকুলভাবে ভাই কানাই বলিয়া কাঁদিতেছে। বলরামচন্দ্র একা কিছুই। করিতে পারিতেছে না। সখা যে কোথায় গেল আমি তো খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান। আর উপায় নাই।" শুনিয়া নাগরেন্দ্র মনে মনে বটুকে ধন্যবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে চন্দ্রাবলীর ক্রোড় হইতে উঠিয়া "প্রিয়ে চলিলাম" বলিয়া একেবারে ছুটিয়া কুসুমসরোবরের নিকট দিয়া শ্রীকুণ্ড অভিমুখে যাইতেছেন। এমন সময় বৃন্দা ও ললিতাকে দেখিয়া কাতরভাবে প্রাণেশ্বরীর সহিত মিলন প্রার্থনা করায় ললিতা নাগরেন্দ্রের প্রাণের অবস্থা বুঝিয়া শ্রীকুণ্ডে বকুলতলায় প্রাণেশ্বরীর সহিত মিলন করাইয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন করিলেন ও হইলেন। ইতি—

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের স্নেহের দিদি।"

ললিতাদিদির এইভাবে লীলাভোগ হইত। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এজন্য তিনি নিজ সাধন-গৌরবে কখনও আত্মবিস্মৃত হইতেন না। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ জনকেও তিনি বলিতেন—'প্রাণেশ্বরী দয়া করিয়া দাসীকে অযাচিতভাবে যাহা দান করেন, তাহার তুলনা দিবার ভাষা নাই। তাঁহার কৃপার জয় জয়কার"। ১৩৪০ সালের ২৫ শে ভাদ্রের পত্রের মধ্যেই এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অষ্টকালীয় স্মরণ যথাসাধ্য সাধন করিও, বাহ্যিক দেহে মায়াস্পর্শ থাকিলেও অন্তশ্চিন্তিত নিজ সিদ্ধদেহে যেন তাহার দাগ না লাগে।

শ্রীভগবান লীলাময়। তাঁহার লীলা নিতা। একবার হইয়াই যে শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। ত্রিকালসত্য তাঁহার লীলা। তাই তিনিও নিত্য, তাঁহার লীলাও নিত্য। পরমহংসদেব সামান্য কলাগাছের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন—"কলাগাছের

খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। খোল থাকলেই যেমন মাজ আছে, তেমনি মাজ থাকলেই খোল আছে বুঝেতে হবে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা বুঝায়, আবার লীলা বললেই নিত্যত্ত বুঝায়।"

দিদি নিত্যলীলা সম্বন্ধে মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার প্রতিটি আচরণের মধ্য দিয়া, সেবার মধ্য দিয়া লীলার নিত্যত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা ভ্রান্ত, চঞ্চলচিত্ত, তাই তাঁহার উপদেশ সকল সময় ধরিতে পারি নাই। একবার দিদির শরীর খুবই অসুস্থ হইয়াছিল, একটু সুস্থ হইয়া একজনকে পত্র লিখিতেছেন—

"..... প্রথম কয়েকদিন ফণী হরিদাস প্রভৃতি তিন-চারজনের জন্ম লইয়া বড়ই ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। তৎপর যেদিন ইন্দুদিদির পত্র পাই সেইদিন আমার ১০৪ জ্বর। মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় রাধারাণী অযোগ্যা দাসীকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না, আবার এই অযোগ্য দেহ লইয়াই রহিলাম। অবশ্য কৃপাময়ী আমাকে অন্য কোনই দুঃখে রাখেন নাই, কেবলমাত্র এই অযোগ্য দেহের জন্যই প্রাপ্ত বস্তু ভোগ করিতে পারিলাম না। তোমাদের দুই ভগ্নীর হৃদয়ের একনিষ্ঠভাব দেখিয়া আমার ঈর্ষা হয়। মনে ভাবি, আমাকে উহারা কোন গুণে বড় বোন বলে? আবার ভাবি প্রভো! উহাদের হৃদয়ের অবস্থা আরও বড় হউক; উহারা রঙ্গদেবী সুদেবীর ন্যায় শ্রীমতীর প্রেমপাত্রী হউক, আমি তখন জোর করিয়া উহাদের নিকট হইতে প্রেমধনের ভাগ লইব।

ইতি—

তোমাদের স্নেহের অযোগ্যা দিদি

সখীগণ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে যাইয়া দিদি নানা প্রকার শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়া শেষে লিখিয়াছেন—"সখী অনেক প্রকার। তন্মধ্যে প্রিয় নর্ম্মসখী তিনপ্রকার— সেবাপরা, রসপরা ও বিলাসপরা। সেবাপরা সখীদিগের নাম মঞ্জরী। বিশেষ অন্তরঙ্গা। রসপরা শ্রীললিতাদি। বিলাসপরাগণই যুথেশ্বরী নামে খ্যাতা। তন্মধ্যে শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা ও অমলা প্রভৃতি কয়েকজন প্রধানা। উহারা সম্পূর্ণ শ্রীমতির অনুগা এবং প্রাণসমা (রসোদ্গারাদির অধিকারিণী) হইয়াও সময়ে সময়ে নিজ কুঞ্জে প্রাণেশ্বর-সহ মিলনসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

ললিতাদি সখীবৃন্দ যুথেশ্বর সমগুণা হইলেও এবং প্রাণেশ্বর কর্ত্তৃক বিলাসাদির জন্য প্রার্থিতা হইলেও একমাত্র শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ভিন্ন অন্য জানেন না বা নিজ নিজ দেহ দ্বারা রসিকশেখরের অভিলাষ পূর্ণ করিতে যত্নশীলা হয়েন না। তবে যে তাঁহাদের সহিত সময়ে সময়ে বিলাসাদি দেখা যায় সে কেবল

প্রাণেশ্বরীর ইচ্ছা বা সুখ-বিধানের নিমিত্ত। অর্থাৎ ইহারা একমাত্র প্রাণেশ্বরীর সুখে সুখী, তাঁহার বিলাসে ইহাদের যতদূর আনন্দ, নিজ বিলাসে তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

এই জাতীয় হৃদয় না হইলে উহাদের গণে গণ্য হওয়া যায় না। সুতরাং এই ভাব দুইটি (রসপরা ও সেবাপরা) আমাদের স্মরণীয় বা আচরণীয়। আর অধিক কি লিখিব—যথার্থই বলিতেছি, এবার তোমাদের সহিত লীলাপ্রসঙ্গ বা ইস্ট-গোষ্ঠীর সময়টা উপস্থিত হইলে আমাকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়া ফেলিতেছে। বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ সময়টা আজ পর্যন্ত মনটাকে স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমরা যেমন মনকে সহজে স্থির করিতে পার, আমাকে আশীর্বাদ কর যেন সহজে তোমাদের মত হইতে পারি। জয়গুরু জয়গুরু।

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের স্নেহের দিদি

১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সরযূকে অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন—"এখন স্বামিনী একাগ্রচিত্তে প্রাণ-বল্লভের জন্য নানাবিধ রন্ধন করিতেছেন। এমন একতান যে—"দোলত কুণ্ডল লোলত অঙ্গ, কুচযুগ কঞ্চুক ভেল উচঙ্গ বসন ভূষণ সব আনত ভেল।' প্রতি অঙ্গজ্যোতিতে রন্ধনভবন উজ্জ্বল হইল। লোভী কটি গবাক্ষে নয়ন দিয়া প্রাণভরিয়া দর্শন করিয়া পরণ লাগি অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে কম্পিত কলেবরে চোরের ন্যায় ভীত হইতেছে। প্রাণেশ্বরী বিশাখার চাতুরীতে গবাক্ষে যাহা দেখিলেন বা মনে যে ভাবের উদর হইল, নয়নে নয়নে উভয়ে যে কথা ও প্রাণের ব্যথা বলাবলি করিলেন, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার। ইতি—

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের দিদি

পাঠকগণকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে সবিনয় অনুরোধ করি যে, কতদূর স্মরণ মননে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে এইভাবে লীলা প্রত্যক্ষ হয়। সাধক সাধনা করেন প্রাকৃত রাজ্যে কোনও স্থানে আসনে বসিয়া। কিন্তু তাঁহার চিন্তা হয় অপ্রাকৃত রাজ্যের অপ্রাকৃত লীলার। আমরা তো কোন্ ছার, অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লেখকও এই স্থানে আসিয়া লেখনীকে সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মঠ মন্দিরে ঠাকুর বসাইয়া খুব জাঁক-জমক তাঁহার উৎসবাদি করিয়া আমরা মনে করি খুব কিছু করিলাম। কিন্তু যে উৎসবপৰ্ব্ব সমাধা করিলাম, তাহার

কোনরূপে ছাপ চিত্তে লাগিল কিনা সে বিষয়ে আমরা আদৌ চিন্তা করি না। নবদ্বীপে সমাজবাড়ীতে সমস্ত উৎসবপর্ব্বই দিদি যথাযথভাবে করিতেন। তাঁহার সুনির্ম্মল চিত্তদর্পণে উৎসবপর্ব্বের চিত্র এমন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হইত যে, বর্ণনভঙ্গীতে মনে হইত যেন লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ১৩৪৩ সাল ২৮শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীঝুলনযাত্রা-উৎসব সমাপনান্তে দিদির সঙ্গী সরযুকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি পাঠকগণ আস্বাদন করুন। দিদি লিখিয়াছেন—

'স্নেহের ভগ্নী সরযূ। আশা ছিল না যে এবার ঝুলনে এত আনন্দ দিবেন। ১৪ দিন ঝুলন হইবার কথা কিন্তু এবার তিথির গোলমালে ১৫ দিন হইল। পূর্ণিমার পরদিন রাইরাজা। প্রাণেশ্বরীর অপার করুণা, লাড়লী কুঞ্জে সন্ধ্যার সময় ১০ দিন এবং বৃন্দাবনে ৫ দিন; কি যে আনন্দের পাথার বহিয়া গিয়াছে তাহা বলিবার ভাষা নাই। অত মাতামাতি আনন্দের পর একবার যাবটে গিয়াছিলেন। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে গত ষষ্ঠীর দিন শ্রীনন্দালয়ে আসা হইয়াছিল। প্রাণেশ্বরীর জন্মাষ্টমী এক মাস পিছাইয়া গেল বলিয়া শ্রীযুক্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণী নন্দালয় হইতে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করার মা বলিলেন- আমার তো কোনই আপত্তি করিবার নাই, তবে লালার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অন্ততঃ ১০/১৫ দিন পূর্ব্বে উহাকে ত' ছাড়িয়া দিতে হইবে!

মায়ের বুদ্ধির কৌশলে পড়িয়া বুড়ি বলিল—আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমি ভাদ্রমাসে ত' দিতে পারিব না, কাজেই তুমি এখন হইতেই লইয়া যাও। সুতরাং গতকল্য বৈকালে নন্দালয় হইতে বর্ষাণে আসা হইল। এখন এক মাস মায়ের আদরে আবদারী দিদিকে লইয়া আমরা পরমানন্দে বর্ষণে কাটাইব।

নন্দালয়ে যে কয়দিন থাকেন, ঐ দিন নানারূপে ব্যস্ত থাকার জন্য সূর্য্যকুণ্ডে বড় যাওয়া হইয়া উঠে না, নিম্নগ্রামস্থ সূর্য্যমন্দিরেই সূর্য্যপূজা হয়। সূর্য্যপূজা উপলক্ষ্যে প্রাণবঁধুর সহিত মিলন হওয়া অসম্ভব। দর্শন স্পর্শন তা' সর্ব্বদাই হইতেছে, মাত্র বৈকালে ললিতাদেবীর কৌশলে স্নানের ছলে পাবন সরোবরের তীরে বনমধ্যে মিলন প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইত্যাদি।"

অনুভব অনুভবই। কিন্তু দিদির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজে অনুভব করিয়া সঙ্গীদের তাহার আস্বাদ না দিয়া পারিতেন না। যখন যে ভাবের যে লীলার যতটুকু আভাস চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গীদের সঙ্গে পরমানন্দে ভোগ করিয়াছেন। ভাবুক কবি প্রাণের আবেগে প্রাণকান্তের নিকট অকপট প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন—

"ভুলায়ে রেখ না ভবে ভাবে ভাবে ভাবাও ভবে
ভাবনিধি হৃদয়বল্লভ!
সুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি।
তুমি আমার আমি তোমার আর সকালি তোমারি।।

আমরা ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হই, তব, ভাবনার শেষ হয় না। কি ছাই মাথামুণ্ডু যে ভাবি অনেক সময় তাহাও ভাবিয়া পাই না। দিদি কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন—"ভাবিতে হয় তো এমন ভাবনা ভাব, যে ভাবনার শেষ নাই অথচ অবসাদও নাই। স্বাদু স্বাদু পদে পদে' যত ভাবিবে ততই আনন্দ, ততই ভাবিবার জন্য আগ্রহ বাড়িবে।"

কথাটা তখন তত তলাইয়া ভাবি নাই। মধ্যে মধ্যে মনের মধ্যে সেইদিন হইতে তোলপাড় করে। আর থাকিতে না পারিয়া শেষে দিদির কাছে মনের কথাটা লিখিয়া পাঠাইলাম। দিদি কৃপা করিয়া ১৩২৮ সাল ১লা আশ্বিন তাহার জবাবে লিখিয়াছিলেন—

"....পত্রে মনোভাব অবগত হইলাম। আর কি চিন্তা করিবেন ? চিন্তা করিতে হয় তো শ্রীশ্রীরাধারাণীর লীলা, রূপ গুণ চিন্তা করুন। সর্ব্বদা মানসে ব্রজে বাস করিয়া অষ্টকাল সেবায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করুন নিকুঞ্জেশ্বরী আজ্ঞাসেবা গ্রহণপূর্ব্বক নিকুঞ্জরাজের শ্রীকরাকর্ষণে তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলস্থিতা হইয়া আনন্দচিন্ময় রসভাবিতা হউন। নাগরের শ্রীমুখচন্দ্রে তৃষিতা চাতকীর ন্যায় নয়নযুগল অর্পণ করতঃ সুখের পাথারে ডুবিয়া যাউন। নিত্য নূতন ভাবে, নূতন স্থানে, নূতন বেশভূষায় ভূষিত যুগলকিশোরের মিলনানন্দ উপভোগ করুন। সখী মঞ্জরীগণের পরম প্রেষ্ঠা হউন। শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগামিনী হউন। দিন দিন অপ্রাকৃত আনন্দবসুধাপানে পরিতৃপ্তা ও স্নিগ্ধা হইবেন। স্থূলদেহও সুস্থ হইবে। বাজে বিষয় ভাবিয়া দুর্লভ মনুষ্য- জীবনের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর কাল কাটান উচিৎ কি?" ইত্যাদি আরও অনেক কথা লিখিয়াছিলেন।

কোনরূপে সঙ্কট উপস্থিত হইলে আমরা নানাপ্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করি। হায় হায়! কি হইবে, কেমন করিয়া এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইব—এইরূপে নানা ভাবনা করিয়া সম্মুখে যাহা পাই তাহাই অন্ধবিশ্বাসের বলে আঁকড়াইয়া ধরি। মুর্শিদাবাদ হইতে কোন ভক্ত একবার এই ভাবের সঙ্কটে পড়িয়া দিদির শরণাপন্ন হইলে দিদি তাহাকে অভয় দিয়া লিখিয়াছিলেন—

"... তোমাদের পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এখন একটু ধৈর্য ধরিবার প্রয়োজন। নিশ্চয়ই জানিবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ভিন্ন মানুষের কোনই হাত নাই। যদিও কর্ম্মফলানুসারে জীবের ভোগাভোগ হইয়া থাকে সত্য কিন্তু তাহাও মঙ্গলময়ের

মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুঃখ করিয়া কোনই ফল নাই। হায় কি হইবে, হায় কি করিব বলিয়া দিবানিশি হায় হায় করা অপেক্ষা ততক্ষণ তাঁহাকে ডাকা উচিৎ। তিনি অমঙ্গলের মধ্য দিয়া, অশান্তির মধ্য দিয়া পরম মঙ্গল। পরম শান্তি দান করিয়া শ্রান্ত, ভ্রান্ত, মহামোহগ্রস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অভয়-পদারবিন্দে স্থান দিয়া থাকেন।

সর্ব্বদা প্রাণে প্রাণে প্রাণেশ্বরীর শ্রীচরণসমীপে থাকিয়া তাঁহার লীলা অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার যে, তিনি বড় বড় বিপদ, বড় বড় অশান্তির সাগরের মধ্যে থাকিয়াও কেমন তাঁহার প্রাণকোটীসর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বরকে চিন্তা করিয়া শান্তিতে কাল যাপন করেন। আমরা ততদূর না পারিলেও তাঁহার দাসী তো? একটুও তো করা উচিৎ? আর অধিক কি লিখিব; সর্বদা নামের আশ্রয়ে থাকিও, বিপদে সম্পদে নামই রক্ষা করিবেন। ইতি—

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা
তোমাদের দিদি

বড় বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদে নিষ্ঠা শিক্ষাদান

প্রসাদে নিষ্ঠা শিক্ষা দিতে বড় বাবাজী মহাশয় বহুবার বহুভাবে নিজ আচরণ দ্বারা সঙ্গীগণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। 'চরিত-সুধা' গ্রন্থে অনেক বর্ণনা আছে, তবু, আমরা নূতন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার দুই একটি পাঠকগণকে উপহার না দিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। 'চরিত-সুধা' গ্রন্থে দিদি তাঁহার নিজের সম্পর্কিত বহু ঘটনাই বর্ণন করেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু না দিলে নয়, মাত্র সেইটুকুই দিয়াছেন। ইহা তাঁহার চিরকালের স্বভাব। নিজের কথা বলিয়া নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া আমরা যেমন তিলকে তাল করিয়া তুলি। দিদি তাহা তো করিতেনই না, বরং নিজের কথা ঢাকা দিয়া নিজে যেন কিছুই না, এই ভাবের কথাই পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতেন। তাই আমরা তাঁহার অবর্ণনীয় ঘটনাগুলির দুই একটি প্রকাশ করিয়া দিতেছি। অবশ্য তিনি প্রকট থাকিলে এসব প্রকাশ করিতে দিতেন কিনা সন্দেহ। একদিনের একটি ঘটনা বলি—

ঝাঁজপিটা মঠে ঠাকুরের শয়ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যাগত যাঁহারা মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। দিদি ঠাকুরের আঙ্গিনায় বসিয়া তুলসীমালা দ্বারা হাতের বাজু তৈয়ারী করিতেছেন। কাছে বসিয়া কুসুমদিদি, দয়ালদাদা ও কুঞ্জদাদা আবশ্যকমত দিদিকে সাহায্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দয়ালদাদা দিদিকে বলিতেছেন—'বাবাজী মহাশয় (বড়বাবাজী) ক'দিন

মঠে নেই, সব যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।' কুঞ্জদাদা বলিলেন—'সত্যি বলছি ভাই, আমার এক মুহূর্তও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

দিদি—তিনি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁর যেভাবে যাকে রেখে সুখ হচ্ছে তাতে দাদা! আমরা সমালোচনা ক'রে কি করব ?

এইভাবের দুই চারিটা কথার পরই কুঞ্জদাদা উঠিয়া গেলেন। কেন গেলেন কোথায় গেলেন তিনিই জানেন। ইহারা কেহ কিছু, জিজ্ঞাসাও করিলেন না, যে যাহার কাজ করিতে লাগলেন।

কুঞ্জদাদা উঠিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি করিয়া বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কেহ নাই, রাত্রিও অনেক হইয়াছে, কাজেই একটু যেন ইতস্ততঃ ভাবেই ললিতাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু আছে কি? প্রসাদ পাওয়া হয় নি।' বলিয়া দিদিকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই আবার বলিলেন—'ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।"

দিদি—ব্যস্ত হবার কি আছে? শ্রীরাধাকান্তের ভোগের পারসখানিই প্রসাদী ঘরে তোলা আছে।

বাবাজী—বেশ বেশ। আচ্ছা, দেখি নিতাইচাঁদের কি ইচ্ছা! ললিতাদিদি প্রসাদ আছে এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাবাজী মহাশয়ের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রসাদ আনিতে ছুটিলেন। কিন্তু প্রসাদের ঘরে গিয়া দেখেন কুঞ্জদাদা। পারসখানি লইয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দিদি ব্যাকুলভাবে কুঞ্জদাদাকে সমস্ত কথা বলিলেন। কুঞ্জদাদা আর গ্রহণ না করিয়া ঐ প্রসাদ বাবাজী মহাশয়ের জন্য আনীত থালায় তুলিয়া দিলেন। দিদি সমস্ত ব্যবস্থামত সাজাইয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া প্রসাদ পাইলেন এবং অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা দেখাইয়া ললিতা দিদিকে বলিলেন—"কুঞ্জকে বঞ্চিত ক'রে আমাকে প্রসাদ দিয়েছিলে; এখন এইটা নিয়ে তাকে দাও।" দিদি এই কথা শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদ কাঁদ স্বরে করজোড়ে বলিলেন—'আমি ঘোর অপরাধিনী, আপনাকে কুঞ্জদাদার উচ্ছিষ্ট দিয়েছি। হায়, হায়, কেন আমার মরণ হ'ল না!" এইরূপ নানাপ্রকার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় যেন একটু ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন—"এতদিন রাধাকান্তের সেবা ক'রে, এত সাধু মহান্তের কৃপা পেয়ে বুঝি এই লাভ হয়েছে? প্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয়? এ অন্ন তুমি রাধাকান্তকে সমর্পণ করনি?"

দিদি—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিশোরী দিদি রাধাকান্তকে সমর্পণ করেছেন।

বাবাজী—তবে, তোমাদের কতদিন কতবার বলেছি না মহাপ্রসাদ কখনও

উচ্ছিষ্ট হয় না? "কৃষ্ণে নিবেদিত যে কিছু হইবে। মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিবে।"

দিদি—আজ্ঞে আমরা তো সেই জ্ঞানেই গ্রহণ করি কিন্তু এ যে কুঞ্জদাদার উচ্ছিষ্ট!

বাবাজী—(ধমক দিয়া) আবার ঐ কথা! কুঞ্জ তো আর অপ্রসাদী অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করেনি। সেতো রাধাকান্তে নিবেদিত প্রসাদই পেয়েছিল। মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে শাস্ত্রকার উর্দ্ধবাহু হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—'কক্কুরাণাং মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ।" মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখবে এবং সেইভাবে নিজেরা চলবে, অপর ছেলেদেরও চলতে শিক্ষা দিবে। মনে রেখো, তোমার উপর আমার এইসব ছেলেদের ভার দিয়েছি। শেষে যেন এদের আচার ব্যবহার কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয়, লোকে যেন কোনরূপ কটাক্ষ করতে না পারে। পুনরায় তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—"স্পর্শদোষে কৃষ্ণপ্রসাদ নষ্ট নাহি হয়। নষ্টদোষ ঘটাইলে নরক নিশ্চয়।।"

বাবাজী মহাশয় নিবৃত্ত হইলে ললিতাদিদি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাবাজী মহাশয়ের অধরামৃত লইয়া কুঞ্জদাদাকে দিলেন। কুঞ্জদাদাও উপস্থিত সকলকে কিছু কিছু দিয়া অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিলেন।'

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ললিতাদিদি জানিয়া শুনিয়াও কুঞ্জদাদার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া বাবাজী মহাশয়কে দিলেন কি প্রকারে? ইহাতে প্রীতি ও মর্য্যাদাবোধ কোনটির প্রাধান্য দেওয়া হইল? উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, "মর্য্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন" এ উক্তি শুনিয়াও ভক্ত প্রিয়তমের প্রীতির জন্য মর্য্যাদা করিয়া নরকে গমন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, সে বুঝে আমার যা হয় হউক, প্রিয়তমের সুখ হইলেই হইল। গোপীগণ নারদের নিকট শ্রীগোবিন্দের শিরঃপীড়ার সংবাদ শুনিয়া এবং তাহাদের পদধূলি পাইলে ভাল হইবেন জানিয়া তৎক্ষনাৎ তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। গম্ভীরায় শ্রীমন্ম মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ বলিয়াছিলেন— "গোবিন্দ কহয়ে মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন।।"

একাঙ্কী, সাধারণী, সমঞ্জস্য ও সমর্থা— এই চার প্রকার প্রেম। একাঙ্কী—এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষকে গ্রাহ্যও করে না। সাধারণী—শুধু নিজের সুখ চায়। সমঞ্জস্য—সমান সমান, তোমারও সুখ হউক, আমারও হউক। আর সমর্থা—সর্বোচ্চ প্রেম, ইহাতে আত্মসুখ একেবারে থাকে না। শুধু তোমার সুখ হউক, আমার তাহাতে যাহা হয় হউক। শ্রীমতী রাধিকার এই ভাব ছিল। তাই শ্রীমতীর সমর্থা রতি।

শারদীয়া পূজায় অপূর্ব্ব দর্শন

একবার নবদ্বীপে সমাজবাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিতে নবদ্বীপবাসী অনেকেই সমাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

দেবীকে স্নান করাইবার জন্য নানা তীর্থবারিপুর্ণর ঘট ও একখানি বড় থালা লইয়া পুরোহিত ঠাকুর বসিয়া আছেন। সুগন্ধি তৈল হরিদ্রাদি সমর্পণান্তে যথাবিধি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ থালার উপর জল ঢালিয়া তিনি দেবীকে স্নান করাইতেছেন। ললিতাদিদি তন্ত্রধারকের আসনের নিকট বসিয়া দেবীর মহাস্নানলীলা স্মরণে মগ্ন। স্নানবারি ঢালা শেষ হইলে পুরোহিত ঠাকুর নূতন গাত্রমাজ্জনী লইয়া দেবীর অঙ্গ মার্জ্জন উদ্দেশ্যে দর্শন করাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া থালার দিকে দৃষ্টি দিয়া স্নানজলে দেবীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন, একগাছি লম্বা চুল থালার মধ্যে রহিয়াছে। দিদি স্নানলীলা স্মরণে বিভোর। পুরোহিত মহাশয়ের আহ্বানে খালার দিকে চাহিয়া সুদীর্ঘ কেশ দর্শনে ভাবগদগগকণ্ঠে 'জয় মা কাত্যায়নী' বলিয়া সকলকে উহা দেখাইতে লাগিল।

সমালোচকের অভাব কোন কাজে কোন কালেই হয় নাই, আজই বা হইবে কেন? দুই-একজন 'ও কিছু নয়" বলিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল-কটাক্ষে বিদ্রুপবাক্য বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। পুরোহিত ঠাকুর কেশগাছি তুলিয়া "এত বড় কেশ তো এখানে কাহারও নাই" বলিতে বলিতে ভাবাবেগে "মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া নয়নজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। নবদ্বীপ বহু ভাগ্যবান এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

একটি কথা পূর্ব্বেই বলা উচিৎ ছিল কিন্তু বলা হয় নাই। কথাটি আর কিছু নয়, বাগানবাড়ীর পৌরহিত্য কে করিতেন এই কথা। প্রথম বাগানবাড়ী গ্রহণের পর হইতে কিছুদিন বড়বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গোপাল ঘটক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ করিতেন। তারপর ললিতাদিদি বাগানবাড়ীর নিকটস্থ বিনোদবিহারী সান্যাল নামক একটি ব্রাহ্মণ-বালককে নিজের কাছে রাখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া পৌরহিত্যে বরণ করিয়া লইলেন। এখন উক্ত সান্যাল মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তিনি দিদির শিক্ষানুসারে মঠের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্মে পৌরহিত্য করিতেছেন।

এই সান্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে দিদির দেবদেবী পূজার শিক্ষাদান প্রণালী তাহার সকলগুলি সাধারণে প্রকাশযোগ্য নয় বলিয়া প্রকাশে বিরত হইলাম। একটি নিয়মের পরিচয় ইনি দিলেন— "রাজরাজেশ্বর নারায়ণ চক্রকে সমস্ত

সমর্পণপূর্ব্বক সেই প্রসাদ দ্বারা অন্যান্য দেবদেবীর অর্চ্চনা করা।" তিনি বলিলেন, এই নিয়মেই বাগানবাড়ীতে কার্য্য হইয়া আসিতেছে।

দুর্গোপুজা পদ্ধতি যাহা দিদি সংকলন করিয়াছিলেন, তদনুসারে বাগানবাড়ীতে তো পূজো হয়ই, অন্যান্য বহু স্থানে বিশেষতঃ বাবাজী মহাশয়ের গণের ভিতর এখনও সেই ধারা ধরিয়াই কার্য্য চলিতেছে।

তিনের আদর্শ তিনজন

ভক্তি যাহার আছে তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ ভক্ত বলিয়া অভিহিত করি। এই ভক্তির কথা বলিতে যাইয়াই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন দৈন্যেরই নামান্তর ভক্তি। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ভক্তিরূপ মহামূল্য মণিকে রক্ষা করিবার সর্বোত্তম সুদৃঢ় আধারই হইল দৈন্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই দৈন্যলাভ হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে এক কথায় বলা যায় একমাত্র ভক্তের পূজা দ্বারাই এই দৈন্যভাব সম্যকরূপে সত্বর লাভ হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।" শ্রীভগবান তাঁহার পরমপ্রিয় ভক্তের দ্বারাই ভক্তিধন দান করিয়া প্রীতি লাভ করেন। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের কৃপালাভের সুযোগও ভক্তকৃপাতেই পাওয়া যায়। শাস্ত্রবাক্য—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।।
নিঃসংশয়স্তু তদ্‌ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্।।'

অর্থাৎ যিনি ভগবান অচ্যুত্যের সেবা করেন তাঁহার সিদ্ধিলাভে বরং সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যায় রত থাকেন তাঁহার সিদ্ধিলাভে কোনরূপে সংশয় নাই।

ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। নরকাদি ভয়ে ভীত হইয়া স্বর্গাদি ভোগকামনায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে ভগবদ্ভজন, তাহাকেই সাধারণতঃ বৈধীভক্তি বলে। এই বৈধীভক্তি-আচরণশীল ভক্ত ভগবানের সুখ অসুখ, প্রীতি-অপ্রীতি কিছুই দেখিতে চান না। তিনি চান শাস্ত্রোক্ত বিধি পালন করিতে এবং নিষিদ্ধ বিষয় বর্জ্জন করিতে। আর রাগমার্গীয় ভক্ত শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে ভগবানে লোভপরায়ণ হইয়া ভজন করেন। তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্র সুখকামনা বা কোনরূপে ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্খা থাকে না। সর্ব্বদাই কিসে ভগবানের সুখ প্রীতি হইবে সেই চেষ্টা। এ জাতীর ভক্তের সর্ব্বদাই ভগবৎসুখানুসরণ ও তাঁহাতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈধীভক্ত কার্য্য করিয়া কামনামত ফল চায়, আর রাগমার্গীয় ভক্ত

উপাস্যের সুখ চায়, নিজের তাহাতে যাহা হয় হউক। এক কথায় মহাজনগণ বলিয়াছেন—"বিধি বহিরঙ্গ, রাগ অন্তরঙ্গ।"

আমাদের আলোচ্য ললিতাদিদির ভজন ছিল এই অন্তরঙ্গ রাগ পর্য্যায়ে। দিনে রাতে শয়নে স্বপনে প্রতিটি কার্য্য ছিল তাঁর সেব্যের সুখবিধান জন্য। বড়বাবাজী মহাশয়কে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার এই সুমধুর ভজন প্রণালী আরম্ভ হয়। এতৎপূর্ব্বে তিনি কিভাবে কি করিতেন তাহা পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতেই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বড়বাবাজী মহাশয় যে সময় প্রকট থাকিয়া দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া অলৌকিক লীলাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, সে সময় অপেক্ষা আজ তাঁহার নাম প্রচার হইয়াছে বেশী। আজ আর তাঁহার অনাগত শিক্ষা মহলেই তাঁহার নাম সীমাবদ্ধ নাই। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা তো বটেই—পাঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজ এমনকি সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অলৌকিক লীলাকাহিনীর সহিত নাম প্রচারের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রধান শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য যোগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম—তিনি যে সময় পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম্ম-সম্মিলনীতে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন, তখন সেখানেও নাকি কয়েকজন উচ্চপদস্থ অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী বড়বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া কি প্রকার আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয়ের আশ্রিত ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মিলিত তনু, বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ অবতার বলিয়াও বলিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রিত ভক্তের নিকট তিনি যাহাই হউন না কেন, তিনি যে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমপ্রেমিক আদর্শ বৈষ্ণব ছিলেন এবং কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রচারিত প্রেমধর্ম জনসমাজে অবিকৃতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। নানাবিধ অদ্ভূত ও অলৌকিক ঘটনাবলী পরিপূর্ণে জীবনী 'চরিতসুধা' নামক গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষভাবেই আলোচিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে আচার্যপাদগণের নিকট শুনিয়া আসিতেছি—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন। এই তিনে নিষ্ঠা হৈলে মিলে কৃষ্ণধন।।"'

বড়বাবাজী মহাশয়ের অগণিত ভক্তের মধ্যে আমরা তিনজন ভক্তকে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের আদর্শ'- জনোচিত আচরণ করিতে দেখিয়াছি। একজন সাধু নিত্যানন্দ দাস। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তকে বুকে তুলিয়া লইয়া সেবা করিয়া জীবে দয়ার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। আর একজন যাঁর নামস্মরণে লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন- লালসায় ছুটিতেন, সেই প্রেমকণ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ রামদাস বাবাজী

মহাশয়। যৌবনকাল হইতে অক্লান্ত নিষ্ঠার সহিত দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নামপ্রচার দ্বারা নামে রুচির আদর্শ দেখাইয়াছেন। আর একজন গুরুগতপ্রাণা সাক্ষাৎ সেবাময়বিগ্রহ আমাদের আলোচ্য এই ললিতা সখী। মানুষ যে সকল গুণের এক-একটি লাভ করিলে জনসমাজে প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং পূজালাভে সমর্থ হয়, সেই সকল গুণের অনেকগুলিতে বিভূষিত হইয়াও সখীবেশ ধারণ করিয়া একাধিক্রমে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল একই স্থানে একই ভাবে থাকিয়া অকাতরে অবিচারে যথাযথভাবে বৈষ্ণবসেবা করিয়া চিরদিনের জন্য জগতে এক মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা এই ললিতাদিদির জীবনী আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার মহান চরিত্রের কোনটি ছাড়িয়া কোনটি বর্ণনা করিব ভাবিয়া পাইতেছি না। ললিতাদিদির নিকট যে জাতীয় তত্ত্ব যে কোন সন্দেহ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই দিদির সহজ সরল মুক্তিপণের উপদেশে নিঃসন্দেহ হইয়া ফিরিয়াছেন। এমন বিরাট প্রতিভার অধিকারী হইয়াও কোনদিন নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতে তাঁহাকে দেখি নাই। এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠার লিপ্সা দিদির অন্তর কোনদিনই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অর্দ্ধেন্দুবাবু

কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলীকে লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী স্থাপন করেন। আমাকে কিছুদিন সম্মিলনীর গৃহনির্ম্মাণাদি ব্যাপারে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকতে হইয়াছিল। সেই সময় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলিলেন—"দেখ দীনেশ! প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শুনেছিলাম যে, নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর ললিতা সখী নাকি তোমারই সহোদর ভাই?"

আমি—আমরা চার ভাই, ললিতাদিদি আমারই উপরের। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাই ভাই হ'লে কি হবে, তাঁর সঙ্গে কোন সম্বন্ধে জড়িত আছি—এ কথা বলা আমার মত সংসারের কীটানুকীট জীবের কি সাজে?

তর্কভূষণ—আরে সে সাজা না সাজার কোন কথা হচ্ছে না। তোমার সঙ্গে যে তাঁর একটা সম্বন্ধ ছিল। এটাতো ঠিক? তা যাই হোক্ আমি এবার নবদ্বীপ হরিসভার নিমন্ত্রণে গিয়ে সেখানকার সভার কাজ শেষ ক'রে সখীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি তো দেখে অবাক্। কি অদ্ভুত পরিবর্তন! কোনমতেই বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, একজন পুরুষদেহধারী এমনভাবে

সখীবেশ ধারণ ক'রে আছেন। চলন, বলন, হাবভাব প্রত্যেকটি একেবারে নিখুঁত। আমার কোনরূপে পরিচয়ই তাঁকে দিইনি, তথাপি তিনি কি অমায়িক ব্যবহার যে আমার সঙ্গে করলেন তা বলবার নয়। আমার লজ্জা হ'তে লাগল। আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন তিনি বাগান-বাড়ীর স্কুলঘরের নিকট দাঁড়িয়ে কয়েকটি ভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটি ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল— 'মা আমরা তো গৃহস্থ, আমরা কিভাবে কি করব? আমাদের কর্ত্তব্য কি? একটু বুঝিয়ে বলুন।'

সখীজী একটু হেসে তাকে বললেন—'বাবা! নতুন কথা আমি আর কি তোমাকে বলব! পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ সব কথাই ব'লে গিয়েছেন, একটু খুঁজে দেখে নিতে হবে। তুমি গৃহস্থ ব'লে নিজেকে অযোগ্য মনে করছ কেন? তোমার মতই 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি' এই প্রশ্ন একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁর পরমপ্রিয় গৃহস্থ ভক্ত কুলীন-গ্রামনিবাসী রামানন্দ বসু, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রভু তদুত্তরে তাঁকে যা বলেছিলেন, বৈষ্ণব কবির দুই ছত্র পয়ারে আমরা তা বিশেষভাবে জানতে পারি। "প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম সঙ্কীর্তন।"

ভাই! কথাগুলি আমার এত মিষ্টি লাগল যে, তা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বুঝাতে পারব না। সত্য কথা বলতে কি, যদি আমাকে কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত তা হ'লে আমি বোধ হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা বচন প্রমাণ ভুলেও এমন সহজ সরলভাবে উত্তর দিতে পারতাম না। এবার আমার নবদ্বীপ যাওয়া সত্য সত্যই সার্থক হয়েছে।

আন্দুলনিবাসী অর্দ্ধেন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য বি. এ. বি. এল মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠিক এই ভাবেরই অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি অকপটে তাঁহার প্রথম দর্শনের পর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি তখনও কাছারিতে যাওয়া শুরু করিনি, সবে মাত্র কলেজ থেকে বেরিয়েছি। কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সেখানকার কাব্য সমাপনান্তে নবদ্বীপে যাই। সেখানে অন্যান্য দর্শনীয় সকল দর্শন ক'রে বাগানবাড়ীতে যাই পূর্ব্বশ্রুত ললিতা সখীকে দেখবার জন্য। তৎপূর্ব্বেই শুনেছি ললিতা সখী নাকি পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তবুও কেন যে তিনি স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ ক'রে এভাবে ঘরের মধ্যে বসে আছেন, যদি তার কিছু, সন্ধান জানতে পারি, আমার ও বন্ধুবর্গের এইটাই সেখানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য।

যথাসময়ে সকলে মিলে বাগানবাড়ীতে গেলাম। সন্ধান নিয়ে জানলাম তিনি

উপরে গিয়েছেন, নামতে আধ ঘণ্টা বিলম্ব হবে। আমরা ইতিমধ্যে বাগানবাড়ীর অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু সকল দেখে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই তিনি নীচে নেমে এলেন। সকলের সঙ্গে আমিও একটা প্রণাম করলাম কিন্তু আমরা যে কয়জন গিয়েছিলাম সকলেই তাঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ তথাপি তিনি আমাদের প্রতিপ্রণাম করলেন। আমাদের বসিয়ে তিনিও বসলেন এবং একে একে আমাদের পরিচয় নিতে লাগলেন। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দুএকটা প্রশ্নও করলেন, উনি উত্তর দিলেন। শেষে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সত্য কথা বলতে কি আমার ভাল লাগল না বরং বন্ধুগণের সঙ্গে একটা বিপরীত সমালোচনাই করলাম।

কিছুদিন পরে আমাদের এক আত্মীয় ডাক্তারবাবু সখীজীর খুব ভক্ত শুনে তাঁর সঙ্গে আর একবার যাই। এবার আন্দুলের আর একটি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আমার সঙ্গে চললেন। এই ডাক্তারবাবুটি যাবার পূর্বে বেছে বেছে কতকগুলি প্রশ্ন লিখে নিয়েছিলেন সখীজীকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। আমার আত্মীয় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যাওয়ায় সখীজীকে খুব নিভৃতে পেরেছিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার পরিচয় পেয়ে সখীজীও আমাকে খুব সম্মান দিয়ে বসালেন।

কিছু সময় পরে আমার সঙ্গী আন্দুলের ডাক্তারবাবু একটি প্রশ্ন সখীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন। সখীজী এত সহজে ও এমন সুন্দর যুক্তি দ্বারা প্রশ্নটির উত্তর দিলেন যে, আমরা সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলাম। তারপর যত আলোচনা হয় ততই তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সাধনালব্ধ অনুভূতির পরিচয় পেতে লাগলাম। তখন আমার মনে মনে পূর্ব্ববারের ধারণার মধ্যে যে কি মারাত্মক ভুল করেছি তা ভেবে এবং বন্ধুগণের সহিত বিপরীত সমালোচনার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হলাম।

এই অর্দ্ধেন্দুবাবুই অতঃপর অবসর পাইলেই নবদ্বীপ যাইয়া অন্ততঃ এক বেলাও দিদির সহিত আলাপ না করিয়া আসিতেন না।

নামসঙ্কীর্ত্তন ও রসকীর্ত্তন

ললিতাদিদির ভজন মুদ্রা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা মাদৃশ অযোগ্যের সাধ্যাতীত। আমি বাহ্যিক আলাপ-আলোচনায় যখন যতটুকু পাইয়াছি তাহাই সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। যদি যোগ্য ব্যক্তি কেহ চেষ্টা করিয়া অন্তরঙ্গ ভজন-কথা প্রকাশ করেন তবেই হইবে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং অক্ষম।

সমীবেশ গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ-মননে সর্বদা বিভোর থাকিতেন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে কখনও তাঁহার কোনরূপে এটি কেহ দেখিতে পায় নাই। সমাগত অতিথি বৈষ্ণবের সম্বর্দ্ধনা, নৈমিত্তিক উৎসব-পর্ব্বের আয়োজন, মঠবাসী সেবকগণের আবশ্যকীয় বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি, এসব কোন ব্যাপারেই কখনও কোন ত্রুটি হইতে দেখি নাই।

নামসংকীর্তনের কোন প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি কিভাবে সকলকেই উৎসাহিত করিতেন তাহা যাঁহারা তাঁহার নবদ্বীপবাসকালীন ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। নামসংকীর্তনের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি বলিতেন—

"নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শুধু, কীর্ত্তনকারী মনুষ্য নয়, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, এমন কি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উপকৃত হয়। আর কীর্ত্তনকারী উহাদের নিকট যে কোন ভাবেই ঋণী থাকুক না কেন, সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়।"

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনে তিনি পরমকরুণাময় অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের আদর্শ দেখাইয়া বলিতেন—

"শাস্ত্রযুক্তি বা সিদ্ধান্ত খুঁজিতে দূরে যাইতে হইবে না। সঙ্গীগণসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া প্রভু আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করাইয়া, সর্ব্ব সমক্ষে বৃক্ষকে নাচাইয়া, পাষাণ গলাইয়া, দুর্দ্ধর্ষ মদ্যপায়ী লম্পটকে কীর্ত্তনে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া যে আদর্শ তোমাদের দেখাইয়াছেন, সেই আদর্শ ধরিয়া চল, সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে। শুধু নামের শক্তি বা ক্রিয়া লইয়া তর্কযুক্তি দেখাইয়া সমালোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। নাম সর্ব্বশক্তিমান নাম-নামী অভেদ—এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইয়া নাম কর।"

একটি ভক্ত প্রশ্ন করিলেন—"মা! কোন্ নাম করব?'

দিদি—বাবা। যে নামে যার রুচি হয় সে সেই নামই করবে। ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকের ভিন্ন ভিন্ন নামে নিষ্ঠা দেখেই তো শত শত সহস্র সহস্র নামের প্রকাশ করে দয়াময় তাঁর দয়ার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেছেন—"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।" শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবশিক্ষার জন্য দৈন্যভরে নিজমুখে বলেছেন—

"নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।"

সকলের রুচি ত' এক নয়; তাই ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রকাশ হয়েছে। লক্ষ স্থির রেখে যার যে নামে রুচি হয়, সে সেই নামই করতে পারে।

ভক্ত—বৈষ্ণবেরা না হয় হরিনাম করল, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ী শাক্ত, শৈব,

সৌর বা গাণপত্য এঁরা কি নাম করবে?

দিদি—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি—'হৃ' ধাতুর উত্তর "কি" প্রত্যয় ক'রে হরি শব্দ নিস্পন্ন হয়েছে। 'হৃ'—হরণে। "হৃ" ধাতুর অর্থ হরণ; যিনি আমাদের চিত্ত হরণ করেন তিনিই হরি। এই অর্থ ধরলে শাক্তগণ হরি শব্দে কালীকে, শৈবগণ শিবকে, সৌরগণ সূর্য্যকে এবং গাণপত্যগণ গণপতিকেই করেবেন। কাজেই যিনি যাঁর উপাস্য, তিনিই তাঁর হরি। সুতরাং তাঁর নামকীর্ত্তনই অবশ্য কর্তব্য। তবে যুগোচিত তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণে কোন সম্প্রদায়েরই আপত্তির কারণ নেই। শাক্ত শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই কলিযুগোচিত—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" এই নাম করতে পারেন। এতে কারও আপত্তি উঠলে বুঝতে হবে তার দুর্দ্দৈব এখনও যায়নি।

ভক্ত—নামসঙ্কীর্ত্তনে কি হয়?

দিদি — নামসঙ্কীর্ত্তনে কি হয়? এ প্রশ্ন তোমার ঠিক হয়নি, কি হয় না বল? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই কৃষ্ণনাম—সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা বলা হয়েছে—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং, শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং, সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্।।"

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে প্রভু বলেছেন—"হরি শব্দের বহু অর্থ দুই মুখ্যতম। সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন।।" সোজা কথায় জেনে রাখ—নামসঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূর হয়, ভবব্যাধি বিনাশ হয়, এমন কি বহু, কৃচ্ছ্র-সাধনাতেও যা লাভ হয় না সেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন লাভে জীব ধন্য হয়। জীবকে মায়াবন্ধন হ'তে? মুক্ত ক'রে ভগবৎ-সেবানন্দ-সুখে মগ্ন করতে নাম ভিন্ন আর কে আছেন?

ভক্ত —এই সঙ্কীর্ত্তন বলতে লীলাকীর্ত্তনকেও বুঝায় তো?

দিদি—কীর্ত্তন দুই প্রকার, নামকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন।

ভক্ত—এ দু'য়ে প্রভেদ কি?

দিদি—(সহাস্যে) তোমাদের রামদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না কেন?

ভক্ত—আজ্ঞে তিনি বলেন, "আমাকে খোল করতাল এবং 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই নাম দিয়ে ব'লে দিয়েছেন ওতেই সব আছে, বিশ্বাস রাখিস সব পাবি। আমি আর কিছু জানি না।"

দিদি ভক্তটির অকপট ভাব এবং এই সব জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—“বাবাজী যা বলেছেন খাঁটি কথা। তবে তুমি যেভাবে করতে চাইছ, সেভাবে আলোচনা করতে হ'লে একটু সময়ের দরকার। আর আমি সেভাবের আলোচনার যোগ্যাও নয়। তবু তোমার আগ্রহ মেটাতে সংক্ষেপে কিছু বলি।

সাধারণতঃ সঙ্কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন এই দুটি কথা ব্যবহৃত হয়। সঙ্কীর্ত্তন বলতে নামকীর্ত্তন আর শুধু কীর্ত্তন বলতে রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তনকেই বুঝায়। প্রাচীন মহাজনগণের পদাবলী অবলম্বনে শ্রীবৃন্দাবনের লীলা বিষয়ক পালাকীর্ত্তনকেই রসকীর্ত্তন বলে। নীলাচলধামে গম্ভীরায় অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছিলেন—“বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নামসঙ্কীর্ত্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্বাদন।” দশে পাঁচে মিলে কাতরভাবে তাঁর নিকট কৃপা প্রার্থনা ক'রে যে শরণাগতির ভাব, এইটিকে নামসঙ্কীর্ত্তন পর্য্যায়ে ধ'রে নিতে পার। এতে সকলের সমান অধিকার। আর যাকে রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন বল, তা কীর্ত্তনের বা শ্রবণের অধিকারী সকলে নয়। কেন নয় তাই বলছি।

রসের একটা মূর্ত্তি আছে, কীর্ত্তন-গানেরও একটা প্রাণ আছে। রসস্ফুর্ত্তির যে ক্রমিক ধারা অর্থৎ স্তরবিন্যাস বা পর্যায় তা অস্বীকার করলে চলবে না। উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতময় মূর্ত্তি। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই তিনটি ব্রজের রস। প্রত্যেক রসটি প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে বিভিন্ন পদকর্ত্তার শরণ নিতে হয়। বৈষ্ণবের ধ্যান বলিতে বুঝায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা ও সেবা প্রভৃতির সম্যক পরিচিন্তন। “ধ্যানং—রূপগুণ-ক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠুচিন্তমন্” কীর্ত্তন এ বিষয়ে একান্ত সহায়কারী। কিন্তু তা না ক'রে কেবলমাত্র নানাপ্রকার সুরের কস্‌রৎ দেখিয়ে জিনিসটাকে কালোয়াতী ধরণে পরিবেশন করলে সুখ হবে না।

ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস পদাবলীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে প্রাণ নেই কেবল ওস্তাদি, সেখানে কীর্ত্তন খুলবে না। যখন যে পদটি গান হবে। তখন কীর্ত্তনীয়াকে সেইভাবে ভাবিত হ'তে হবে, তবেই কীর্ত্তন করা সার্থক হবে। সুর ভাল কীর্ত্তনের বহিরাবরণ। লীলানুযায়ী ভাবে চিত্তকে অনুপ্রাণিত ক'রে, পদবর্ণিত ভাব প্রাণে অনুভব ক'রে প্রাণের কান্নাটিকে বাইরে টেনে গাওয়াটাই যথার্থ কীর্ত্তনাঙ্গ গান বা পদাবলী-কীর্ত্তন।

কীর্ত্তনীয়ার মত শ্রোতাকেও উপযুক্ত হ'য়ে রসকীর্ত্তন শুনতে হয়। শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে আপনাকে নিত্যলীলার কোনও সখীর অনুগত্য একটি গোপবালিকা ব'লে ধারণা ক'রে নিয়ে তাঁর পশ্চাতে থেকে যে রস-লীলা কীর্ত্তন হচ্ছে তদুচিত পদের রসাস্বাদ করতে হবে। এর নামই প্রকৃত রসকীর্ত্তন বা লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ।

সাধনার অপরিহার্য্য এবং অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ কীর্ত্তন হ'লেও নাম-সঙ্কীর্ত্তন যেমন সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে উপযোগী, রসকীর্ত্তন সেরূপে নয়। যিনি অন্তরঙ্গ সাধক তাঁর পক্ষে উত্তম ফললাভ হ'লেও অন্যের নিকট অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল ফলতে দেখা যায়। যাত্রা শোনা বা অভিনয় দেখার মত বহিরঙ্গ বিষয় লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ নয়।

রসকীর্ত্তন-গায়ক ও শ্রোতা উভরে যদি এইভাবে পরস্পর সমভাবাপন্ন হয় তবেই কীর্ত্তন করা বা শোনা সার্থক। সখীর আনুগত্যে তত্তল্লীলাদর্শন ও আস্বাদন না হ'লে প্রেমময় প্রেমময়ীর নিত্য প্রেমলীলার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত জগতের কামলীলারই ভোগ হয়ে থাকে। কাম ও প্রেমে কত তফাৎ তা জান তো ? ভক্তপণ্ডিত মশাইদের কাছে পাঠ বক্তৃতা শুনিবার সময় কিছু, কিছু, শুনেছি, কিন্তু তত্ত্ব কিছুই বুঝিনি। যদি অসুবিধা না হয় তবে আপনি দয়া ক'রে একটু বলুন না মা!

দিদি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল।।
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।।'

যাতে আত্মসুখের ইচ্ছা থাকে তাকেই বলে কাম। আর যা আত্মসুখাভিসসন্ধিরহিত এবং কেবল কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত তাই প্রেম। কাম প্রাকৃত, প্রেম অপ্রাকৃত। কাম ঘোর অন্ধকার আর প্রেম সুনির্ম্মল চন্দ্রালোক। কাম অসপত্ন্য, প্রেম বহুজন-লিপ্সু।

প্রেম অপ্রাকৃত ধামের; প্রাকৃত জগতে প্রেম নেই। কোন না কোন প্রকারে স্বার্থের পুতিগন্ধ প্রাকৃত জগতের সকল কাজেই পাওয়া যায়। একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কার্য্য তাকেই প্রেম বলা হয়। গোপীগণ নিজ নিজ দেহের পরিচর্য্য ক'রে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণসন্নিধানে উপস্থিত হতেন। ঐ বেশভূষা কি নিজের ভোগের জন্য? কখনই না। সন্দর্শনে কৃষ্ণ সুখী হবেন এই-ই তাঁদের মনোভাব। তাই না শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেছেন—

"আত্ম সুখে দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার।।

* * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেই ও কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত।।
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন।।
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করেন অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ।।”

গোপীগণের এই ভাব লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলেছেন। যথা লঘুভাগবতামৃতে—“নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।।” অর্থাৎ গোপীগণ নিজ অঙ্গকেও আমার ভোগ্য ব'লে যত্ন করে। তাই বলি, হে অর্জ্জুন! এই গোপীগণ হ'তে আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেউই নেই। শ্রীচরিতামৃতকার পুনরায় বলেছেন—

“কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।।
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে।।”

বাবা! দিবারাত্র সমানভাবে আলোচনা করলেও এসব তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণার যেটুকু স্ফুর্ত্তি হ'ল তোমাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ধন্য হলাম। সকলে আমাকে কৃপা কর আর তোমরাও নিয়মিতভাবে নামাশ্রয় ক'রে ধন্য হও।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিশেষ প্রয়োজনে দিদি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও আজিকার আলোচনা এইখানেই শেষ হইল মনে করিয়া দণ্ডবতান্তে যে যাহার প্রয়োজনে চলিয়া গেলাম।

ঘরে গিয়া দেখি, আমাদের শ্রদ্ধের অবধূত পাগলা দাদা গান করিতেছেন—

“প্রেম কথাটি শুনতে ভাল
যদি না ছোঁয় মদনে।
কাম থাকিতে প্রেম হবে না
ব্রজগোপীর ভাব বিনে।।
গুরু অনুগত যারা
তারা জানে মানুষধরা
গুরুপ্রেমে যারা ভোরা
পলক নাই তাদের নয়নে।।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী

তাদের পীরিত সত্য মানি
এক মরণে দু'জন মরে
এমন মরে ক'জন।। ইত্যাদি।

বিদ্যারত্নের গর্ব্ব খর্ব্ব

আমার এক পণ্ডিত বন্ধু পূর্ব্ব হইতে পত্র লিখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন আমাকে লইয়া একবার পূজোর ছুটিতে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবেন। ১৩৪২ সালে দুর্গাপূজোর ছুটি হইলে তিনি আসিয়া আমার মাসিলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ষষ্ঠীর দিন ভোরেই নবদ্বীপ যাত্রা করিলাম।

বন্ধুবর একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক। কাহারও ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাইতে চান না, অন্য খাবার বিষয়ে তো কথাই নাই। তবে আমার সঙ্গে যাইতেছেন, বিশ্বাস আছে আমি তাঁহার যাহাতে নিয়মভঙ্গ না হয় সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিবই। যথাসময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অবসরমত জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই! নবদ্বীপে তো যাচ্ছ, তোমার আহারাদির ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে ?"

বন্ধু—তোমার কি রকম ব্যবস্থা?

আমি—আমি বাগানবাড়ীতে থাকি, সেইখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাই।

বন্ধু—সেখানে কি ব্রহ্মণেই পাক করে ?

আমি—ভাই। সে খবর আমি ঠিকমত তোমাকে বলতে পারব না। তবে ঠাকুরের ভোগ হয় এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, এমন কি গোস্বামী-সন্তান যাঁরাই সেখানে উপস্থিত থাকেন সকলেই প্রসাদ পান দেখি। তাই আমিও আরও কোন আপত্তি করি না।

বন্ধু—তোমার দাদাই তো মঠের মালিক, তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন পৃথক ব্যবস্থা করেন না ?

আমি—ভাই! সে অনেক কথা। প্রথম যখন মঠে গিয়েছিলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনাকে সিধা দেওয়া হবে, না মঠেই প্রসাদ পাবেন?' আমি একটু হেসে বলেছিলাম—বাঁকা পথে চ'লে চ'লে শ্রান্ত হয়েই তো এখানে এসেছি, যাতে একটা সিধে হ'তে পারি তার ব্যবস্থা ক'রে দিবেন, আমি অতশত বুঝি না। তিনি 'জয় গুরু, জয় গুরু' ব'লে হাসতে হাসতে মঠের লোককে বলে দিলেন—এঁরা মঠেই প্রসাদ পাবেন।' সেই থেকে যখনই নবদ্বীপে যাই ঐ মঠেই থাকি এবং ঐখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাই।

বন্ধু—ঠাকুরের প্রসাদের উপর তো কোন কথাই নেই, তবে কি জান ভাই!

বহু দিনের সংস্কার কি-না তাই কেমন যেন মনটা খুঁতখুঁত করে। আচ্ছা, চল তো, তারপর 'ক্ষেত্রকর্ম্ম' 'বিধিয়তে' যা হয় হবে। যদি অসুবিধা দেখি, না হয় দু-তিন দিন জলটল খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ভাবের প্রসঙ্গ হইতে হইতে নবদ্বীপ স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। আমরা নামিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া যথাসময়ে বাগানবাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

দিদি সে সময় বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কয়েকজন মাড়োয়ারী ভক্তের সহিত কথা বলিতেছিলেন। আমরা প্রণাম করিলে তিনিও তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাবমত প্রণাম করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সংক্ষেপে আমাদের আগমনের কারণ বলিলাম। তাহাতে তিনি পূজোর কয়দিন মঠে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া একজন ভক্তকে ডাকিয়া স্কুলবাড়ীর উপরের ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। আজ যেন দিদিকে অন্যদিন অপেক্ষা একটু ব্যস্তই দেখিলাম।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখানেও আবার বলি—বাগানবাড়ীতে সমস্ত পূজা-পার্ব্বণই যথাযথভাবে হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা যদিও ঘটস্থাপনা করিয়া চিত্রপটে হয়, কিন্তু ব্যবস্থা সমস্তই প্রতিমাপূজোর ন্যায়ই হইয়া থাকে। আজ ষষ্ঠী, সন্ধ্যায় বোধন অধিবাস হইবে। তাই দিদি সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন।

আমরা নির্দ্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। বন্ধুবর গঙ্গার ঘাটে বসিয়াই তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া লইলেন। আমি মঠে আসিয়া নিজকৃত্য করিতে বসিলাম।

তিলকসেবা করিয়া বসিয়া নাম করিতেছি, এমন সময় দিদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি মঠেই প্রসাদ পাবেন তো?" আমি বন্ধুবরের দিকে চাহিয়া বলিলাম — "কিগো বিদ্যারত্ব ভায়া! কি করবে বল না?" বন্ধুবর দিদির দিকে চাহিয়া কি যেন বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিতেছেন না, এইভাবে হ্যাঁ-না-তা-হ্যাঁ ইত্যাদি একাক্ষরীয় অস্ফুট বাক্যদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া দিদি বলিলেন—"আমি গোয়ালিনী, আমি ভোগের দ্রব্য স্পর্শ করি না। নারায়ণের ভোগ ব্রাহ্মণেই প্রস্তুত করেন। তারপর আজ রাত থেকে যোগমায়া দেবীর জন্য যে বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে তাও ব্রাহ্মণেই প্রস্তুত করবেন।'

বন্ধু— আর বলতে হবে না, আমি সকলের সঙ্গে মঠেই প্রসাদ পাব।

দিদি—জয় গুরু! আমি শেষে অপরাধী না হই এই জন্যই জিজ্ঞেস করা।

জানেন তো আশী বছর না হ'লে গয়লার বুদ্ধি হয় না ? এই বলিয়াই দিদি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বন্ধুবর কেমন যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভাই ! তোমার দাদাই তো সখীবেশ ধরেছেন, তবে নিজেকে গয়লা বলছেন কেন?

আমি—ভাই! ওসব তত্ত্ব আমি গুছিয়ে বলতে পারব না, তুমি সময়মত ওঁকেই জিজ্ঞেস ক'রো; উনিই বলবেন।

বন্ধু—শুনেছি উনি খুব পণ্ডিত, কোন শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে যথাযথ তার জবাব দিবেন তো?

আমি—সে ওঁর ইচ্ছে। উনি বলেন—আমি গোয়ালা, তাতে স্ত্রীজাতি, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আমি কি জানি?

বন্ধু—তুমি যে অবাক্ ক'রে দিলে ভাই, নিজের বিষয় এমন ক'রে কি কেউ ভুলতে পারে?

আমি—ভাই! ভুলতে না পারলে এভাবে থাকাও সম্ভব নয়। তোমাকে বলতে কি এখানে আরও দু-চার জন ঐভাবে ছিলেন; কিন্তু শেষরক্ষা করতে না পেরে ঘরে ফিরে গিয়েছেন। দিন কয়েক এঁদের কাছে থাক, দেখ বোঝ বৈষ্ণব বাবাজীদের ভেতর কি আছে না আছে।

এইভাবে কিছু সময় বন্ধুর সহিত কথা হইতে হইতেই প্রসাদ পাইতে যাইবার জন্য আহ্বান আসিল। আমরা দুইজনে পাশাপাশি দিদির ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছি আর দিদি রকের নীচে দাঁড়াইয়া এটা দাও ওটা দাও বলিয়া দিতেছিলেন।

বন্ধু—আপনি উপরে উঠে বসুন না।

দিদি—কি সর্ব্বনাশ, আমি ওখানে উঠে বসতে পারি কি? একে নীচ জাতি, তাতে অনাচারী। আপনারা উচ্চবংশসম্ভূত সদাচারী নিষ্ঠাবান। আমার ছায়া স্পর্শ করলেও যে আপনাদের স্নান করতে হবে।

বন্ধু—আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

দিদি—এতে আর লজ্জা দেওয়া কি ? আপনারা যে কৃপা করে এখানে কিছু; গ্রহণ করেন সেই-ই যথেষ্ট। একে তো ন্যাড়া বাবাজীদের মঠ, তাতে আবার যদি অনাচারী লোকের সংস্পর্শ হয় তবে কি আর রক্ষে আছে ?

আমি—বন্ধু! কথায় পারবে না, চুপচাপ প্রসাদ পেয়ে নাও, যদি কিছু বলবার থাকে অন্য সময় স্থির হ'য়ে ব'সে ব'লো। এটা জেনে রাখ, উনি যা করবেন মনে করেন তা করবেনই।

এ সময় আর বিশেষ কোন কথা হইল না। আমরা প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলিয়া আসিলাম।

বৈকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া নীচে আসিয়াই দেখি, নাটমন্দিরে পাঠের আসন হইয়াছে। কাশীধামের কে একজন বড় পণ্ডিত আসিয়াছেন। তাঁহার পাঠ হইল আমরাও বসিয়া শুনিলাম।

পাঠ অন্তে দিদির সহিত দেখা করিতে যাইয়া দেখি, বারান্দায় সৌরীনবাবু হাজারীবাবু রামবাবু প্রভৃতি কয়েকজন বাছা বাছা ভক্ত লইয়া দিদি লীলাকথা আলোচনা করিতেছেন। আমরাও একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম।

দিদি—গুণের আদর তো সর্ব্বাই আছে। স্ত্রী বা পুরুষ, বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর জাতি, যে-ই গুণী সে-ই আদর পায়। সীতাদেবীর গুণ বর্ণনা করতে করতে অরুন্ধতী যে কথা বলেছিলেন, মহাভারতে আমরা তা দেখতে পাই—শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাম্। গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।।" ধ্রুব প্রহ্লাদ শিশু, ভীষ্ম ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মব্যাধ ব্যাধজাতি হ'লেও তাঁরা কি ব্রাহ্মণের পূজ্য নন? সীতা সাবিত্রী স্ত্রীজাতি তথাপি জগৎপূজ্যা।

রামবাবু—দিদি শাস্ত্র তো অনেক কিছুই বলেছেন। সজ্জনগণ আচরণ ক'রেও অনেক কিছু, দেখিয়েছেন এখনও দেখাচ্ছেন, কিন্তু আমরা তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই প'ড়ে আছি। আমাদের ভাগ্যে কিছু লাভ হয় না কেন ? আর তাঁরা কৃপা ক'রে দর্শনাদি দিলেও আমরা তাঁদের আচরণ বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারি না কেন? বরং বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে নানা প্রকার নিন্দাবাদই ক'রে থাকি, এর কারণ কি?

দিদি—ডাক্তারবাবু! সৎসঙ্গ লাভ সত্যই দুর্লভ। তারপর কিছু সুকৃতি না থাকলে সঙ্গ পেয়েও বিশেষ কিছু হয় না। "সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।"

সেদিন কলকাতা থেকে একজন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত এসেছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন অবদানকল্পলতায় বর্ণিত বৌদ্ধকবি ক্ষেমেন্দ্রপাদের একটি শ্লোক—"স্মরণং শ্রবণং বাপি দর্শনং বা মহাত্মনাম্। সেয়ং কুশলবল্লীনাং মহতী ফলসন্ততিঃ।।" সকল সম্প্রদায়ই সৎসঙ্গের মহৎ ফলের কথা বলেছেন। কাজেই একটু যদি স্থিরভাবে চিন্তা ক'রে দেখেন, তাহ'লে আপনার সমস্ত প্রশ্নেরই মূলে ঐ সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃই যে অনর্থ ঘটছে, তা বেশ উপলব্ধি হবে। সাধুসঙ্গ করতে গিয়ে শুধু বাইরের হুজুগ নিয়ে মাতামাতি করলে চলবে না।

অনেক দিন দিদির কাছে অনেক কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু আজ দিদির কথাগুলি যেমন—গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তেমনই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত।

শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল, যেন কোন অধ্যাপক শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। আরও মনে হইয়াছিল, আমার বন্ধুবর বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডিতাভিমানী; আজ তাঁহার সম্মুখে এইভাবের আরও যদি কিছু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দিদি বলেন, তাহা হইলে বন্ধুবরের গর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হয়। এইভাবের চিন্তা আমার মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভক্ত দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে প্রতিমাপূজা, এটা কি ভাবপ্রবণতা বা অন্ধবিশ্বাসের ফলে প্রচলন হয়েছে? এর মূলে কি কোন কল্পনাপ্রসূত ভাব আছে?

দিদি—বলেন কি? আর্য্যঋষিগণ কখনও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে বা ভাবাবেগে কিছু করেন নি। শাস্ত্রীয় বেদবিধি অনুসারে মৃন্ময়ী, প্রস্তরময়ী, দারুময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা চক্ষুদানাদি ক'রে দেবদেবীর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ক'রে নিয়ে, এক কথায় প্রতিমাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করবার ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং নিজেরাও তাঁর আরাধনা ক'রে অভীষ্ট ফল লাভ করেছেন। তারপর কোন মূর্ত্তিই যে কল্পনাপ্রসূত নয়, এ কথাও বিশ্বাস করুন। অধ্যাত্মবিদ্যাসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপন আপন সাধনালব্ধ যোগবলে দিব্যচক্ষুর সাহায্যে (বর্ত্তমান যুগের রঞ্জন রশ্মির আলোকে দেখার ন্যায়) যা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই প্রচার করেছেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন।

আপনারা পণ্ডিত, আপনাদের কাছে কোন শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে দেখিয়ে বাহাদুরী নিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যখন প্রসঙ্গ উঠেছে এবং প্রসঙ্গটি বর্তমান সময়োপযোগী ব'লে মনে হচ্ছে, তখন এ সম্বন্ধে প্রাণের দুটো কথা অকপটে আপনাদের কাছে নিবেদন করি। যে স্থলে অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক ব'লে মনে হবে দয়া ক'রে সংশোধন ক'রে দিবেন।

বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা—এই কয়টি ধর্ম্মপথের প্রধান সম্বল ব'লে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে বহুবার শুনেছি। আর একথাও তিনি বলতেন যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভে শাস্ত্রজ্ঞানই চক্ষুস্বরূপে। অবিশ্বাসী বা নাস্তিকজনের কোন সাধনাতেই অধিকার নেই। শ্রীভগবান প্রিয়সখা অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে জীবগণকে উপদেশ দানচ্ছলে বলেছেন—"ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" আবার অন্যত্র বলেছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" আবার এক স্থানে অধিকারী নির্ণয় করতে গিয়ে বললেন—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।' এ সব কি মিথ্যা ?

পণ্ডিত—অনেকে যে বলেন বাঙালি জাতি অনুকরণপ্রিয় এবং ভাবপ্রবণ, এ কথা কি সত্য?

দিদি—অনেকে বলেন বলবেন না; দু-একজন তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী

বাবুরা বলেন বলুন। কিন্তু যাঁরা বলেন তাঁদের বেশভূষা, চালচলন, হাবভাবে কি অনুকরণপ্রিয়তা প্রকাশ পায় না ? অপরের দোষ দেখতে হ'লে নিজেকে দোষশূন্য হতে হয়। ভাবের প্রাবল্যে কোথাও কোথাও কখন কখন কর্ম্মশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু কিছু যে দেখা যায় না তা নয়। কিন্তু তাতেই যে একটা জাতি ভাবপ্রবণ ব'লে নিন্দনীয় হবে, এমন কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। ভাবাবেগ যে কিছু নয়, সর্ব্বক্ষেত্রে এ কথাও বলা চলে না। পণ্ডিতজী! বিচার করতে হ'লে সব দিক ভেবেচিন্তে বিচার করতে হয়।

পণ্ডিত—আচ্ছা, কোন জন-হিতকর কার্য্য করতে গেলে অনেকে তাতে বাধা দেয়। তাতে কি সে কার্য্য হ'তে বিরত হ'তে হবে?

দিদি—কাজটি জন-হিতকর হ'লেও যাঁরা বাধা দেন বুঝতে হবে কোন না কোন প্রকারে তাতে তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগছে। তবে দু-চার জনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বহুর কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হওয়া সমীচীন নয়। তারপর আর একটা মস্ত বড় কথা—আত্মত্যাগের আদর্শই শুধু প্রয়োজন না, স্বার্থত্যাগের আদর্শ ও প্রয়োজন। জনকল্যাণকর কার্য্যে বাধাপ্রদানকারী নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রকার কৌশলই অবলম্বন ক'রে থাকে, তাদের সঙ্গে কলহ ক'রে অসন্তোষ সৃষ্টি না ক'রে ধীরভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মত, পরিবর্তন করিয়ে দিতে হবে। তা নইলে বিপ্লব উপস্থিত হয়ে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

এই সময় নাটমন্দিরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া দিদি দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। আমরাও দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন শুনিতে গমন করিলাম। বন্ধুবর বিদ্যারত্ব ভায়া যাইতে যাইতে আমাকে বলিলেন—''ভাই, আজ আমার সুপ্রভাত, সত্য সত্যই আমার কতকগুলি পুঞ্জীভূত সন্দেহ আজ দূরে হ'ল। প্রথম তোমার দাদাকে দেখে যা ভেবেছিলাম এই সামান্য ক্ষণের আলোচনায় আমার সে ভাব ধারণা দূরে হ'ল। তোমাকে বলতে কি, এখন আমার মনে হচ্ছে যে, তোমার দাদার কাছে থেকে সর্ব্বক্ষণ এইসব আলোচনা শুনি।'

আমি—তা থাক না ভাই, এঁরা তাতে সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট হবেন না।

বিদ্যারত্ন ভায়া কি যেন বলিতে চাহিলেন কিন্তু সেই সময় হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন। আমরা দুই-তিনজনে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলাম। আর তাঁহারও বলা হইল না, আমাদেরও শোনা হইল না।

পরমহংসদেব সম্বন্ধে দিদির উক্তি

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যা গৌরীপুরী দেবী। তাঁহার প্রধানা শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী দুর্গাপুরী দেবী। ইনি আমাদের ললিতাদিদির সহিত গৃহত্যাগের পর

সখীবেশ ধারণের পরে কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। দুর্গাপুরী দেবী শ্রীধাম নবদ্বীপ বাগানবাড়ীতে যাইয়াও দিদির সহিত নানা প্রকার লীলাতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন।

একবার অধম লেখক দুর্গাপুরী দেবীর আহ্বানে নবদ্বীপে তাঁহাদের এক উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল। সেই সময় দুর্গাপুরী দেবী ললিতাদিদির সহিত দেখা করিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন —"দূর থেকে লোকের মুখে যা শোনা যায়, কাছে এসে চোখে দেখে মিলিয়ে নিতে গেলে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়।'

দিদি—কেন একথা বলছ দিদি!

দুর্গাপুরী—তোমার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা শুনে মনে মনে এক রকমের ধারণা করেছিলুম। কিন্তু কাছে এসে তোমাকে দেখে এবং তোমার আচরণ ও কথাবার্তার ভঙ্গী দেখে আমার সে ধারণা আর ধ'রে রাখতে পারলুম না। সত্যি বলতে কি, শুনেছিলুম যা দেখলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দিদি—জয় গুরু জয় গুরু। দিদি ! আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁর আদেশমত ঠিক ঠিক পথে চলতে পারি।

দুর্গাপুরী—ঠাকুরের জীবনী আলোচনা ক'রে জানতে পারি, তিনি নাকি কোন সময় তোতাপুরীর কাছে নির্ব্বিকল্প সমাধি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ঐ তোতাপুরী মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন—'আমি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনা ক'রে যা পেরেছি, তুমি মাত্র তিন দিনের সাধনাতেই তা লাভ করলে। উত্তরে ঠাকুর 'মা' 'মা' ব'লে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন- 'মা! এ আবার কি করলি? কোত্থেকে একটা বোঝা এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মহিমা দেখিয়ে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ঢালতে লাগলি; আমার এসব কিছু, দরকার নেই—মা! কিছু দরকার নেই। শুধু তুই আমার মা আর আমি তোর ছেলে এইটে যেন মনে প্রাণে ঠিক রাখতে পারি দয়া ক'রে এই করিস মা!

দিদি—আমারও দিদি! তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা—এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁর সেবা, তাঁর সুখ-সম্পাদন, অবিচারে তাঁর আদেশ পালন করাকে জীবনের ব্রত ক'রে নিতে পারি। সুখদুঃখ কিছুতেই যেন ব্রত ভঙ্গ না হয়।

দুর্গাপুরী—পারি কি গো, তুমি তো ডঙ্কা মেরে সব শঙ্কা কাটিয়ে ঘুঁটি পাকিয়ে নিয়েছ। তোমার আর ভাবনা কি ?

অতঃপর উভয়ে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া কিছু সময় আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহার কোন কথাই দিদির নিকট হইতে আমরা সংগ্রহ

করিতে পারি নাই। পুনঃ পুনঃ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করার বলিয়াছিলেন— "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, আপনারে হবে সাবধান।" আমি ইহার পর আর কোনদিন এ সম্বন্ধে জানিতে চাহি নাই।

বাংলা ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে কিছুদিন পুরীতে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পূজনীয় রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপাদেশে মহাপ্রভুর লীলাসহচর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র নাট্যকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়া সেখানে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে সেই সময়কার মহান্ত গোপীদাস বাবাজীর নিকট শুনিয়াছিলাম, ললিতাদিদির নিকটে থাকিবার সময় তিনি নাকি প্রসঙ্গক্রমে একদিন বলিয়াছিলেন—

'গোপী! পরমহংসদেবের জীবনী আলোচনা করবে, অনেক কিছু, জানতে পারবে। তাঁর মুখে ঘন ঘন 'মা মা' ধ্বনি শুনে, ব্যাকুল প্রাণের অকপট প্রার্থনায় ভাববিহ্বল স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ গোবিন্দ' ধ্বনি শুনে কেউ কেউ নাকি তাঁকে উপহাস করতেন শুনেছি। পরমহংসদেব তাঁদের শ্লেষপূর্ণ উক্তি শুনে নাকি বলেছিলেন—'আরে আমি মায়ের নাম করছি আর তোরা ওসব কি বলছিস? আচ্ছা দাঁড়া, আজ আমি মাকে সব ব'লে দিব।'

তোতাপুরীও এক সময় এইভাবে বিদ্রূপের সূক্ষ্ম হাসি হেসে পরমহংসদেবকে অনেক কিছু বলেছিলেন। পরমহংসদেব তাঁকে বলেছিলেন—'সময় হ'লে মা তোমাকে এসব তত্ত্ব ভাল ক'রেই বুঝিয়ে দিবেন।' তাতেও তোতাপুরী নিবৃত্ত না হয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেছিলেন— ঐ যে তুমি 'মা মা' করছ, ও তোমার মা নয় গো—মায়া মায়া। বৈদান্তিকের কাছে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা বুঝলে?

পরমহংসদেব তোতাপুরীকে ন্যাংটা ব'লে ডাকতেন। তাঁর এইসব শুষ্ক ব্রহ্মভাবের কথা শুনে বললেন, — হ্যাঁ ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু তুমি দেখনি ন্যাংটা! আমি দেখিছি, তোমার ঐ ব্রহ্মই পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে কেঁদে সারা হয়। চোখ বুজে মনকে যতই বোঝাও না কেন—কাঁটা নেই, কিন্তু যেমনি প্যাঁট ক'রে পায়ে ফুটল অমনি উহু-হু ক'রে উঠলে। দিন রাত তুমি মনকে বোঝাচ্ছ—তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, তুমি জরামরণরহিত। কিন্তু যেমনি একটু সর্দ্দি কাশি এসে দেখা দিল বা অন্য কোনরূপে অসুস্থতা প্রকাশ পেল অথবা কোনরূপে রূপরসের প্রলোভন এসে উকি মারল অমনি সব গুলিয়ে গেল। তুমি তখন দুঃখ-যন্ত্রণার তাড়নায় ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রতিকারের চেষ্টায় তোমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। তারপর বলি, যদি তোমার কথাই সত্য ব'লে মেনে নিই, মা যদি মায়াই হন,

তাতেও তো দুঃখ করবার কিছু নেই। মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কি কেউ জ্ঞানের মন্দিরে ঢুকতে পারে? আমার বিরাট শক্তিময়ী মাতৃরূপিণী মহামায়ার দয়া না হ'লে কি দুঃখের অবসান কখনও হয় ?

আমি মায়ের সন্তান; তিনি দয়া ক'রে আমার পথ ছেড়ে দেন তাই আমি তাঁকে দেখি, তাঁর সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি রে। ন্যাংটো! জেনে রেখো, মায়ের কৃপা না হ'লে তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, কিছু হবার উপায় নেই—উপায় নেই।'

পরমহংসদেব ঈশ্বরকে স্নেহময়ী জননীরূপে প্রত্যক্ষ ক'রেই 'মা মা' ক'রে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদতেন আর বলতেন—'মা ! আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না, ধর্ম্ম জানি না, অধর্ম্ম' জানি না, ভাল জানি না, মন্দ জানি না, আমি জানি একমাত্র তোকে। যা করতে হয় তুই করিস মা।'

তিনি না চাইলেও জীবশিক্ষার জন্য মা তাঁকে দিয়ে এক এক ক'রে সব সাধন-পথের নিয়মকানুনগুলিই আচরণ করিয়ে নিয়েছেন। কখনও ভৈরবী এসে সাধন শিক্ষা দিলেন। কখনও তোতাপুরী এসে নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ শিক্ষা দিলেন। কখনও মুসলমান ফকিরের আনুগত্যে কোরাণের শিক্ষা চলল, আবার যীশুখ্রীস্টের চিত্র দর্শনে কখনও ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু যতই তিনি মত থেকে মতান্তরে—পথ থেকে পথান্তরে যাতায়াত করুন না কেন, আমরা কিন্তু তাঁর সহজ সরল ভাবে মাতৃ আরাধনা—মায়ের কাছে ছোট ছেলের মত আবদার ক'রে সন্তানের হক্ প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করাকেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে গ্রহণ না ক'রে পারি না।' (গোপীদাসের খাতা হইতে সংগৃহীত)

গোপীদাস নিজে আমাকে বলিয়াছেন—"কাকা। মায়ের (ললিতাদিদির) ভাণ্ডার কত ভাবের কত রত্ন দিয়ে যে পরিপূর্ণ, তা যাঁরা তাঁকে ভালভাবে ভোগ করবার সুযোগ পাননি তাঁরা বুঝতে পারবেন না। নবদ্বীপে অবস্থানকালে একদিন আমি তাঁর শ্রীচরণসেবা করতে করতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— 'মা! সেবা করতে গিয়ে মন চঞ্চল হয় কেন?' ললিতা মা তার উত্তরে আমাকে যা বলেছিলেন আমি সেটি আমার খাতায় লিখে রেখেছি, এই দেখুন।'

এই বলিয়া গোপীদাস খাতাখানি আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁহাকেই পড়িতে বলিলাম। তিনি পড়িতে লাগিলেন। অন্যান্য অনেক কথার পর লেখা আছে—

"গোপীদাস! মুখের কথায় যদি মন স্থির হয়ে যেত, তাহ'লে আর আচার্যপাদেরা এত সব নিয়মকানুন ক'রে দিতেন না। নিরন্তর সৎসঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করা এবং সৎবিষয়ের চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন। মনটাকে ভোগের অধীন ক'রে

ফেললে আর তোমার থাকল কি? বেশ বিচার ক'রে ভোগ করতে হবে।

গোপী! যা কিছুই কর না কেন, লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে সবই পণ্ডশ্রম হবে। তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব সবল ও কর্ম্মঠ আছে, কিন্তু যেকোন কারণেই হউক তোমার জিহ্বার আস্বাদগ্রহণশক্তি লোপ পেলে যেমন কিছুতেই সুখ পাও না, সেইমত হচ্ছে ভগবৎচিন্তাবোধ। যত কিছুই কর না কেন, অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবৎ স্মরণ-মনন না হ'লে মনে কিছুতেই যথার্থ শান্তি পাবে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে—মানুষ ক্ষুদ্র নয়, সৃষ্ট যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নির্জ্জনে ব'সে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যাও, শান্তি পাবেই পাবে।

বর্ত্তমান যুগে যেকোন কারণেই হোক আমরা ভক্তি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। "ত্যাগাচ্ছান্তির্নিরন্তরম্" একথা আমরা ভুলে গেছি। আমরা ত্যাগ করেছি সৎকে—ত্যাগ করেছি ইষ্টকে। অনিত্যকে ত্যাগ করলে সেই ত্যাগের দ্বারা এই ঘোর অবিশ্বাসী যুগেও যে সংসারকে পরম শান্তির আগার ক'রে নেওয়া যায়, এইসব ভোগ করতে করতেই যে তাঁর করুণালাভে জীবন ধন্য করা যায়, এইসব শিক্ষা দিতেই এইসকল মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে এসে নিজেরা আচরণ ক'রে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে যান।

সর্ব্বপ্রথম দরকার আহার-শুদ্ধির। আহার শুদ্ধ না হ'লে চিত্ত কিছুতেই স্থির হবে না। অভক্ষ্য ভক্ষণ ত্যাগ ক'রে সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধ ভাব বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন। "অভক্ষ্যস্য নিবৃত্তাত্তু বিশুদ্ধং হৃদয়ং ভবেৎ। আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতি স্বতঃ।।'

কেউ কেউ বলেন স্থূল দেহের স্থূল ভোগবিলাসের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ নেই। বাবা! তর্ক করলে চলবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষীগণ বহুভাবে পরীক্ষা ক'রে স্থির করেছেন যে, স্থুল আহার্য্য পরিপাক হ'য়েই নানারকমে মনকে পুষ্ট করে। 'আহারশুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধিঃ, চিত্তশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" এ বাক্য কোন-মতেই অস্বীকার করা চলে না। তাঁরা তোমার আমার চেয়ে বহু সহস্র গুণে দূরদশী ছিলেন। মনে স্থির বিশ্বাস রাখবে যে, স্থূল- দেহের সামান্য মালিনাও মনকে চঞ্চল করে। এইজন্যই ভগবৎ-আরাধনা বা অন্য কোন সৎকার্য্য করতে হ'লে আগে স্নান-শৌচাচারাদি দ্বারা স্থূল দেহটাকে মালিন্যশূন্য ক'রে নিতে হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নেই। তাই বলি যেভাবে স্থুলে দেহটাকে রাখলে মনে কোনরূপ চঞ্চল না আসে, সেইভাবে রেখে বাইরের কোলাহল থেকে একটু তফাতে থেকে স্থির ধীরভাবে ইষ্টচিন্তায় রত হবে।

গোপী—বিষয় থেকে মনকে ইষ্টচিন্তায় দিতে পারি কই?

ললিতা মা—বিষয়ভোগ বাসনা হ'তে মনকে ফেরাতে হ'লে তা যে আপাতঃ মনোরম এবং পরিণামে অত্যন্ত দুঃখদায়ক, এই ভাবটি বিশেষ বিচারের দ্বারা ঠিক ক'রে নিতে হবে।

গোপী—এ কি আমার দ্বারা সম্ভব হবে মা ?

ললিতা মা—হতাশ হ'য়ো না গোপীদাস! একবারে না হয় শতবার—সহস্রবার চেষ্টা কর। অভ্যাসের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে। গীতায় শ্রীভগবান জীবশিক্ষার জন্য প্রিয় সদা অর্জ্জুনক উপলক্ষ্য ক'রে বলেছেন—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।' বিষয়ের ধ্যান করতে করতে যেমন বিষয়ই লাভ হয় এবং সেই বিষয়ের সঙ্গপ্রভাবে অন্যান্য সর্ব্বনাশকারী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির উদয় হ'য়ে যেমন ধ্যানকারীকে অধঃপাতিত করে, সেইরূপে ঐ সর্বনাশকারী বিষয়চিন্তা না করে সর্ব্বমঙ্গলময় ইষ্টচিন্তা করলে ধ্যানকারীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই যে সাধিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

আনন্দ-রসঘন নিত্যশুদ্ধ ইষ্টদেবের চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারলে—প্রভু, সখা, প্রিয়তম, মাতা, পিতা প্রভৃতি যেভাবে তোমার ভাল লাগে সেই ভাবের মধ্যে তাঁকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে নিয়ে তদনুরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।

গোপীদাস! তাঁর চিন্তা করতে করতে যখন সাধকের শরীর পুলকিত হবে, মন প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠবে, প্রেমাশ্রু, বর্ষণে মুখ বুক ভেসে যাবে, ভাবগদগদ বাক্যে কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসবে, তখন যে তিলমাত্র সময় পাবে না অন্য বিষয় চিন্তা করতে। এ অবস্থায় সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য। এই চার প্রকার মুক্তিও সাধকের দ্বারে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে তার কৃপাদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবে। "রোমাঞ্চেন চমৎকৃতা তনুরিয়ং ভক্ত্যা মনো নন্দিতম্। প্রেমাশ্রুণি বিভূষয়ন্তি বদনং কণ্ঠং গিরো গদ্‌গদাঃ।। নাস্মাকং ক্ষণমাত্রমপ্যবসরঃ কৃষ্ণার্চ্চনং কুর্ব্বতম্। মুক্তির্দ্বারি চতুর্ব্বিধাপি কিমিয়ং দাস্যায় লোলায়তে।।" মনে রেখো গোপীদাস! আগ্রহ যদি তোমার অকপট হয় নিশ্চয়ই তিনি তোমার সহায় হবেন। 'সদিচ্ছা পূর্ণকারী শ্রীভগবান' এ কথায় কোন ভুল নেই।' (গোপীদাসের খাতা হইতে)

গোপীদাস মহান্ত তাঁহার খাতা হইতে এই প্রসঙ্গটি পাঠ করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"কাকা! যা পেয়েছিলুম তার আর তুলনা নেই। দুর্ভাগ্য যে, কাছে থেকে বেশীদিন সেবা করতে পারলুম না বা তাঁর আদেশমত কাজ করতে পারলুম না। দুর্দ্দৈব কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ল।"

দিদির গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা

কি পুরীতে কি নবদ্বীপে দিদির গুরুভক্তি ও গুরুসেবা-পরিপাটি দর্শন করিয়া অনেকেই "ন ভুতো ন ভবিষ্যতি" বলিয়া প্রসংশা করিয়াছেন। কেহ কেহ "ললিতাদিদি গুরুসেবার মূর্ত্ত বিগ্রহ" একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দিদির সেবানিষ্ঠা সত্য সত্যই আদর্শনীয় ছিল। শ্রীগুরুদেবে তাঁহার কি জাতীয় ধারণা ছিল, ভাষা দ্বারা তাহা প্রকাশ অসম্ভব; তথাপি আত্মশোধন মানসে একদিনের একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করি।

আষাঢ় মাস, শ্রীগুরু-পূর্ণিমার রাত্রি। সকালের দিকে বেশ একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তথাপি সমস্ত দিনটাই আকাশ ঘোর মোচ্ছন্ন রহিয়াছে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টির সহিত একটু ঝড় বাতাস হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, এদিকে নির্ম্মল পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণ সমগ্র বাগানবাড়ীটির উপর পড়িয়া বাগানের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। জলে-ভোজা গাছের পাতায় চন্দ্রকিরণ লাগিয়া মনে হইতেছে যেন অসংখ্য শ্বেতপুষ্পশোভিত বৃক্ষশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীমন্দিরের সন্ধ্যারতির পর যথারীতি দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া ৭।৮টি বিদেশী ভক্ত দিদির ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। অধম লেখকও তাঁহাদের সহিত একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিছু সময় পরে ললিতাদিদি সেখানে আসিয়া তাঁহার জন্য রক্ষিত স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ যথাযথভাবে প্রণামাদি করিয়া বসিলে দিদি সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় এবং আগমনের কারণ জানিয়া লইয়া বলিলেন—"আজ বড়ই শুভদিন, এমন দিনে করুণাময় প্রভু যে আমাদের ধামদর্শনের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন, এটা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।"

জনৈক বয়স্ক ভদ্রলোক দিদিকে বলিলেন—"মা! শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার শ্রীমুখে কিছু শুনতে সাধ হয়, কৃপা ক'রে কিছু বলবেন কি?"

দিদি—বাবা! আমি অবলা অশিক্ষিতা গোয়ালিনী, আমার তো কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নেই; তার উপর আবার সর্ব্বতত্ত্বসার শ্রীগুরুতত্ত্ব জানতে চাইছেন, আমি কি বলব বলুন?

ভক্ত—না মা, বঞ্চিত করবেন না; দয়া ক'রে কিছু বলুন।

দিদি—বাবা! সে করুণা বরুণালয় প্রেম-ঘন বিগ্রহের তত্ত্ব কি দু-চার কথায় ব'লে শেষ করা যায়? যিনি আপন মহিমায় সকল সময় সর্ব্বত্র বিরাজিত থেকে নির্ম্মল জ্ঞানের আলো জ্বেলে অজ্ঞানীর অজ্ঞান অন্ধকার নাশ ক'রে দিচ্ছেন, চির বহির্ম্মুখীকে কৃপাকর্ষণে টেনে নিয়ে অন্তর্ম্মুখী করে দিচ্ছে, সেই অযাচিত

কৃপাকারী অজ্ঞান তিমিরনাশক শ্রীগুরুদেবের অপার অসীম করুণার কি তুলনা আছে?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার রসিকভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীচরণ একস্থানে বলেছেন—"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস।।"

অন্যত্র বলেছেন—"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।"

শ্রীগুরুস্বরূপের কথা স্মরণ হলে প্রাণ আনন্দে ভরপুর হ'য়ে যায়। নিখিল জীবন-হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত; তাই স্থানাস্থান কালাকাল বা পাত্রাপাত্রের কোনরূপ বিচার না ক'রে সর্ব্বত্র কৃপা প্রকাশের জন্য লালায়িত। এ কৃপা, এ দান যে কি? তা মুখে ব'লে বোঝাবার নয়; শরণাগতভাবে প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার। সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রীগুরুকৃপাই সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির মূল। নিজের কোন প্রয়োজন না থাকলেও নিজে আচরণ ক'রে আশ্রিতজনকে নানাভাবে ভজনমুদ্রা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বাবা! 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' গুরু কৃপা না হ'লে কিছু হয় না—হবে না—হতে পারে না এ নিশ্চয় জানবে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে লিখেছেন—"শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমাগতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।" এই আশা কি? তাহার ব্যাখ্যায় আচার্য্যপাদ বলেছিলেন---"শ্রীবৃন্দাবনে মণি-নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামরব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা আশা।" উত্তমগতির ব্যাখ্যায় বলেছেন---উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমা গতিঃ। "পুনরায় বলেছেন---"প্রাপ্যবস্তুনাং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ পাদসম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা।" যাঁর করুণায় এমন উত্তমগতি লাভ হয়, প্রেমসেবাদি লাভ করিয়া আশা পূর্ণ হয়, সেই পরম করুণ অযাচিত কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের মহিমার কথা আমার মত ক্ষুদ্রমতি বিষয়সেবী ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর কি ক'রে বর্ণনা করবে? যাই হোক, আজ শুভ গুরু-পূর্ণিমা তিথিতে আপনারা অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়ে আমাকে দিয়ে শ্রীগুরু-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুটো কথা আলোচনার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলেন। আপনারা পণ্ডিত শাস্ত্রাদি আলোচনা ক'রে তত্ত্ব নিরূপণ ক'রে নেবেন। জয় গুরু, জয় গুরু!"

দিদি এই বলিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আর কিছু বলিলেন না। দিদির গম্ভীর ভাব দেখিয়া সহজেই অনুমান হইল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে কোনও অপ্রাকৃত-রস ভোগ করিতেছেন। কিছুক্ষণ

এইভাবে থাকিয়া দিদি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

হতভাগ্য লেখক ভক্ত-শ্রোতাগণের একপাশে বসিয়া সকলই শুনিতেছিল এবং দিদির অজ্ঞাতসারে কথাগুলি কাগজে টুকিয়া লইতেছিল। দিদি উঠিয়া যাইতেই পূজনীয় নন্দদাদা বলিলেন—"ভট্টাচার্য্য মশাই, এইবার একখানি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে গান করবেন?" আপত্তি বা কোনও কারণ দেখাইবার কোনরূপ অবসর না দিয়াই একটা হারমোনিয়ম আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া দিলেন। অগত্যা ভক্তকবি সুবোধচন্দ্রের নিম্নলিখিত শ্রীগুরুমহিমাদ্যোতক গানখানি গীত হইল। পাঠকগণের অবগতির জন্য গানখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দে ভৃঙ্গ হয়ে থাক। (রে মন)
নিত্যানন্দে অঙ্গরাগ পূণ্যপরাগ মাখ।।
(যবে) ব্রজসুন্দর প্রেম-সৌরভে
বহিবে মলয়া মহা উৎসবে
গুঞ্জনে গুরু জয় গৌরবে
মধুচন্দন মাখ।।
তমসাঘন তিমির অন্ধ সংশয়ভরা নয়নে
জ্ঞানাঞ্জন লেপন করি দেখাইল দীনশরণে
পরম করুণা কণিকা বিতরি
মানস-মুকুর মার্জ্জিত করি
রিক্ত এ দাসে যে দিয়াছে ভরি
সেই দীনদয়ালে ডাক।।

শ্রোতাগণের আগ্রহে দুই-তিন বার গানখানি গাওয়া হইল। শেষে নন্দদাদার আদেশে শ্রীগুরুদেবের জয় দিয়া গান শেষ করিয়া আমরা প্রসাদ পাইবার জন্য চলিলাম। অন্যদিকে দিদি প্রসাদ পাইবার সময় অন্ততঃ একবারও দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। শেষে সংবাদ লইয়া জানিলাম, দিদি শ্রীগুরুতত্ত্ব আলোচনার পর কেমন যেন আবিষ্টভাবে পড়িয়া আছেন, তাই আর বাহিরে আসিতে পারেন নাই।

প্রবন্ধ প্রাপ্তি

কোঁড়ারবাগানের বাড়ী হইতে মাসিলায় আসিয়া বাস করিবার পর তিন-চার বৎসর নিয়মিত ভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপে উৎসবের সময় ছাড়াও দুই-তিন বার

যাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এমন কি কখন কখন ১৫।২০ দিন দিদির সান্নিধ্যে থাকিয়া উপদেশাদি গ্রহণের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। একবার মাঘ মাসে বড় উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বেই সস্ত্রীক নবদ্বীপে গিয়াছি এবং মঠের পূর্ব্বদিকে রাস্তার উপরেই একটি বাড়ীতে আছি। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র ও কন্যা তিনজন ছাড়া আর একটি ভক্ত ছিলেন।

একদিন বৈকালে বাগানবাড়ীর বিরাট ফুলের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, হাতে শ্রীনামের মালা। অভ্যাসবশে মালা চলিতেছেন কিন্তু মন নানা জাতীয় ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে। একটা গাঁদাফুলের গাছে অফুরন্ত ও অস্বাভাবিক বড় বড় ফুল দেখিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইয়াছি, হঠাৎ কানে আসিল—"দীনেশ, ও দীনেশ ! ওখানে কি হচ্ছে? এস, এস, এখানে এক মজার ব্যাপার ঘটেছে।" ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, পূজনীয় বিহারীবাবাজী ফুল-বাগানের দক্ষিণ দিকের ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। আমি ব্যস্তভাবে সেখানে গিয়া কি ব্যাপার জানিতে চাহিলে বিহারীবাবাজী বলিলেন—"দিদির বারান্দায় যাও দিদির পদলেখার খাতার মধ্যে একখানা কাগজ পাওয়া গিয়েছে, তাতে অনেক ভাল ভাল কথা সব লেখা আছে। সকলেই খুব মন দিয়ে শুনছে।" আমি আর বিলম্ব না করিয়া বাগানের গেট দিয়া বাহির হইয়া দিদির ঘরের দিকে ছুটিলাম। সেখানে যাইয়া দেখি, আমাদের সুরেনদাদা (স্বরূপদাস), নবগোপালদাদা, বুড়ো বিহারদাদা, যুগল দত্ত, মাণিক মল্লিক প্রভৃতি অনেকেই মণ্ডলীবদ্ধভাবে বসিয়া কি যেন আলোচনা করিতেছেন। স্বরূপদাসের হাতে একখানি কাগজ। তিনি মধ্যে মধ্যে সেটি পাঠ করিতেছেন এবং তাহারই কোন কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। বসিয়া বসিয়া পাঠ শুনিলাম এবং পাঠান্তে সেটি সংগ্রহ করিয়া নকল করিয়া লইয়াছিলাম। তখন 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিব এই উদ্দেশ্যেই আনিয়াছিলাম। কিন্তু দিদির অনুমতি না পাওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই।

আজ নিষেধ করিবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহ নাই। আর দিদির সম্বন্ধেই যখন যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তখন এটি পাঠকগণকে উপহার দিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়াই মুদ্রিত করিলাম। কাগজখানিতে লেখা ছিল—

"প্রাচীন তত্ত্বদর্শী সাধকগণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নব নব রূপায়ণের মধ্য দিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের বিভিন্ন ছন্দোময় এক পরম সত্ত্বার সন্ধান পাইতেন। শুধু সন্ধান পাইয়াই যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে সেই বিভিন্ন ছন্দোময় পরম সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত

করিয়া দিয়া সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদনে বিশ্ববাসী মানবকে বিশেষভাবে অধিকারী করিয়া দিতেন। এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কি উপায়ে সনাতন সত্যপথে চলিয়া পরিবর্তনশীল কালের বিভিন্ন গতির বিভিন্নরূপে দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া আনন্দময় জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগে সমর্থ হয়, তাহাও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে কি জানি কেন সে ধারা ধরিয়া, ঋষিগণের মঙ্গল নির্দ্দেশ মানিয়া সেই পরমানন্দময় রসাস্বাদনে অগ্রসর হইবার আগ্রহ বড় কেহ দেখায় না। এটা ভাল কি মন্দ, যুগের ধারা কি শিক্ষার দোষ, সে সব বিচার এখানে করিতে চাই না। আর করিলেও যে, কেহ বিশেষ আগ্রহ করিয়া শুনিবে তাহাও মনে হয় না। তথাপি শ্রীগুরুদের কৃপাপ্রেরণা দ্বারা হৃদয়ে যে ভাবটি জাগাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না।

বেদ সামচ্ছন্দে যে দেবতার বন্দনা গান করিয়াছেন, তিনি হইলেন ইন্দ্র। বেদের এই ইন্দ্রদেবতাই নিজ উপাসনা দ্বারা আনন্দঘন শ্রীগোবিন্দের সাধনার আবশ্যকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীগোবিন্দের গোবর্দ্ধনধারণ লীলা দর্শন করিয়া আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র শক্তিবিশিষ্ট মনে করিয়া গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোবিন্দপদে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিলেন এবং গোবিন্দকে গো-গণের (ইন্দ্রিয়গণের) ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিয়া নানাভাবে নিজ অযোগ্যতা জানাইলেন।

শুধু ইন্দ্র নয়—মিত্র, সোম, বায়ু, অগ্নি ও বরুণ সকলেই সেই অতুলনীয় ভুবনমোহন শ্রীগোবিন্দের অরুণ চরণ-কমলের নখ-কিরণ গরিমায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্ব ভুলিয়া শ্রীচরণতলে লুটাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এ সকল কথা আমাদের মনগড়া কথা নহে; নিবিষ্টচিত্তে বেদ পুরাণ ইতিহাসাদি আলোচনা করিলেই ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তারপর ভাগ্যবান সাধক রসময় ঋষভ দেবতার এই দেবমোহন লীলাকে যেদিন আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন, সেদিন মধুর মধুর ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। দশদিক ব্যাপ্ত হইয়া ধ্বনি উঠিল—

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু, ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ,
ওঁ মধু, নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা,
ওঁ মধুমান নো বনস্পতির্মধুমান্নস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।'

ইত্যাদি—বৃঃ আঃ ৬।৩।৬

বিশ্বপ্রকৃতির এই গোপন চাতুরী কি জানি কোন্ অপ্রাকৃত প্রভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের মধ্য দিয়া অতি সুন্দরভাবে উজ্জ্বলতমরূপে তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের

এই অপ্রাকৃত আনন্দবার্ত্তা নানাছন্দে নানাভাবে বিশ্বসংসারে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহারা বলিলেন—এ ধামের তরুগুল্মলতা এমন কি ধূলিকণা পর্য্যন্ত আনন্দময়।

শ্রীবৃন্দাবন যে চিন্তামণিময় ভূমি, এ কথা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় আমরা অতি পরিষ্কার ভাবেই জানিতে পারি। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্যচিন্তামণিধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক কমল।।
তার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।।
ও রূপ লাবণ্যরাশি অমিয় পড়িছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরক মোর মনে।।

ভাবাবেগে ভক্ত সাধক এই পদের ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়াছেন— 'ব্রজের এক একটি রজঃরেণু কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে।" আবার বলিয়াছেন— "সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হেথা গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে।" ইত্যাদি।

চিন্তামণিময় ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন, ইত্যাদি বাক্যে শুধু, ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, এই আনন্দময় ধামের কোটি কন্দর্প বিজয়ী দেবতা শ্রীগোবিন্দই জীবের একমাত্র আরাধ্য। ইঁহাকে আরাধনা করিলে জীবের যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান হইবে। এবং জীব দুর্ব্বার কামনা-বাসনার হাত হইতে অক্লেশে পরিত্রাণ পাইয়া পরম শান্তিময় স্নিগ্ধ প্রেমানন্দের অধিকারী হইবে।

জীব যতই মায়ামুগ্ধ আশাপাশবদ্ধ হউক না কেন, এইরূপ দেবতাকেই তো সে চায় তাই ঘোষণাবাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই নানাভাবে উপাস্য দেবতার সন্ধানে সাধনা চলিতে লাগিল। ক্রমে দেবতাও আসিয়া বিভিন্নভাবে সাধককে আপনার কাছে টানিতে লাগিলেন।

এইভাবে চির-মুধুময় শ্রীবৃন্দাবনধামের চিরসুন্দরের অপূর্ব্ব লীলামাধুরী দিক হইতে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল। আজও সে লীলার বিরাম নাই, তবে সকলের

দৃষ্টিগোচর হয় না। শুনিয়াছি—"অদ্যাপিহ সেই লীলা বৃন্দাবনে হয়। ভাগ্যবান জনে তাহা প্রত্যক্ষ করয়।।"

শ্রীবৃন্দাবনধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—'বিন্দ্রাবন অউর গৌলক তৌলে তুলসীদাস। যো ভারি উত্তঁ রহে গিয়া হাল্‌কি চঢ়ে আকাশ।।"

শ্রীবৃন্দাবন বিনোদিনী শ্যামজলদজড়িত স্থির বিজুরীসমা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধিকাদি গোপীগণের কৃপা যিনি কণামাত্রও লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আনন্দময় বৃন্দাবনধামের নিত্য লীলারস কথঞ্চিৎ আস্বাদনে অধিকারী।

শ্রীবৃন্দাবনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব হওয়া বড় সহজ নয়। মর্ত্ত্যভূমি বৃন্দাবনের লীলাকে অমর্ত্ত্য সত্যের রসমাধুরীতে উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্য—অঘটনকে সংঘটন করাইবার জন্য এক অপরূপ মাধুরীতে বৃন্দাবনের গুপ্তলীলা ব্যক্ত করিলেন। এই ব্যক্ত করিবার কর্ত্তা কে? উত্তরে সমস্বরে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ কর্ত্তা আর কেউ নয়, এ আমাদের শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি। মধুর শ্রীবৃন্দাবনের যুগলমিলন-মাধুরী আজ সঙ্কীর্ত্তনধ্বনির মধ্য দিয়া একসঙ্গে এক অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। এই শচীনন্দন গৌরহরির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালায় নবজীবনের জোয়ার দেখা দিল। সেই জোয়ারের প্রেমপ্লাবনে জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই ভাবুক কবি ভাবের আবেগে গাহিয়াছেন—"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।"

এই অপূর্ব্ব প্লাবনে কলিকলুষিত জীবের তথা ভারতের সকল গ্লানি কালিমা বিধৌত হইয়া গেল, ভারত-ভূমির আচণ্ডালাদি সকলকে প্রেমে নাচাইয়া দিল, ধনী নির্ধনী এক হইয়া গেল, অতিবড় নাস্তিকও ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিল। তার্কিক তর্ক ভুলিল, ছুঁৎমার্গ কোথায় যেন লজ্জায় মুখে লুকাইল। এক কথায় সকলেই ভেদবিভেদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া ধন্য হইলেন।

"তে হি নো দিবসা গতাঃ" আজ আর সেদিন নাই; আজ জগতের যে দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, সেই দিকেই যেন হা-হুতাশভরা নিরানন্দময় ছন্নছাড়া ভাব। তাই দেশের এই দুর্গত পরিস্থিতি দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—প্রভু! তুমি আবার এস; তেমনি করিয়া আবার আসিয়া প্রেমের বন্যায় সকলকে ভাসাইয়া দাও। পতিত আমরা, তাপিত আমরা, ভ্রান্তপথে পথহারা পথিক আমরা, ভেদ বিরোধ দ্বন্দ্বে অভিভূত আমরা তোমার প্রেমবন্যার এককণা স্পর্শে ধন্য হইয়া যাই। মহাজনমুখে শুনি, তুমিই নাকি বলিয়াছ—"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ

গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।" সেদিনের আর কতদিন বাকি? আমাদের ভাগ্যে কি সে সুখময় লীলদর্শন হইবে না? তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

জয় শচীনন্দন জগজনরঞ্জন
ত্রিভুবনবন্দন দয়াময় হে।
অনাথশরণ আশ্রিতপালন
পতিতোদ্ধারণ দয়াময় হে।।

জয় জয় শ্রীগুরু, জয় জয় শ্রীগুরু, জয় জয় শ্রীগুরু। অলমিতি।"

লেখাটি দিদির হাতের ছিল, কিন্তু রচনাটি কার জানিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলাম। উপস্থিত অনেকেই দিদিকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, কিন্তু দিদি কোনও উত্তর না দিয়া 'জয় গুরু' 'জয় গুরু' বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। এখন পাঠকগণ এ প্রবন্ধটির রচয়িতা কে অনুমান করিয়া লউন।

দুঃখে ভয় কি?

কাজে দেখাইতে না পারিলে শুধু মুখে বড় বড় কথা বলিলেই হয় না। সংসার অনিত্য, দেহ অনিত্য, বিষয়বৈভব স্ত্রীপুত্র সকলই অনিত্য—এ কথা বোধ হয় দিনে শতবার বলি। কিন্তু এই অনিত্যকে ছাড়িয়া বা ভুলিয়া নিত্যকে ধরিবার বা ভাবিবার চেষ্টা দিনের মধ্যে কতটুকু করি, এই তো আমাদের দশা। দেহে কোন ব্যাধির প্রকাশ হইলে আর রক্ষা নাই—'বাবা গো, মা গো, গেলাম গো, কে আছে গো" ইত্যাদি রবে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি। কিন্তু সেই নিত্যসত্য চিরমঙ্গলময়ের নাম একবারও মুখে বলি না। আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা যন্ত্রণাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নামোচ্চারণের স্বরও বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেহ কেহ বেশ দঢ়স্বরেই ভগবানের উদ্দেশ্যে বলেন—

ভেবেছ কি দুঃখ দিয়ে ভুলিয়ে দিবে মোরে?
বেদনার আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিবে দূরে?
ভুলে যাও হে দুঃখহারী হরি!
আমি সার করেছি নামের তরি।
দুঃখ শেষে দুঃখ পাবে তোমার নামের জোরে

আবার আর এক রসিক ভক্তের মুখে শুনি—

দুঃখ এলে বলব হেসে,
আয় লো সখি আয় লো ঘেঁষে
কর দেহের সঙ্গে কোলাকুলি

আমার আমি তো তুই পাবি না।
আমি এখন দরিয়ার পার
সেথায় যেতে পারবি না।

ললিতাদিদির জীবনে আমরা এ ভাবটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি বহুবার বহু ঘটনায়। কি করিয়া রোগযন্ত্রণায় তিনি হাসিমুখে থাকিতেন, এ প্রশ্ন অনেকেই তাঁহাকে করিয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমাখা মুখে 'জয় গুরু জয় গুরু' বলিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে নিরস্ত করিয়াছেন।

একবার মঠবাসী একজনের যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি শুনিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন—"প্রাকৃত পচা দেহের জ্বালা-যন্ত্রণায় যাতে মন নিবিষ্ট না হয় তার চেষ্টা কর ভাই! লীলাগত নিজদেহে সর্ব্বদা প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর কাছে কাছে থেকে তাঁহাদের লীলার সহায়কারিণী হ'তে চেষ্টা কর, জীবন ধন্য হবে, সকল জ্বালার শান্তি হবে। ভাই! আমাদের আর বলবার বা করবার কি আছে ? পরমমঙ্গলময় শ্রীগুরুদের যখন যেখানে যে অবস্থায় রাখবেন, তাঁর কৃপায় দান ব'লে তাতেই মনকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা কর। আমাদের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু ভাবি বা বুঝি, তা অপেক্ষা করুণাময় অনেক বেশী ভাবেন বা বোঝেন। কাজেই আমাদের প্রাণের কাতরতা তাঁর শ্রীচরণে জানিয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। মনে রেখো কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে।"

বিশ্বাস ও প্রাপ্তি

শ্রীধাম নবদ্বীপে অসংখ্য ঠাকুরবাড়ী। কোনটি প্রাচীন, কোন কোনটি পরবর্ত্তী কালে হইয়াছে। অনেক ঠাকুরবাড়ীতেই ভেটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দিদি বাগানবাড়ীতে ভেটের ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। অবশ্য এ জন্য নবদ্বীপের অনেক প্রভুসন্তানও দিদি উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। নানাভাবে নানা প্রকার কটাক্ষ দিদিকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

ভেট তো দূরের কথা, কোনরূপে মাসিক বন্ধানি করিতেও দিদির ঘোর আপত্তি ছিল। ভক্তেরা ইচ্ছামত যখন যাহা দিতেন, দিদি পরমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া সেবায় ব্যয় করিতেন। মাসে মাসে কেহ কিছু দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দিদি তাঁহাকে বলিতেন—"আপনি যখন যেমন ইচ্ছা সেবার জন্য দিতে পারেন, আমরা তাহার কোন হিসাবনিকাশ রাখিতে পারিব না বা কোন সময় না দিলে তাহার জন্য কোনরূপে তাগিদও করিতে পারিব না। আপনি যদি মনে করেন আমরা আপনার সাহায্য নিয়মিতভাবে পাইবার জন্য আপনাকে তাগাদা করিব,

তাহা হইলে কিন্তু ভুল বোঝা হইবে। শ্রীগুরুদেবের এইরূপেই আমাদের উপর আদেশ।”

সেবা করিবার অকপট ইচ্ছা থাকিলে যে, কোনরূপ অভাব হয় না, এ কথা অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম; কিন্তু প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল দিদির কাছে। সেবক আসিয়া জানাইল—অমুক জিনিস নাই। দিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“যাঁর কাজ তিনিই ব্যবস্থা ক'রে দিবেন। তোমরা সেবক, তোমাদের কাজ তোমরা কর। কাজের প্রেরণা প্রাণে জাগিয়ে দিয়ে তিনি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকবেন? যিনি প্রেরণা জাগিয়েছেন, তিনিই সমাধান করবেন।” পাঠকগণ অভাগার কথা বিশ্বাস করুন, আশ্চর্য্যভাবে অতি অল্প সময় মধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একদিনের একটি ঘটনা যাহা আমার সম্মুখে হইয়াছিল তাহা বলি।

একবার বড় মহোৎসবের সময় মালপোয়া প্রস্তুতের জন্য গুড়ের অভাব হয়। নবদ্বীপ বাজারে গুড় নাই; সকলেই চিন্তিত। দিদির কাছে বলার দিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘যদি বৈষ্ণবসেবায় মালপোয়া দেবার তাঁর ইচ্ছা থাকে তবে তিনিই ব্যবস্থা করবেন।” আমরা দিদির অজ্ঞাতসারে কি ভাবে কি করা যায় সেই পরামর্শ করিতেছি। এমন সময় নবদ্বীপ স্টেশন হইতে সংবাদ আসিল যে, একটি ওয়াগানে পঁচিশ কলসী গুড় আপনাদের জন্য আসিয়াছে, আপনারা শীঘ্র লইয়া যাউন। দীন লেখক আশ্রমের সেবকগণের সঙ্গে যাইয়া দুই-তিন ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত গুড় লইয়া আসিল।

গীতাপাঠে আমরা দেখি শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—“দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ২/৫৬

ললিতাদিদির জীবন অননুসন্ধান করিলে প্রত্যেকটি কার্য্যের মধ্যে আমরা ঐ সকল লক্ষণ দেখিতে পাই। কোন জিনিস প্রাপ্তিতেও যেমন, আবার কোন জিনিস হারাইলেও সেইরূপে, সমভাব সর্ব্বদা ললিতাদিদির মধ্যে প্রকট ছিল। এ যে কেবল বাহিরে, তাহা নহে, ভিতরেও কোন বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হইত না।

একবার নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর ঠাকুরঘরের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে ঠাকুরের রূপার সিংহাসন, গহনা ও অন্যান্য বহু মূল্যবান জিনিস লইয়া গিয়াছিল। দিদি তাঁহার একজন ভক্তকে সেই সংবাদ জানাইতে কি ভাবের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রখানির কিয়দংশ পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। অন্যান্য কথার পর দিদি পত্রে লিখিয়াছেন—

“....গত মঙ্গলবার রাতে প্রাণেশ্বরীর ঘরের বাহিরের দরজার তালা ভাঙ্গিয়া

ও ভিতরের দুইটি তালা ভাঙ্গিয়া নন্দালয়ের নারায়ণের ছোট রূপার সিংহাসন, সখীদের হাতের চুড়ি, মটরমালা, মহাপ্রভুর নূপুর, বেঁকি, পাঁজর, বিছাহার, মটরমালা ও কাণের মটরমালা প্রভৃতি প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকার গহনা রঙ্গিয়া প্রভু কাহাকে দিয়া দিয়াছেন। বেশ আনন্দে আছেন। তোমাদের প্রভুর রঙ্গ তোমরাই বোঝ। ইতি—

তোমাদের দিদি

পাঠকগণ। ভাষা দেখিয়া প্রাণের ভাব অনুভব করুন। ললিতাদিদি কি জাতীয় ভাব লইয়া মঠে অবস্থান করিতেন এবং নিজেকে সেবক-সেবিকাগণের মধ্যে কোথায় বসাইয়া কার্য্য করিতেন, সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবার আছে। যদি সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে স্থানবিশেষে এ বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

না চাইতে অনেক পাই

ললিতাদিদির ঝাঁজপিটা মঠে অবস্থান সময়ের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করা আমার সাধ্যাতীত। তখনকার সঙ্গী যাঁহারা সর্ব্বদা দিদির নিকট থাকিতেন, তাঁহারা অনেকেই এখন অপ্রকট। যাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কেহ বলেন স্মরণ নাই। কেহ বলেন ও সব কি হবে, ইত্যাদি। নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরের চড়ায় পূজনীয়া বিনোদিনীদিদির নিকট গিয়াছিলাম, পূজনীয় অদ্বৈত দাদাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিশেষ স্নেহ-কৃপা দেখাইয়া বলিলেন— 'তোমাদের ললিতাদিদির আদর্শ। শ্রীগুরু সেবা, কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্যনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা—এইগুলিই বিশেষ লক্ষ্য করবার। কোন্‌দিন কখন কি করেছে না করেছে, সেসব গুছিয়ে বলবার মত সামর্থ্য এখন আর আমার নেই। তার উপর সব কথা মনেও নেই। তবে জেনে রাখ—ললিতার দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে, তার উপর কত্তা (বড়বাবাজী মহাশয়), নবদ্বীপদাদা ও গোবিন্দদাদা প্রভৃতি যেভাবে যখন যে আদেশ করেছেন, বিনা আপত্তিতে তা পালন ক'রে তাঁদের সুখী করেছেন। কোন অবস্থায় কোনদিন কোনরূপ বিরক্তিভাব তার দেখতে পাই নি।"

এইভাবের টুকিটাকি যেখানে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সাজাইয়া আপনাদের নিকট ধরিয়া দিলাম। যাহার যেভাবে আস্বাদন করিয়া সুখ হয় করুন। দিদির যথালাভে সন্তুষ্টির বহু ঘটনা আছে। আর একদিনের একটি ঘটনা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিতেছি।

একদিন বৈকালবেলা ঝাঁজপিটা মঠে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া মঠবাসী কয়েক মুর্ত্তির সহিত শ্রদ্ধেয় নগেনদাদার ঠাকুরসেবা, বৈষ্ণবসেবা, আত্মীয়বন্ধু-বান্ধবগণের সেবা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। দিদি মুখে প্রয়োজন মত কথার উত্তর দিতেছেন, কিন্তু হাত দুটিই সেবার কাজে নিযুক্ত। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সদাহাস্যবদন নগেনদাদা দিদিকে বলিলেন—"আচ্ছা দিদি ! তুমি তো সব সময়ই একটা না একটা সেবার কাজ নিয়ে আছ, তোমার নিজের দরকার হয় না হয়—কিসে সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে, তা তো কখনও আমাদের বল না?'

দিদি তুলা দিয়া সন্ধ্যারতির প্রদীপ সাজাইতেছিলেন, তাহা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন—"দাদা না চাইতেই যখন প্রচুর পাচ্ছি তখন চেয়ে ঠক্‌ব কেন?

নগেনদাদা—না চাইতে প্রচুর পাচ্ছ কি রকম ?

দিদি—তা নয়? আপনারাই বলেন কত জন্ম জন্ম তপস্যার ফলে শ্রীগুরু গোবিন্দসেবার অধিকার মিলে। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, এমন দুলর্ভ সেবাসুখ আমার ভাগ্যে হবে। তারপর পদে পদে অপরাধ ক'রে প্রতিক্ষণেই নিজ অযোগ্যতা দেখাচ্ছি, তবু, তো তিনি আমাকে বঞ্চিত না ক'রে সেবাসুখদানে কৃতার্থ করছেন। এর চেয়ে আর পাবার বা চাইবার কি আছে? দাদা! আপনিই একদিন কান্তকবির সেই অতুলনীয় গানটি শুনিয়েছিলেন না ?

নগেনদাদা—কোন্ গানটা দিদি?

দিদি—সেই—

আমি, অকৃতি অধম ব'লেও ও তুমি
কম ক'রে মোরে দাওনি।
আবার, যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভেবে
কেড়েও ত কিছু, নাওনি।।

নগেনদাদা—সত্যিই দিদি! রজনীকান্ত বড় দামী কথা বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাদা ও কুসমদিদি একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"দাদা! দয়া ক'রে গানটা গেয়ে ফেলুন না ?"

দিদি—বেশ তো দাদা! হোক্ না।

নগেনদাদা গাহিলেন—

আমি, অকৃতি অধম বলেও ত তুমি
কম ক'রে মোরে দাওনি।
আবার, যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভেবে
কেড়েও ত কিছু, নাওনি

তব আশিসকুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে
তবু দয়া ক'রে সকলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাওনি।।
আমি, ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে
সুধাপান ক'রে মরি গো পিয়াসে
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি।
তুমি ত কিছুই পাওনি।।
মোরে, রাখিতে চাও বাঁধনে আঁটিয়া
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া
ভাবি ছেড়ে গেছ পিছ, চেয়ে দেখি
এক পাও ছেড়ে যাওনি।।

দিদি — বলুন তো দাদা! এ কি না চাইতে প্রচুর পাওয়া নয়?

নগেনদাদা — (ছলছল নেত্রে ও গদগদ কণ্ঠে) দিদি! তোমার তুলনা নাই, তোমার তুলনা তুমিই।

মহান্ত বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গ

একবার রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপের ছোট আখড়ার মহান্ত সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া সুকণ্ঠ বৃন্দাবনদাস মহান্ত মহাশয় পুরীতে গিয়াছিলেন। হোড়াপঞ্চমীর দিন অপরাহ্নে মহান্ত মহারাজ ললিতাদিদির সহিত দেখা করিতে ঝাঁজপিটায় গিয়াছিলেন। দিদি তাঁহাকে দেখিয়া যথাযথ দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া বসাইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর কথায় কথায় বলিলেন— "ধামেশ্বর আপনাকে দয়া ক'রে পাঠিয়েছেন দাসীকে দর্শনদানে কৃতার্থ করতে, আপনারা তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়জন, তাঁর কৃপা পাবার আশা করতে পারি না, আপনি একটু কৃপা করবেন।"

মহান্ত — দিদি! তুমি তো ধামেশ্বরের পরিপূর্ণ ভোগস্থলে আশ্রয় পেয়েছ এবং সেই ভোগসুখ স্মরণ-মননে দিনরাত বুঁদ হ'য়ে আছ। আমি তোমাকে কৃপা করব, না তুমি আমাকে কৃপা ক'রে ছিটেফোঁটা দিয়ে কৃতার্থ করবে ?

দিদি—সে কি! 'প্রেমসিন্ধু, গোরারায়' আপনি তো সেই সিন্ধুতে ডুবে কত শত অমূল্য রত্ন তুলে নিজেও ভোগ করছেন, অপরকেও ভোগ করাচ্ছেন।

মহান্ত—(হাসিতে হাসিতে) দিদি! তোমার কথায় আমার কিশোরদাস মহান্ত মহারাজের একখানা গান মনে প'ড়ে গেল।

দিদি—মনে যখন প'ড়েই গেল, তখন একটু সুর ক'রে গেয়ে রাধাকান্তকে শুনিয়ে দিলে ক্ষতি কি ?

মহান্ত মহাশয় কোন আপত্তি না ক'রে আনন্দের সঙ্গেই কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিলেন—

শুধু ডুব দিলে কি রত্ন মিলে। সে ভাগ্য যার নাই কপালে।।
(সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের দয়া)
সারা জনমভরি ডুব দিচ্ছে কেউ কানাকড়িও নাহি মিলে।
ডুবের মত ডুব দিয়ে কেউ একই ডুবে কাজ সামালে।।
কেউবা ডুবে সাগরজলে রতন মাণিক পাব ব'লে।
কারো ভাগ্যে শামুক গুগ্‌লি কেউ যায় কুম্ভীরের গালে।।
ধনের আশায় প্রাণের আশা কেউ বিসর্জ্জন দেয় সাগরজলে।
কারো ভাগ্যে পরেশ মেলে পথে ব'সে ধূলা খেলে।।
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল এ তো ত্রিজগতে সবাই বলে।
কিশোর কয় ঠিক ডুবুরী হ'লে সে কর্ম্মকে বামপদে ঠেলে।।"

মহান্ত মহারাজের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ, তাতে সময় ও ভাবোপযোগী গান, অনেকেই আসিয়া সেখানে বসিয়াছেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনা গেল। একজন শ্রোতা তো বলিয়াই ফেলিলেন যে, "পরশ পেলে আর ভবনা কি? নিতাই বলে ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।"

মহান্ত মহারাজ একটু কানে কম শুনিতেন। তিনি দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি বললেন ?" দিদি বক্তব্যটি বুঝাইয়া বলিলে মহান্তজী হাসিতে হাসিতে পূর্ব্ববৎ সুর করিয়া বলিলেন—

"পতিত পাবন নাম শুনেছ মন !
তাতে তোমার ভরসা কিসে।
তুমি যে মন অভিমানের
(উচ্চ) মঞ্চোপরি আছ বসে।।
মুখে পতিত সবাই বলে
কুরঙ্গে মাতঙ্গে চলে
মুখের কথার জগৎ ভোলে
তিনি করুণা করেন না কপটবেশে।।
মুখে কৃষ্ণ তোমার হলাম
স্ব-সুখে বিষয়ের গোলাম
সাধু সেজে লোক ঠকালাম
সবার মজুরি তার নজরে ভাসে।।

'কিশোর' কয় ছাড় কপটতা
পতিত বলা তোমার মিথ্যা কথা
সাধুগুরু পদে বিকিয়ে মাথা
প'ড়ে থাক যদি তরবি শেষে।।"

গান শেষ হইলে দিদি মহান্ত মহারাজের চরণে পড়িয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করুন, সাধুগুরুপদে মাথা বিকিয়ে যেন প'ড়ে থাকতে পারি।" মহান্ত মহারাজ 'কর কি দিদি, কর কি' বলিতে বলিতে দিদির হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিলেন।

অনেকদিন পূর্ব্বে সাধক ভুলুয়াবাবার মুখে তাঁহার নিজের লেখা একখানি গানের পদ শুনিয়াছিলাম—

"কাল রঙয়ের চশমা এক চোখে পরেছ
সবুজ সাদা সকলি এক কালোই দেখিছ
কত, তারার মত হীরা ধরি
বল্‌তেছ তামাকের গুল।"

আমাদের অবস্থাও এইমত হইয়াছে। নিজে তো কিছু করিবই না, অপর সাধক মহাত্মাদের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করিয়া চলা দূরে থাকুক, খুঁজিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া নিরয়গামী হইতেছি। কিছু, বুঝাইলে বুঝিব না, হিতোপদেশ দিলে তাহার মধ্য হইতেও নানা প্রকার কূটতর্ক বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিব। ঐ ভুলুয়াবাবাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"ভুলুয়া কয় হাঁড়িমারা কুকুর আমার মন
প্রহারে প্রাণান্ত তবু যেমন সে তেমন
ছাটলে কাটলে লাভ কিছু নাই
স্বভাব আমার কেশের মূল।।'

মহান্ত মহারাজ উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া সমবেত ভক্তগণের মধ্য হইতে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে আছে "জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।।" এ কথার অর্থ কি ?

মহান্ত—এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন; প্রত্যেক কথাটির অর্থ পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা ক'রে দেখলে বুঝা যায় কেন অঙ্গ নয় বা কেন ভক্তসঙ্গ চায়।

ভক্ত—যদি অসুবিধা না হয় তা হ'লে একটু আলোচনা করুন।

মহান্ত—দিদি! তোমাদের সামনে তত্ত্ববিচার করতে ভয় হয়, তোমরা ভিতরের

রসাস্বাদনে মগ্ন, আমরা বাইরের শব্দের কচকচি নিয়ে মত্ত।

দিদি—দৈন্য তো আপনাদের অঙ্গের ভূষণ। যখন প্রসঙ্গ উঠেছে একটু আলোচনা ক'রে প্রশ্নকর্ত্তার প্রাণে শান্তি দিন না?

মহান্ত—প্রথম জ্ঞান। নানা প্রকার বাদনিরাশপূর্ব্বক তত্ত্ববিচারের নাম জ্ঞান। দ্বিতীয় বৈরাগ্য। নানা প্রকারের দুঃখসহনাভ্যাসপূর্ব্বক বিষয়াভিলাষ ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। তৃতীয় ভক্তি। শ্রীভগবানের মধুরাদপি মধুর রূপ, গুণ ও লীলাদিভাবনাময়ী যে স্বভাব, তার নাম ভক্তি। এই ভক্তি স্বভাবতঃই অতিশয় কোমলস্বভাবা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য চিত্তকে রসময়ের চিন্তায় আবিষ্ট করে না, কাজেই কঠিন। এখন সহজেই বুঝা যায় যে, কঠিনস্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগ্য কোমলস্বভাবা ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। আচার্য্যপাদগণ বলেছেন—বলবর্তী শ্রদ্ধা যেখানে, সেখানে নানা বাদ উপস্থিত হয়ে কোন বিক্রমই প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানাভ্যাসের অপেক্ষা নেই। আর শ্রীভগবানের মধুর রূপগুণলীলাদি যাহার মনকে মাতিয়ে রেখেছে, তার আর বৈরাগ্যাভ্যাসের কি প্রয়োজন? তাই বলেছেন 'কভু নহে অঙ্গ'। অঙ্গ বলতে এখানে বুঝতে হবে সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকা।

ভক্ত—ভক্তিপথের পথিককে কি জ্ঞানবৈরাগ্য কোন সময় কোনরূপ সাহায্যই করতে পারে না?

মহান্ত—একেবারে যে কোন সাহায্য করে না, তা বলা যায় না। ভক্তিপথে প্রবেশের সময় অন্য আবেশ পরিত্যাগের নির্মিত্ত ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু কিছু উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভক্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট হ'লে আর জ্ঞান বা বৈরাগ্যের প্রয়োজন আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না।

ভক্ত—আচ্ছা, তার পরের চরণ—'যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।'

মহান্ত—যম বলতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটিকে বুঝায়। নিয়ম বলতে—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটিকে বুঝায়। এখন আবার এই দশটির ব্যাখ্যা করা যাক।

১। অহিংসা—হিংসার বিপরীত। প্রাণনাশানুকূল ব্যাপার হিংসা, আর তার বিপরীত ব্যাপারই অহিংসা।

২। সত্য—অপীড়াদায়ক যথার্থ ভাষণ।

৩। অস্তেয়—অন্যায়পূর্ব্বক পরবস্তুর অপহরণের নাম স্তেয়, তদ্বিপরীতকেই অস্তেয় বলে।

৪। ব্রহ্মচর্য্য—ভোগগর্ভ স্ত্রীর শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিবৃত্তি এই অষ্টবিধ মৈথুন ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

৫। অপরিগ্রহ—বিষয়-স্পৃহা ত্যাগকে এক কথায় অপরিগ্রহ বলে।

৬। শৌচ—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তরশৌচভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা যে শৌচ তাকে বাহ্যশৌচ বলে, আর চিত্তের বাসনা ত্যাগকে আভ্যন্তরশৌচ বলে।

৭। সন্তোষ—সকল বিষয়ে চিত্তের পূর্ণতার নাম সন্তোষ।

৮। তপঃ—স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মকে তপঃ বলে।

৯। স্বধ্যায়—বেদাদি পাঠকে স্বাধ্যায় বলে।

১০। ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করাকে ঈশ্বর-প্রণিধান বলে। আদিশব্দ দ্বারা শান্তি বিবেকাদি বুঝায়। বুলে কি না ভ্রমণ করে। এখন এক কথায় অর্থ হ'ল এই যে, যম নিয়ম শান্তি বিবেকাদি গুণসকল দাসের ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। অর্থাৎ যমনিয়মাদির জন্য কৃষ্ণভক্তের আগ্রহ না থাকলেও তারা বিশেষ আগ্রহসহকারে কৃষ্ণভক্তের নিকট উপস্থিত হয়। তাৎপর্য এই যে, ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হ'লে এই সকল গুণ ভক্তে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়, তার জন্য তাকে আর পৃথক কোন সাধন বা চেষ্টা করতে হয় না।

বেলা অবসান দেখিয়া মহান্ত মহারাজ বিদায় লইলেন। শ্রোতাগণের মধ্যে কেদারনাথ রায় নামক এক ভক্ত দিদিকে বলিলেন—"ইনি তো চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন?'

দিদি—উনি যে শ্রীচরিতামৃত-পাঠক। কীর্ত্তনেও যেমন, পাঠেও তেমনি পারদর্শী। আজ সময় হ'ল না, ভবিষ্যতে সংযোগ হ'লে অনেক কথা শুনতে পাবে।

দিদির কথা শুনিয়া আশ্রমবাসীগণ একে একে যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে গমন করিলেন। আমরাও গৌরহরিবোল ধ্বনি দিয়া উঠিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভে পাঠ শুনিতে রওনা হইলাম।

বন্ধুসুন্দর ও হরিসভার কথা

নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর মধ্যে নিমতলার ঘরে শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন। রাত্রি অনুমান আটটা। মাঘের শেষ, তবুও শীতের প্রকোপ মন্দ নয়। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। আমরা আট-দশ জন ঘরের মধ্যে বসিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা শুনিতেছি। খুব ছোট একটি আলো দেওয়ালের গায়ে জ্বলিতেছে। কথাপ্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"এই নবদ্বীপে হরিসভায় এবং তার পাশে এক ভক্তের বাগানে তাঁর (জগদ্বন্ধুর) কত অলৌকিক লীলাই যে কতভাবে প্রকাশ হয়েছিল তার অন্ত নেই।"

আমাদের কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরদাদা

বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, গত বছর পুরীতে গিয়ে বন্ধুসুন্দরের কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁরা আমাদের বড় নিতাইদাদার সঙ্গে দেখা করতে হরিদাস ঠাকুরের মঠে এসেছিলেন। সেখানে শ্যামদাদা, মধুদাদা, নিতাইদাদা তিনজনেই ছিলেন, আমিও ভাগ্যক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলাম। নিতাইদাদা সেদিন হরিসভার অনেক কাহিনীই তাঁদের শুনিয়েছিলেন।

বাবাজী—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নিতাইয়ের কাছেই বন্ধুর অনেক কিছু আছে। হাতের লেখা পদের খাতা, মন্ত্রের কাগজ, প্রসাদী কাপড়, ফুলের মালা তো আছেই, তা ছাড়া এমন একটি জিনিস আছে যা অমূল্য সম্পদজ্ঞানে নিতাই এখনও বুকে আঁকড়ে ব'সে আছে।

আমরা সকলেই "কি জিনিস" বলিয়া উঠিলে বাবাজী মহাশয় খুব মৃদুস্বরে ভাবপ্রেম গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"একটি ছোট আতরের শিশির গায়ে বন্ধুর বুড়ো আঙ্গুলের সুস্পষ্ট ছাপ।'

সকলে 'গৌর হরিবোল' ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাবাজী মহাশয় মাথা নীচু করিয়া আছেন, কিছু, সময় টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়িল, দুই-একবার 'হায় হায় হায়' ধ্বনির সঙ্গে দেহে কল্প ও পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হইয়া স্থির হইলেন।

আমার সঙ্গে ভবানীপুরের প্রবীণ ভক্ত বিপিনবিহারী নাথ ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"কাকা! আপনি বাবাজী মহাশয়কে জগদ্বন্ধু প্রভুর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে বলুন।' আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—"যজ্ঞেশ্বরদাদা তো পুরী থেকে সব শুনে এসেছেন, আপনি কৃপা ক'রে সে মধুর প্রসঙ্গ আমাদের একটু শোনান না ?"

বাবাজী—কত শুনবে দীনেশ! সে অনন্ত অপার লীলার আমিই বা কতটুকু জানি? আচ্ছা, তোমাদের যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন হরিসভায় তাঁর প্রথম প্রকাশের বিষয় একটু আলোচনা করি।

একদিন হরিসভার ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় একজন কে হনহন ক'রে এসে শ্রীমন্দিরের পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল সকলেই দেখল কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারল না বা কিছু বলতেও পারল না। কিছু সময় পরে শিতিকণ্ঠ ঠাকুর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুব ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়াও দিল না বা দরজাও খুলল না। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ভিতর থেকে ঘরে মৃদুকণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—"কণ্ঠ! আমি তোর বন্ধু।" "বন্ধুই হও, আর যে-ই হও দরজা খোল, নইলে দরজা

ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখব তুমি কোন বন্ধু।' এই বলে শিতিকণ্ঠ যেমন কপাটে ধাক্কা দিল অমনি দরজা খুলে গেল। ভিতরে মুখ বাড়িয়ে না জানি কি দেখে 'বাপ রে' ব'লে চীৎকার ক'রে সেইখানেই প'ড়ে গেল। পিতা মথুরানাথের কানে শব্দটা গেল কিন্তু তিনি ঠিক করতে পারলেন না যে, কোন্ দিক থেকে শব্দটা এল। ইতস্ততঃ দেখতে লাগলেন। দু-একবার 'কে' 'কে' ব'লে ডাকলেনও।

এদিকে শিতিকণ্ঠ প'ড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যের সেই পুরুষটি ধীরে ধীরে তাকে উঠিয়ে হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে শান্ত ক'রে বললেন — 'তুই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিস কণ্ঠ ? আমি যে তোর চিরদিনের বন্ধু রে। একটু চিন্তা ক'রে দেখ্ দেখি আমার কথা কিছু মনে হয় কি-না?"

একটু পরেই শিতিকণ্ঠ ছুটে বাইরে এসে মহাপ্রভুর মন্দিরে ঢুকে শ্রীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে কি যেন দেখল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে লাগল। পাগলের মত আবার ছুটে গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পুরুষটিকে বলল—"আপনি যে সব কথা বললেন, আমার তো এখন তা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না; তবে নিজগুণে দয়া ক'রে যখন উপস্থিত হয়েছেন এবং বন্ধু ব'লে পরিচয় দিচ্ছেন, তখন কিছুদিন এখানে থাকতে হবে।"

যাঁকে লক্ষ্য ক'রে শিতিকণ্ঠ এ কথা বলল, তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন— 'ওরে কণ্ঠ! আমি তো অনেকদিন হ'তেই এখানে আছি, আর এখন থাকবও।'

শিতিকণ্ঠ শুনে একটু বিস্মিতভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যেন কিছু বলতে যাচ্ছে কিন্তু বলতে পাচ্ছে না; তার এই ভাব দেখে উনি বললেন—"আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ? আমার নাম শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য।" শিতিকণ্ঠ শুনে চম্‌কে উঠল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই নেহাল ক্ষ্যাপার কথা যা বাবার কাছে শুনেছিল তাই মনে পড়ে গেল ক্ষ্যাপা তো একদিন বাবাকে বলেছিল—'যিনি এখানে এসে প্রকট হ'য়ে কীর্ত্তনলীলা প্রকাশ করবেন, তাঁর নাম জগদ্বন্ধু, ভট্টাচার্য্য।' শিতিকণ্ঠ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে প্রণাম ক'রে সেই ঘরেই তাঁর থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

পিতা মথুরানাথ জিজ্ঞাসা করলেও শিতিকণ্ঠ রাত্রে আর তাঁকে কিছু বললেন না। পরদিন সমস্ত ব'লে এখন কিভাবে কি করা যায় তাই চিন্তা করতে লাগলেন। মথুরানাথ পুত্রের কথা শুনে ধীরে ধীরে সেই ঘরের দিকে। গেলেন, কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে দু-একবার ডেকেই চ'লে এলেন। ভাবলেন, আছেন যখন তখন পরে দেখা করব।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যারতির পর জগবন্ধু ঘর থেকে বের হয়ে মহাপ্রভুর মন্দিরের সামনের বারান্দায় জানলায় দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছিলেন। শিতিকণ্ঠ

তাড়াতাড়ি বাবাকে ডেকে দেখালেন। মথুরানাথও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে—ঢাকা—কেবল মুখখানি খোলা। মুখের দিকে চাইতেই চোখে চোখ পড়ল, অমনি একটু মৃদু হেসে মধুর স্বরে বললেন — "পদরত্ন! এই দেখ আমি এসেছি।" আর কোন কথা নেই, পদরত্নও কেমন যেন বিহ্বলভাবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই মৃদু হেসে বন্ধু নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরেই ছ-সাতটি ভক্ত এসে বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন, আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম। আমরা হরিসভাতেই থাকি, সেইখানেই প্রসাদ পাই এবং সকলে মিলে বন্ধুসুন্দরের সুন্দর সুন্দর গান ও পদাবলী কীর্ত্তন করি। শিতিকণ্ঠ পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না—নিজেকে কীর্ত্তনানন্দের স্রোতে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন।

এখন শিতিকণ্ঠের এমন অবস্থা যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা পূজা এবং আগন্তুক ভক্তবৃন্দের দেখাশুনা ছাড়া সংসারের কোন কাজেই তার কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। পদরত্ন মহাশয় বৃদ্ধ হয়েছেন তাতে আবার শ্বাসরোগ-গ্রস্ত; তবু তিনি একাই সংসারের সমস্ত কাজকর্মের সামঞ্জস্যা ক'রে নেন, পুত্রের আনন্দে কোনরূপ বাধা পড়ে এইজন্য তাকে কিছু বলেন না।

বহুদিন পূর্ব্বে নেহাল ক্ষ্যাপা পদরত্নকে যা যা বলে গিয়েছিলেন একে একে সবই হ'য়ে যাচ্ছে। নিজে প্রত্যক্ষ্যও করছেন, তবু, পুত্র শিতিকণ্ঠের সংসার-ঔদাসীন্য দেখে কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে পড়লেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথা প্রসঙ্গে এক এক সময় দঃখ ক'রে বলেনও যে, তিনটি পুত্রের দুটি তো বাল্যকালেই বিদায় নিয়েছে, এখন শিবরাত্রের সল্‌তে সবেধন নীলমণি এই শিতিকণ্ঠ, এরও যেরূপে ভাবগতিক দেখছি তাতে এও কখন কি ক'রে বসবে কে জানে!

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ারাণীর যে কি প্রভাব তাহা সহজে বোঝা যায় না। পদরত্ন নিজ গুরুদেব নেহাল ক্ষ্যাপার কথাও যেন দিন দিন ভুলতে বসেছেন। নিজের আঙ্গিনায় প্রভুর প্রকট লীলা প্রত্যক্ষ করছেন, তত্ত্বও মায়ারাণী কোথায় যেন কোন সূত্রে বোধশক্তি লোপ করিয়ে দিয়ে লীলাসুখ ভোগ করতে দিচ্ছে না। ধন্য মা মায়া তোমার খেলা!

জগদ্বন্ধু, স্বগণ-সঙ্গে কয়েকদিন হরিসভায় থেকে একদিন হঠাৎ কাকেও কিছু না ব'লে কলিকাতায় চ'লে গেলেন। আমি তার পরও কয়েকদিন ছিলাম, কিন্তু সে সুখময়-সঙ্গলাভে বঞ্চিত হ'য়ে শিতিকণ্ঠ ঠাকুর বিশেষ কাতর হ'য়ে পড়লেন। কোন কিছুতেই মন বসছে না, সব সময়ই কেমন যেন একটা বিমর্ষ ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার কার্য্যেও পূর্ব্বের মত আগ্রহ নেই। কর্ত্তব্যের খাতিরে

করতে হয় তাই করেন।

পিতা মথুরানাথ চঞ্চল হলেন, শিতিকণ্ঠের বাল্যবন্ধুদের একদিন ডেকে এনে সব কথা তাদের খুলে বললেন। তারা একদিন সময়মত শিতিকণ্ঠকে বসিয়ে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে শেষে বললেন—"তুমি তো ভাই তাঁর কাছে যাওনি, তিনিই নিজের ইচ্ছায় এসে তোমাকে দেখা দিয়েছেন; তা ছাড়া তুমিই বলছ যে, তিনি বলেছেন—'আমি এখানেই আছি এবং থাকবও।' তবে আর এর জন্য চিন্তা করছ কেন? দু-চারদিন প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে পাচ্ছ না, এই যা দুঃখ। তা ভাই মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আবার পাবে।" বন্ধুদের মধ্যে একজন বললেন—"তোমাকে কিছু দিয়ে গেছেন কি?"

বন্ধুদের কথায় শিতিকণ্ঠ একটু মনটাকে স্থির করবার চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময় এই কথা শুনে তিনি জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীহস্তলিখিত কয়েকটি পদ দেখিয়ে বললেন—"যাবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি নিজ হাতে এগুলো লিখে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলে—'এইগুলি নিজে কীর্ত্তন করবে এবং ভক্তগণকে দিয়ে কীর্ত্তন করাবে।' এই ব'লে খাতাখানি বন্ধুদের হাতে দিলেন। বন্ধুরা সমস্বরে ব'লে উঠলেন—"তবে আর কি, ঐ সব পদ-পদাবলীর মধ্যেই তো তাঁর মধুময় সঙ্গ পাবে, তুমি স্থির হও ভাই।'

সেই থেকে শিতিকণ্ঠের অন্যমনস্ক ভাব অনেকটা ক'মে গেল। পূর্ব্বের ন্যায় মহাপ্রভুর সেবা-পূজায় মন দিলেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে রোজ সকাল সন্ধ্যায় বন্ধুর পদ-পদাবলীর কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করলেন। এই সব দেখেশুনে বৃদ্ধ পদরত্ন মহাশয়ের হতাশ প্রাণে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হ'ল। তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে পুত্র শিতিকণ্ঠের সহযোগিতা করতে লাগলেন।

এর অল্প কিছুদিন পরেই পদরত্ন মহাশয় নিত্যধাম গমন করেন। কাজেই পিতার অবর্ত্তমানে দেবসেবা, শিষ্যবর্গের দেখাশুনো এবং সংসারের যাবতীয় ভারই শিতিকণ্ঠের উপর পড়ল। তিনিও ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সব দেখাশুনো করতে লাগলেন।

বান্ধুসুন্দর এর পরও সঙ্গীদের নিয়ে কয়েকবার হরিসভায় এসেছেন এবং শিতিকণ্ঠকে মহাপ্রভুর সেবায় ও নামকীর্ত্তনে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। বন্ধুসুন্দরের কৃপালাভ ক'রে শিতিকণ্ঠের দেহে এমন সব সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ হ'ত যে, লোকে দেখে স্তম্ভিত হ'ত। আমরাও দেখেছি কীর্ত্তনে ভাবাবেশে তার প্রতি লোপকূপে দিয়ে রক্তোদ্গম হয়েছে। এই সব দেখেশুনে নানা দেশবিদেশ থেকে বহু লোক এসে শিতিকণ্ঠের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়। হরিসভা এই সময় সর্ব্বদাই পাঠ ও কীর্ত্তনরোলে মুখরিত থাকত। স্মৃতিরত্ন শিতিকণ্ঠ এই সময়

হ'তেই 'হরিসভার গোস্বামী' নামে জনসমাজে পরিচিত হন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাবাজী মহাশয় চুপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বদিকের কপাটটি খুলিয়া গেল। আমরা সকলেই বিস্মিতভাবে সেদিকে চাহিয়া দেখি একখানি ধূসর রংয়ের গায়ের কাপড়ে আপাদমস্তক চাপা দিয়া আমাদের পূজনীয়া ললিতাদিদি সশরীরে সেখানে উপস্থিত। অকস্মাৎ দিদির আগমনে ভক্তবৃন্দের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারজন উঠিলেন। পূজনীয় বাবাজী মহাশয় দিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এ কি, এত ঠাণ্ডায় এমন সময় এখানে?"

দিদি—আমি অনেকক্ষণই এসেছি। ঐ জানালার ধারে ব'সে তোমাদের কথা শুনেছিলাম। কথা শেষ হ'তে একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি।

বাবাজী—এমন কি কথা দিদি! যে এখনই না বললে নয় ?

দিদি—হরিসভার প্রসঙ্গ হচ্ছিল কিনা, তাই হরিসভার সঙ্গে তোমাদের শ্রীগুরুদেবেরও খুব একটা সম্বন্ধ ছিল; হরিসভার গোঁসাইকে নিয়ে যে সব লীলাখেলা তিনি করেছেন, প্রভুর সেবার সুব্যবস্থা করতে তাঁকে যে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল, সেসবগুলিও তোমার ভক্তদের একটু শুনিয়ে দিও। অবশ্য এখনই বলছি না, সময়মত শুনিয়ে দিও।

বাবাজী—সেসব প্রসঙ্গ তো আমার চেয়ে দিদি তোমার ভালমত জানা আছে। বল তো এক সময় সকলে মিলে আমরা তোমার কাছে গিয়ে ব'সে ব'সে শুনব।

দিদি—আমি আর কতটুকু জানি! আমাকে তো ভাঁড়ার ছেড়ে দিয়ে তোমরা এই মঠের মধ্যেই আটকে রেখে দিয়েছ। আচ্ছা, যদি তাই-ই তোমাদের ইচ্ছে হয় তবে সুযোগমত আদেশ করবে, আমি সব সময়ই প্রস্তুত।

বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরদাদা ও হাওড়ার নরসিংহদাদা দুইজনেই বলিলেন—"আবার কখন হবে, আমরাও কে কোথায় থাকব তার ঠিক নেই; যদি অসুবিধা না হয় তাহ'লে এখনই বলুননা দিদি?"

বাবাজী—বেশ তো দিদি! এখনও তো অভিসার কীর্ত্তনের সময় হয়নি, এখনই কিছু বলনা?

দিদিকে একটা স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইলে তিনি দণ্ডবৎ করিয়া আসনে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীগুরুদেব বলতেন—'আমি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করতে বসলে হরিসভার শ্রীমূর্ত্তি এসে আমার সম্মুখবর্ত্তী হন। ঐ নবনটবরবপু গৌরকিশোরই আমার নয়ন, মন, প্রাণ চুরি করেছে। শত চেষ্টা ক'রেও আমি আর অন্য ভাবের মূর্ত্তির কাছে বিক্রি হ'তে পারলাম না।'

শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভুরও শ্রীমহাপ্রভুর উপর অগাধ বিশ্বাস। প্রভুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখলে তাঁকে মহাপ্রভুর একজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত বা নিত্যপরিকর ব'লে মনে হ'ত। নিত্য সেবায় বা নৈমিত্তিক কোন উৎসবপর্ব্ব উপলক্ষ্যে কোন বিষয়ের অসুবিধা বা অসংস্থান হ'লে তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখীন হ'য়ে বলতেন—"যদি এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্ন সুসম্পন্ন না হয় তবে তোমার ঐ উর্দ্ধে-তোলা ডান হাতখানি টেনে নামিয়ে দেব। যদি ভাল চাও তবে সকল বিষয় দেখেশুনে সুব্যবস্থা কর। তোমার জন্যই হরিসভা, আর তাতে ক'রেই আমাদের যা কিছু; নইলে আমাদের কে জানত? ইত্যাদি।

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবের আবদার প্রভু রক্ষা না ক'রে পারতেন না; সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হ'ত। এই সময়ই হরিসভায় চাঁদের হাট বসেছিল। জগদ্বন্ধু, প্রভু, বিজয়কৃষ্ণ প্রভু, তোমাদের বড়বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই না জানি কিসের আকর্ষণে এসে হরিসভায় জুটতেন। তোমাদের বড়বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতৃভাব ছিল। গোঁসাইজী এঁকে 'দাদা' ব'লে ডাকতেন আর ইনি গোঁসাইজীকে ঠিক ছোট ভাইটির মতই স্নেহ করতেন। এক সময় মহাপ্রভুর সেবা এবং অন্যান্য কয়েকটি বৈষয়িক কারণে বিশেষ অর্থাভাব হওয়ায় গোঁসাইজী বড়বাবাজী মহাশয়ের কাছে এসে বললেন—'দাদা! আর আমি সেবা চালাতে পারছি না, আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।' বড়বাবাজী মহাশয় অভয় দিয়ে বললেন—'ভাই! যাঁর সেবা তিনিই চালাচ্ছেন আর চালাবেনও, তুমি আমি তো নিমিত্তমাত্র। আচ্ছা, কিভাবের ব্যবস্থা হ'লে তুমি সন্তুষ্টচিত্তে পরমানন্দ মনে সেবা করতে পার অকপটে আমায় বল—নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হ'লে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গোঁসাই—আমার সব ভার অর্থাৎ মহাপ্রভুর সেবা এবং তাঁর সংসারের যাবতীয় ভার আপনি গ্রহণ করুন, আমি যেমন আপনার ছোট ভাই সেইভাবে আপনার আদেশ পালন ক'রে যাব।

বাবাজী—বেশ ভাই! নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আজ থেকে তোমার সম্পূর্ণ ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্তমনে মহাপ্রভুর সেবা কর।

বলা বাহুল্য, সেইদিন থেকে বড়বাবাজী মহাশয় হরিসভার জন্য দৈনিক পনের-যোল টাকা খরচ করতে লাগলেন। তা ছাড়া যখন যেমন প্রয়োজন হ'ত জানতে পারলেই তা দিয়ে দিতেন।

গোঁসাইজীর মাতাঠাকুরাণীকে বড়বাবাজী মহাশয় বলেছিলেন—'মা! আমি আপনার সন্তান, আজ থেকে মহাপ্রভুর সংসারের যাবতীয় ভার আমার উপর দিন। শিতুকে কিছু বলবেন না, সন্তানজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে সব আমার কাছে

বলবেন।'

বাৎসল্যময়ী মা বড়বাবাজী মহাশয়ের মাথায় হাত দিয়া বললেন—'বাবা! তুমি দীর্ঘজীবী হও। শিতু আমার নিরাশ্রয় ছিল, তুমি ওর আশ্রয়স্থল হ'লে। দুই ভাই মিলে পরমানন্দে গৌরের সেবা কর। বলব কি বাবা! গৌর আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আদরের ধন অমূল্য রতন তোমাদের দু ভাইয়ের সেবা গ্রহণ ক'রে তোমাদের ধন্য করুন। শিতু গৌরের ভার তোমার উপর দিয়ে ভালই করেছে।

মায়ের কথা শুনে তোমাদের বড়বাবাজী মহাশয় বলেছিলেন—'মা! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের গৌরে প্রীতি থাকে। বেশী আর কি বলব, যতদিন তিনি কৃপা ক'রে রাখবেন, ততদিন সেবার জন্যে শিতুকে কোন ভাবনা করতে হবে না।' এইভাবে তাকে বহু কথা ব'লে বিশেষভাবে নিজে দেখেশুনে সেবার সুব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

সেবা গ্রহণের পরদিন থেকে ভেট তুলে দিয়ে বলেছিলেন—'নবদ্বীপে যে যে ঠাকুরবাড়ীতে ভেট আছে, তোমরা তাদের বার্ষিক ভেট বাবদ জমার হিসাব আন, আমি ঝোলা কাঁধে ক'রে ভিক্ষা ক'রে তোমাদের সে অভাব মোচন করব। তবু, তোমরা ঠাকুরদর্শনে কাকেও বঞ্চিত ক'র না, সকলকে আশ মিটিয়ে দর্শন করতে দাও।'

কিছুদিন এই নির্দ্দেশমত চলে। না জানি কোন, দুর্দ্দেবে আবার গোঁসাইজী ভেট প্রবর্ত্তন করলেন। বড়বাবাজী মহাশয় জানতে পেরে "এও নিতাইচাঁদের এক ইঙ্গিত' এই ব'লে কিছুদিন নবদ্বীপের বাইরে বাইরে নাম প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

নবদ্বীপে ফিরে এসে পথেই গোঁসাইজীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি 'দাদা! এতদিন কোথায় ছিলেন?' ব'লে কাছে আসতেই বড়বাবাজী মহাশয় হাসিমুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে তাঁর নিষ্পেশিত পন্থা ত্যাগ ক'রে লোভবশতঃ পুনরায় ভেট প্রবর্ত্তন করায় যে দুঃখ হয়েছে তা স্পষ্ট প্রকাশ না ক'রে দৈন্যসূচক উপদেশবাক্যে বললেন—"ভাই—

অর্থ লাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই স্থানে স্থানে।
লব্ধ পদ প্রতিষ্ঠার আশা করি অনিবার
ভজনের করি মাত্র ভানে।।

ভাই ! মনে করেছিলাম মহাপ্রভু দাসকে অঙ্গীকার করেছেন। এখন দেখছি তিনি রাখতে চাইলেও আমি আত্মসুখ, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় থেকে

দূর করতে পারিনি। এভাবে কপটতা নিয়ে সেবা করব কি ক'রে? তুমি ভাই যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ আর এখন তাই করবেও, তাই-ই কর। আমি যখন বলেছি তখন হরিসভায় বাঁধাই রইলাম।"

অতঃপর মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হ'তে তিনি সেবার কিভাবে কি হবে জিজ্ঞাসা করায় মাকে বলেছিলেন। —'চিন্তা কি মা! তোমার শিতুর দ্বারাই সব হবে। কত লক্ষপতি তোমার শিতুর পায়ে এসে লোটাবে। আমি তো রইলামই। আমার যে হবে, সে কখন হরিসভাকে ত্যাগ করতে পারবে না। শিতুর জন্য তুমি ভেবো না মা।' এই ভাবের বহু প্রসঙ্গ শিতিকণ্ঠ গোঁসাইর সঙ্গে বাবাজী মহাশয় করেছিলেন। সবগুলি সব সময় স্মরণও হয় না, আবার স্মরণ হ'লে গুছিয়ে বলবার মত শক্তিও আমার নেই। আজ যতটুকু কৃপা ক'রে বলালেন ভাই তোমাদের শোনালুম, আবার যদি কোনদিন সুযোগ সুবিধা হয় আলোচনা করব। এ সব লীলাকথা আলোচনা করা তো আত্মশোধনের জন্য। তবে অযোগ্যতা বশতঃ আলোচনা করতে গিয়ে ক্রমভঙ্গ, ঘটনার অসংলগ্নতা বা অপ্রাসঙ্গিক যে সব বর্ণন হয়, সেজন্য শ্রোতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা চাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। জয় গুরু! জয় গুরু!" দিদি দণ্ডবৎ করিয়া উঠিয়া গেলেন। ভক্তগণও রাত্রি অধিক হইয়াছে, বাবাজী মহাশয়ের কষ্ট হইবে বলিয়া বিদায় লইলেন। যজ্ঞেশ্বরদাদা দুটি হাত তুলিয়া "শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন, উপস্থিত আমারও সকলে দাদার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া একে একে বিদায় লইলাম।

সেবায় বঞ্চিত ক'র না

পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলি, ললিতাদিদির অবিচলা ভক্তিনিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুসেবার কথা সম্যক বর্ণনা তো দূরের কথা, কলামাত্র বর্ণনের ভাষাও আমার জানা নাই। তবু কেন বলিবার বাসনা প্রাণে জাগে তাহা তিনিই জানেন। 'চরিতসুধা' পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলাম দিদি লিখিয়াছেন—

"জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি মূঞি কি পারি বর্ণিতে।
এক কণা স্পর্শ করি আপনা শোধিতে।।
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহন।।
তৈছে আত্ম পবিত্রিতে যে কিছু লিখিনু।
সাগরের মাঝে যেন এক কণা ছুঁইনু।।"

শ্রীসনাতন দাস শ্রীগুরুবন্দনায় বলিয়াছেন—'গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি কভু না

করিবে।" এই মহাজনবাক্য ললিতাদিদির জীবনে কিরূপে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা দিদির নবদ্বীপে সমাজবাড়ীর বড়বাবাজী মহাশয়ের সমাজসেবা দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন।

"গুরোরাজ্ঞা হ্যবিচারণীয়া।" অবিচারে গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিবে। এই শাস্ত্রবাক্য কিভাবে দিদি পালন করিয়াছেন, তাহার কিছু, কিছু বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি। আদেশ পালন করিতে যাইয়া কত অসহনীয় ক্লেশ তাঁহাকে হাসিমুখে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকে এখনও বর্তমান আছেন। দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় গিয়াছে, তবু সেবাকার্য্যে কেহ দিদিকে বিরত হইতে দেখে নাই। বিরক্তি তো আসেই নাই বরং সেবানন্দে উৎসাহ আতিশয্যে নাম স্মরণ করিতে করিতে হাসিমুখে একটার পর একটা সেবা নিপুণ—নিখুঁতভাবে করিয়া চলিয়াছেন। কেহ তাঁহার করণীয় কোন সেবার কার্য্য করিয়া আনুকূল্য করিতে আসিলে করযোড়ে কাতরভাবে বলিতেন—"বহুজন্ম সাধনাতেও যে সেবা পাওয়া যায় না, যদি কৃপাময় কৃপা ক'রে তা দাসীকে দিয়েছেন, আপনারা আমায় তা থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

কষ্ট হইতেছে বলিলে দিদি হাসিমুখে বলিতেন—"কি আর কষ্ট আমার হচ্ছে ভাই! একটু সেবা পাবার জন্যে যারা কঠোর ত্যাগ, অসহনীয় ক্লেশ, অভাবনীয় সাধনা ক'রে গেছেন, তাঁদের কথা একবার চিন্তা ক'রে দেখ দেখি? সে তুলনায় তো আমার পরম সুখই হচ্ছে।' ইত্যাদি।

মোটকথা দিদি নিজেকে সেবাকার্য্য হইতে এক মুহূর্ত্তও বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাহিতেন না। পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে আমরা দেখিয়াছি—নিজেদের পালার সময় তো ঠাকুরের সেবা করিতেনই, অপর প্রতিবেশীর পালাতেও নিজে উপযাচক হইয়া সেবা চাহিয়া লইতেন এবং করিতেন। আমরা করি না, তাই জানি না এতে কত সুখ। একদিন এক সাধু বলিয়াছিলেন—'করতাল বাজিয়ে বৃন্দাদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় 'রাধাকৃষ্ণসেবা পাব এই অভিলাষী। কুঞ্জসেবা দিয়ে মোরে কর রাধাদাসী।।" ইত্যাদি পদ গান কর, আর ভাগ্যে যদি একটু সেবা জোটে তাতে পিছিয়ে যাও কেন? এ 'কেন'র উত্তর নাই। বলিতে হইলে এইমাত্র বলা যায় যে, দুর্দ্দৈব।

ভিখারী ও ব্রহ্মচারী

ঝাঁজপিটা মঠে আজ বড়বাবাজী মহাশয় উপস্থিত নাই। বৈকালে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের আঙ্গিনায় সকলে বসিয়া সেবার চাউল ডাইল পরিষ্কার করিতেছেন। মুখে অন্য কথা নাই—হয় শ্রীবৃন্দাবনলীলা নয়তো শ্রীজগন্নাথদেবের

লীলাকথা আলোচনা হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ললিতাদিদি বড়বাবাজী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। একবার বলিয়াই ফেলিলেন—"আজ ছ-দিন, কোথায় কিভাবে কি করছেন কে জানে?"

দয়ালদাদা—ভাবছ কেন দিদি! গোবিন্দদাদা সঙ্গে আছেন। তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। তাঁর সেবার কাজে আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

কুসমদিদি—তা তো আছেন, কিন্তু আমাদের যে মন মানছে না।

ললিতাদিদি — হুঁ, মুখে তো অনেক কিছুই বলি কিন্তু কাজে করতে পারি কই?

এই সময় একটি অল্পবয়স্ক বঙ্গদেশী ভিখারী মঠের দরজায় দাঁড়াইয়া একতারা বাজাইয়া গান ধরিল—

আমি, সকলার চেয়ে বেশী চাই মনে
মুখে বলি শুধু চাই না চাই না।
তোমারে ঢেকেছি আমির আড়ালে
তাই ত তোমারে পাই না।।
যশের কাঙ্গালী পরি চীরবাস
সম্মান লালসে বলি তব দাস
এ কি অহমিকা এ কি পরিহাস
কেন, সরল সুপথে যাই না।।
নিজের উপর নাহি অধিকার
আমারে চালায় প্রভুত্ব আমার
ভেঙে দাও প্রভু গর্ব্ব অহংকার
যেন, তোমা ছাড়া কিছু চাই না।

ভিখারীর কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট; সকলেই উৎকর্ণ হইয়া গানটি শুনিতেছিলেন। শেষ হইতেই দিদি ভিখারীকে ডাকিয়া ভিতরে বসাইলেন এবং বলিলেন—"বাবা! আর একখানি গাও তো?" ভিখারী তাহার একতারাটি ঠিক করিয়া লইয়া গান ধরিল—

যদি ডুব দিয়েছ আর ভেসো না জান না কত যাতনা।
ভাসলে পরে আছাড় মারে তরঙ্গের কত তাড়না।।
ডুবেছ তো ডুবতে থাক ঘুচিয়ে ফেলে লেনাদেনা।
ভুলো না ডুবরীর মানা মনে রেখো ঠিক নিশানা।।
কপট-কলসী ত্যজে বুকে শ্রদ্ধা-শিলা বেঁধে নে না।
অনায়াসে তল পাবি মন। ঘুচে যাবে আনাগোনা।।

'কিশোর' কয় যদি ডুব দিলি মন! ডুবুরীরে সঙ্গে নে না।
সে, ময়লা মাটি বেছে দিবে পরিপাটি খাঁটি সোনা।।

দিদি নিজ হাতে চাউল ও কিছু, তরকারী দিয়া "আবার এস" বলিয়া ভিখারীকে বিদায় দিলেন। ভিখারী তো চলিয়া গেল। ইঁহাদের আলোচনার ধারাও ফিরিয়া গেল।

দিদি বলিতেছেন—"সকলের চেয়ে বেশী চাই মনে, মুখে বলি শুধু—চাই না চাই না।" দিদি সঙ্গীরাও বলিতেছেন—"সত্যিই দিদি। মুখে বলি শুধু চাই না চাই না।" কিছু সময় এই ভাবের আলোচনা করিয়া যে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পাচ-সাত দিন পরে একজন ব্রহ্মচারীর আগমনে মঠে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সেদিন বড়বাবাজী মহাশয় মঠে উপস্থিত ছিলেন। বহু সময় তাঁহার সহিত ইঁহার কথাবর্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মচারীজী কিছুতেই নিজের কোন পরিচয় দিলেন না, কেবল শ্রীগুরু মহারাজের আদেশে আসিয়াছেন এই কথাটি বলিলেন। পরে পুরীবাসী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছিল যে, ইনি দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের শিষ্য এবং ইহার পূর্ব্বাশ্রম হাওড়া জেলার জনাই নামক গ্রামের সন্নিকটে ছিল।

এই ব্রহ্মচারী মহাশয় দিদির বেশভূষা দেখিয়া বৈষ্ণব বাবাজীর মঠে স্ত্রীলোক থাকে কেন ভাবিয়া প্রথমে একটু চমকিত হইয়াছিলেন। শেষে পরিচয় পাইয়া যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিদির প্রতি উপদেশাত্মক বাক্যগুলি হইতেই বুঝা যায়।

বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশে দিদি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণাম করিলে তিনি দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখীজী! কিছু করতে হবে, শুধু ফাঁকা ফাঁকা ডাকে সাড়া পাওয়া যায় না। একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়ে সেই সম্বন্ধের ধারা ধ'রে ভজন করতে হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে প্রেম। মীরাবাঈ বলেছেন না—'বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলাল।'

গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন না— পত্রং পুষ্প ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।' জিনিসের ভিতর কিছু নেই। ভক্তি ক'রে দিলে তিনি ফল, জল, গাছের ফুল পাতা পর্যন্ত গ্রহণ ক'রে থাকেন। শুধু গ্রহণ করা নয়, এর পরের চরণেই বলেছেন—'তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। অশ্নামি—আমি আহার ক'রে থাকি। আর ভক্তি না থাকলে বিবিধ মূল্যবান উপচারের দিকেও তিনি ফিরে চান না। দুর্য্যোধনের রাজোপচার ফেলে বিদুরের ঘরে খুদ খাওয়া যার স্বভাব, তাকে প্রেম না দিলে বশ করবে কি প্রকারে?

তাই তো মীরাবাঈ বলেছেন—

"সাধন করনা চাহিয়ে মনবাঁ ভজন করনা চাই।
প্রেম লাগান চাহিয়ে মনবাঁ প্রীত করনা চাই।।"

ইনি একখানি ছাপা কাগজ দিদিকে দিয়াছিলেন। আমি যে সময় উপাসনা সঙ্গীত ও স্তোত্রপদ্ধতি লইয়া মেজদাদার সহিত পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন দিদির নিকট হইতে তাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। আজ প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত উপদেশ কয়টি পাঠকগণকে উপহার দিলাম। কাগজখানিতে লেখা ছিল—

"মিত্রের মিত্রতা জানি বিপদ সময়। বীরের বীরত্ব দেখি যুদ্ধে যবে জয়।।
জগতের অনিত্যতা করিয়া স্মরণ। পুণ্যের সঞ্চয়ে দাও দিবানিশি মন।।
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি যে কার্য্য করিবে। অবশ্যই সেই কার্য্যে সুফল পাইবে।।
খালি হাতে আসিয়াছ খালি হাতে যাবে। তবে কেন এত মায়া বিষয় বৈভবে।।
বিশ্ব যদি যায় চলে কাঁদিতে কাঁদিতে। আমি শুধু রব একা কর্ত্তব্য সাধিতে।
ধন জন মান যশ কত কি যে চাই। একবারও ভাবি না যে সব মাটি ছাই।।
মনে যদি ইচ্ছা থাকে করিতে ভজন। করেন গোবিন্দ তাহা অবশ্য পূরণ।।
ভোগসুখতরে শুধু নহে এ জীবন। কঠোর কর্ত্তব্য আছে করিতে পালন।।
যতদিন আছ ভবে কর তাঁর কাজ। তাতে যদি না হয় সিদ্ধি আছে কিবা লাজ।
কায়মনোবাক্য দ্বারা দুঃখ যদি না দাও পরে। এক বাক্যে যশ তোমার গাইবে সবে এ সংসারে।
গুণ পরাক্রম হীনরূপে কিবা ফল। বিপদে বিমুখ নিতে কিবা লাভ বল।।
আত্মসিদ্ধি বাঞ্ছা যদি কর অহরহঃ। তবে সদা কর বাস সাধুজন সহ।।
ক্ষান্ত হও পাপকর্ম্ম করি পরিত্যাগ। দেব দ্বিজ গুরু প্রতি রাখ অনুরাগ।।
আলাপ পণ্ডিত সহ অলুব্ধে মিত্রতা। উত্তমের সহবাস করিবে সর্ব্বথা।।
সকল ইন্দ্রিয়গণ বশে রয় যায়। গৃহে থাকি সাধনায় সিদ্ধি হয় তার।।
বিষয়ানুরাগী যদি বনে করে বাস। ত্যজিতে না পারে তবু বিভোগের আশ।।
সদা হিতকর্ম্মী যেই বান্ধব সে জন। পিতা তিনি সদা যিনি করেন পোষণ।।
মিত্র তিনি যিনি হন বিশ্বাসভাজন। স্বদেশ সে দেশ যথা জীবিকা অর্জ্জন।।
গুণবান ধার্ম্মিকের জনম সফল। গুণ-কর্ম্মে হীন তার জীবন বিফল।।"

সেদিন ব্রহ্মচারী মহাশয় চলিয়া গেলেন। বড়বাবাজী মহাশয় দিদিকে এবং অন্যান্য মঠবাসীকে বলিলেন—"বয়স বেশী না হ'লেও কৃপা পেয়েছে, নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু-উপদেশমত কাজ করছে। তাই দেখ কেমন সাত্ত্বিক তেজ চোখে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। উনি যে কটা কথা ললিতাকে বললেন বড় খাঁটি কথা, সকলে মনে রাখবে।"

অপরাধীকে কৃপা

পূরীধামনিবাসী নিত্যধামগত কামলাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্রবধূ, শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবীর নিকট শুনিয়াছি— ললিতাদিদি যখন সখীবেশে ঝাঁজপিটা মঠে অবস্থান করিতেন, তখন মধ্যে মধ্যে বড়বাবাজী মহাশয় ইহাদের বাড়ীতে আসিতেন। কখনও কীর্ত্তনসম্প্রদায় সহ, কখনও বা ললিতাদিদি কুসুমদিদি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখনই ইঁহারা ওখানে যাইতেন, তখনই একটি লাল ও একটি কালো রংয়ের কুকুর ইঁহাদের সঙ্গে যাইত এবং যেখানে উঁহারা বসিতেন তাহার দুই পাশে স্থির ধীরভাবে বসিয়া থাকিত। পুনরায় মঠে ফিরিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আসিত।

ঐ শরৎকুমারী কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন—"ললিতা-মা এক-একদিন কীর্ত্তনে আবেশভরে নৃত্য করতেন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য শ্রীশ্রীরাসলীলাবর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রাচীন পদকর্তাগণ বলেছেন—'না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড না নড়িবে কেশ।" ললিতা মায়ের নৃত্যতেও যেন সেই দৃশ্যটি প্রকট হ'ত; ললিতা মা নৃত্য করতেন, যখন যে অঙ্গ কাঁপাতেন সেই অঙ্গ ছাড়া অন্য অঙ্গ যেন জানতেই পারত না।' আক্ষেপ করিয়া শরৎকুমারী আমাকে বলিলেন—"দাদা! যা দেখেছি তা বর্ণনা করবার ভাষা নেই। আর যে তেমনটি জীবনে দেখতে পাব সে আশাও করি না। প্রাতঃস্মরণীয় আমার শ্বশুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে বড়বাবাজী মহাশয় এবং ললিতা-মার অনেক অলৌকিক লীলাখেলাই আমাদের বাড়ীতে দেখেছি। তখন আমি বার-তের বৎসর বয়সের কুলবধূ। সকল কথা এখন মনেও পড়ে না, তবে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক এক সময় সে অপূর্ব্ব চিত্র হৃদয়ে উদয় হয়ে ব্যাকুল করে।"

এই শরৎকুমারীর শ্বশুর শাশুড়ী বড়বাবাজী মহাশয়ের এত প্রিয় ছিলেন যে, কখনও কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে ইঁহারা যে কোন রকমেই হউক তাহা পূরণ করিতেন। শুনিয়াছি—কমলাকান্তবাবুর অনুপস্থিতিতে একবার তাঁহার স্ত্রী গোপনে পুত্রবধূর গহনা একজনের নিকট রাখিয়া টাকা আনিয়া তখনকার মত বড়বাবাজী মহাশয়কে দিয়া তাঁহার প্রয়োজন মিটাইয়াছিলেন। কমলাকান্তবাবু বাড়ী আসিয়া শুনিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যে আমার অপেক্ষায় না থেকে এইভাবে বাবাজী মহাশয়ের সেবার আনুকূল্য করেছ, তাতে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। যদি শুনতাম আমি উপস্থিত নেই ব'লে তুমি প্রয়োজন মত কোন ব্যবস্থা করনি তাহ'লে সত্য সত্যই আমি মর্ম্মাহত হতাম।" পাঠকগণ! একটু ভাবিয়া দেখুন কতদূর নিষ্ঠা, কতদূর স্বার্থশূন্য মনোভাব, কতদূর নির্ভরতা হৃদয়ে থাকিলে

এইরূপ কার্য্যের সমর্থন করিতে পারা যায়।

গৌরাঙ্গ সাউ নামে এক ভক্তের বাড়ীতে বড়বাবাজী মহাশয় যাইতেন। অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা সেখানে ঘটিয়াছে। সকলগুলি প্রকাশযোগ্য নয়, তথাপি পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একদিনের একটা ঘটনা এখানে বলিতেছি।

ললিতাদিদি ও কুসুমদিদি প্রভৃতি মঠের কয়েকজন এবং বাহিরের গৃহস্থ ভক্ত কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া একদিন অপরাহ্নে বড়বাবাজী মহাশয় গৌরাঙ্গ বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। অন্যান্য বহু ভক্তের মধ্যে শরৎকুমারী ও তাঁহার শাশুড়ী অর্থাৎ কমলাকান্তবাবুর স্ত্রীও ছিলেন। সেদিন সকলে মিলিত হইয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে নানাবিধ ফুলের সাজে সাজাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল পুলিশ বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং গৌরাঙ্গবাবুর সহিত কি সব কথা বলিতেছে, বোধ হয় বাড়ী খানাতল্লাসি করিবে। বড়বাবাজী মহাশয় সকলকে স্থির থাকিতে বলিয়া বলিলেন— "তোমরা মনে মনে শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণপূজা ও আয়ানের কালীমূর্ত্তি দর্শন-লীলা চিন্তা কর এবং মুখে নাম করিতে থাক। আর অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল সকলে চোখ বুজে থাক, কোন ভয় বা কোন চিন্তা নেই।'

বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত সকলে চোখ বুজিয়া নাম করিতে থাকিলে কিছু সময় পরেই গৌরাঙ্গদাদা ঘরে ঢুকিয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে সেখানে না দেখিতে পাইয়া সদর দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। পুলিশের লোক চতুর্দ্দিক অননুসন্ধান করিয়া কোথাও বড়বাবাজী মহাশয়কে না পাইয়া চলিয়া গেল। শেষে অননুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, ঠিক ঐ সময় বড়বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটা মঠে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সন্ধ্যারতি দর্শন করিতেছিলেন। যখন গৌরাঙ্গবাবুর বাড়ী হইতে লোক ঝাঁজপিটায় গিয়াছিল, তখন বড়বাবাজী মহাশয় ভক্তগণসঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন।

পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, কোন দুষ্টপ্রকৃতি লোকের পরামর্শে বড়বাবাজী মহাশয়কে লাঞ্ছনা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। যাহা হউক, যাঁহার পরামর্শে এই যড়যন্ত্র হইয়াছিল, দুই-তিন দিন পরেই তিনি সপরিবারে বড়বাবাজী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই সব ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমরা ইঁহাদের কোন অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিতেছি না। ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং কায়মনোবাক্যে একান্ত নির্ভরশীল ভক্তকে শ্রীভগবান কিভাবে রক্ষা করেন, তাহারই একটু আভাস দিতেছি মাত্র।

দিদির চৈতন্যদাসের কৃপালাভ

বড়বাবাজী মহাশয়ের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং আদিসঙ্গী শ্রীচৈতন্যদাস সম্বন্ধে আমরা দিদির পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ পাই নাই। বিস্তৃত বিবরণ 'চরিতসুধা' গ্রন্থে দেখিবেন। আমরা এখানে 'চরিতসুধা'র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

যখন বড়বাবাজী মহাশয় গুরপ গ্রামে নামপ্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় চৈতন্যদাস অসুস্থ হইয়া বড়-বাবাজী মহাশয়ের আদেশে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পুরীতে যান। সেখানে নবদ্বীপদাদা বড় হরিশবাবুর পুরাতন ডাকঘরের পিছনের একটি কুঠরিতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দিদিকে রোগীর যাবতীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। দিদি তখনও সখীবেশ ধারণ করেন নাই, জয়গোপাল নামেই সকলের নিকট পরিচিত। যাহা হউক, সেবাগতপ্রাণ জয়গোপাল নবদ্বীপদাদার আদেশে প্রাণপণে চৈতন্যদাসের সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

চৈতন্যদাসের ভজন ছিল নিজেকে সর্ব্বক্ষণের জন্য দাসী মনে করিয়া গোপীভাবে উপাসনা করা। গুরুগতপ্রাণ চৈতন্যদাস গুরুসেবাকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের যেরূপ নিষ্ঠা ও সেবাভাবাদির বর্ণন দেখিতে পাই, চৈতন্যদাসের ভিতরেও ঠিক সেইরূপ ভাব ও গুরুনিষ্ঠা লক্ষিত হইত। শয়নে, স্বপনে, আহারে, ব্যবহারে, আলাপে, আলোচনায় চৈতন্যদাসের মুখে শ্রীগুরুতত্ত্বমহিমা ছাড়া অন্য কিছু কেহ শুনিতে পাইত না। এ হেন গুরুগতপ্রাণ চৈতন্যদাসের সেবা করিয়া দিদি যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে তাহাই নানাভাবে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হইয়া বৈষ্ণব-জগতে এক মহান মহীরুহরূপে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। বলিতে কি—চৈতন্যদাসের ভাব হইতেই বড়বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণমধ্যে গোপীভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় একদিন চৈতন্যদাস দিদির পূর্ব্বাশ্রমের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন— "জয়গোপাল! আমার তো শেষ সময় উপস্থিত, আমি প্রভুর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই যে, অচিরেই তুমি প্রভুর কৃপায় স্বপ্নেরও অগোচর এক অপ্রাকৃত বস্তু লাভ ক'রে ধন্য হও। শ্রীগুরুদেবের করুণায় যে বস্তুর কিছু কিছু অনুভব আমি পেয়েছি বলে মনে হয়। আর অযাচিত কৃপাকারী পরমদয়াল করুণাসিন্ধু শ্রীগুরুদেব নিজগুণে কৃপা ক'রে আমাকে যে-জাতীয় ভাবরত্নটুকু দিয়েছেন, আমি আজ অকপটে তা তোমাকে দান করলাম। তুমি এই মধুরাদপি

মধুর ভাবধনে ধনী হ'য়ে কিছুকাল প্রাকৃত জগতে প্রকট থেকে অপ্রাকৃত চিন্ময় রাজ্যের পরম সুখময় বস্তু আস্বাদনে ধন্য হও।"

চৈতন্যদাস এইভাবে দিদিকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়া একবার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করিলেন। নবদ্বীপদাদা বড়বাবাজী মহাশয়কে চৈতন্যদাসের অবস্থা এবং আকাঙ্খা জানাইলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। শেষে দিদি নবদ্বীপদাদার আদেশে যাইয়া কৌশল করিয়া বড়বাবাজী মহাশয়কে চৈতন্যদাসের নিকট উপস্থিত করাইলে নবদ্বীপদাদা চৈতন্যদাসকে বলিলেন—"চৈতন্য! চেয়ে দেখ দাদা এসেছেন।" চৈতন্যদাস কোন কথা না বলিয়া চোখের ভঙ্গীতে বড়বাবাজী মহাশয়কে নিজের সম্মুখে অর্থাৎ পায়ের দিকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আজ ভক্তের কাছে বড়বাবাজী মহাশয়ের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা খাটিল না। তিনি বিনা আপত্তিতে চৈতন্যদাসের পায়ের দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবার চৈতন্য দাস বিস্ফারিত নয়নে বড়বাবাজী মহাশয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একদৃষ্টে শ্রীমুখকমলপানে তাকাইয়া রহিলেন।

এদিকে নবদ্বীপদাদা বড়বাবাজী মহাশয়ের দক্ষিণ চরণখানি চৈতন্যদাসের বুকের উপর তুলিয়া দিতে গিয়া দেখেন, চাদরের নীচে কয়েকখানা কাগজ রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া বুকের উপর শ্রীচরণখানি ধরিয়া দিয়া কাগজগুলি খুলিয়া দেখেন, উহার একখানিতে শ্রীগুরুবন্দনা ও গুরুপ্রণাম লেখা আর কয়েকখানিতে লক্ষ গুরু নাম লেখা। চৈতন্যদাস এতক্ষণে তাহার চির অভিলাষিত মহামূল্য নিধি শ্রীগুরুচরণ বুকে ধরিয়া সজলনয়নে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া চির বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয় এতক্ষণ নিশ্চল নিস্পন্দ স্থির ধীরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন; চৈতন্যদাসের বিদায়-প্রার্থনা শুনিয়া ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেন প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। দুইটি চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন—"চৈতন্যরে! আমাকে ত্যাগ ক'রে তুই চির-শান্তিময় রাজ্যে গমন করছিস, এতে আমি আর কি বলব? তোর জন্মজন্মার্জ্জিত যত কিছু পাপ তাপ অপরাধ আছে সমস্তই আমি গ্রহণ করলাম, তুই নির্ম্মল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে পরম দয়াল নিতাইচাঁদের গণে গণ্য হ'য়ে তোর অভিলষিতভাবে প্রার্থিত বস্তু আস্বাদন কর্।"

এ সময়কার দৃশ্য বর্ণনাতীত—অপূর্ব্ব। 'চরিতসুধা'র ভাষায় বলি, "চৈতন্যদাসের আকর্ণবিস্তৃত নয়নভৃঙ্গযুগল বড়বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখকমলমধুপানে বিভোর। নিজ হৃদপদ্মে বড়বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণপদ্ম রাখিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে যেন হাবুডুবু খাইতেছেন। মুখখানি মৃদু মধুর হাসিমাখা এবং সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ। এক একবার চমকিয়া চমকিয়া যেন মনুষ্যজীবনের

শেষ প্রার্থিত বস্তুলাভ—সাধনের চরম অবস্থা প্রাপ্তি—পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইতেছে।”

দিদি চৈতন্যদাসের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরুদেবের নাম শুনাইতেছেন। বড়বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভক্তগণ সঙ্গে রামদাদা কীর্ত্তন লইয়া পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। কি অপরূপ দৃশ্য! একবার চৈতন্যদাসের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, মুখের মৃদু হাসি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইল। দৃষ্টি স্থির। আর শ্বাস নাই—দেহের কোনরূপ স্পন্দন নাই— সব স্থির। পাঠকগণ একবার দৃশ্যটি সম্মুখে ধরিয়া বলুন, আমরা ইহাকে কি বলিব? 'চরিতসুধা'য় বর্ণিত হইয়াছে—“ইহা মৃত্যু না নবজীবন প্রাপ্তি? দেহত্যাগ না দেহধারণ? অভাব না ভাবে প্রবেশ? অপ্রকট না নির্ব্বিকল্প সমাধি? অশান্তি না চিরশান্তি? নিরানন্দ না পরমানন্দ? উপেক্ষণীয় বা বাঞ্ছনীয়? অন্তিম কাল না প্রথমকাল? অশুচি না পরমপবিত্র?”

এই চৈতন্যদাসের অকপট কৃপাই যে দিদির ভবিষ্যৎজীবনের উন্নততর স্তরপ্রাপ্তির প্রধানতম অবলম্বন, তাহা ললিতাদিদির সেবাপরিপাটি দেখিয়া বড়বাবাজী মহাশয়ও প্রসঙ্গক্রমে বহুবার বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—“মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ কি ব্যর্থ হইতে পারে? আমরা লইতেও জানি না, পাইলেও রাখিতে পারি না, তাহাতে কি দাতার কিছু হয়? আমাদেরই দুর্দ্দৈব বুঝিতে হইবে।”

বড়বাবাজী মহাশয় চৈতন্যদাসের বিরহে সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—“কৃপাময় নিতাইচাঁদ আমাকে এমন নিষ্ঠাবান অনুভবী ভক্তের সঙ্গ দিয়ে আবার কেন যে একে অঙ্গীকার করতঃ আমাকে সে আনন্দময় সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত করলেন তিনিই জানেন।”

চৈতন্যদাসের অপ্রকটে দিদিও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে একখানি পদ রচিত হইয়াছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য 'চরিতসুধা' হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

“শ্রীচৈতন্যদাস গৌরভক্ত শিরোমণি। গোপীভাবাবেশে মগ্ন দিবস রজনী।।
কি মোহিনী মূর্ত্তিখানি কিবা ভাবাবেশ। হৃদয়ে ছিল না যাঁর কভু হিংসাদ্বেষ।।
গুরুনিষ্ঠা গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস। গুরু সর্ব্বেশ্বর জগৎগুরুর প্রকাশ।।
গুরু সেবাগত প্রাণ বৈষ্ণবেতে রতি। গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান গুরুগতি মুক্তি।।
অকপট সরলতা আছিল যাঁহার। জগজনে ছিল যাঁর মিষ্ঠ ব্যবহার।।
অন্তরে বাহিরে যাঁর ছিল গোপীভাব। সেবাপ্রীতি প্রেমোল্লাস উদার স্বভাব।।
একমুখে তাঁর গুণ কে বর্ণিতে পারে। শ্রীগুরু-করুণা যাঁরে সে জানিবে তাঁরে।।
কৃপা করি নিতাইচাঁদ দিয়াছিল সঙ্গ। আকর্ষিয়া তারে মোদের কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।।

আশীর্ব্বাদ কর ভাই! চরণে প্রণতি। তোমার প্রভুর পদে থাকে যেন মতি।।"

শাসনছলে দিদিকে পরীক্ষা

একবার মঠে কোনও ভাগ্যবান ভক্তের আগ্রহে বিশেষভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গোবিন্দদাদা সেবারে দিদির সহিত ভোগ প্রস্তুতের কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। বেলা একটা হইতে ভক্তগণের পঙ্গৎ আরম্ভ হয়। প্রায় সাড়ে তিন শত ভক্তের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। মঠের সেবক-সেবিকারাও একে একে সকলে প্রসাদ পাইয়াছেন, একমাত্র ললিতাদিদিই প্রসাদ পাইতে বাকী আছেন। এদিকে দেখা গেল, কোন প্রসাদই অবশিষ্ট নাই। বাবাজী মহাশয় বিশ্রাম করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই মঠের প্রসাদী স্থান পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাই সকলে একে একে সেই কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

সমস্ত দিন অনাহার, তাহার উপর পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছে, দিদি যেন একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুধাও পাইয়াছে। বাবাজী মহাশয় বিশ্রামে আছেন, কাজেই এই সময় কিছু গ্রহণ করিবার জন্য দিদি মঠের পার্শ্ববর্তী উড়িয়া মাতার নিকট হইতে কিছু মুড়ি আনিয়া উহাতে একটু তেল দিতে গিয়া দেখিলেন ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। এক ফোঁটা তেল বা এক টুকরা কাঁচালঙ্কাও নাই, তখন দিদি পোলাং তেল একটু লইয়া তাহা দিয়া মুড়ি মাখিয়া উহাতে তুলসী দিয়া একগাল মুখে দিলেন আর একগাল হাতে লইয়া মুখে দিতে যাইবেন, এমন সময় দিদির বমী আরম্ভ হইল। মনে হইল অন্নপ্রাশনের অন্নও বুঝি উঠিয়া যায়। পোলাং তেল জগন্নাথদেবের মশালে বা প্রদীপেই জ্বলে, উহা যে খাওয়া যায় না, দিদি তখন পর্যন্ত তাহা জানিতেন না।

এদিকে বাবাজী মহাশয় বিশ্রামান্তে উঠিয়া বহির্দ্দেশে গিয়াছিলেন, আসিয়া হাতে মাটি মাখিতে মাখিতে সেবকের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন—"একটু ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, দুটি মুড়ি খেলে হয়, কিছু নেই, শেষে একটা পোলাং তেল মেখে খেলেও হয়।"

যে সেবক ভক্ত হাতে জল দিতেছিলেন, বাবাজী মহাশয়ের কথা তিনি শুনিলেন কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এবং কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ ভাবে বলিতেছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দিদি বমী করিতে করিতে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার কানে যেমন ঐ কথা গেল, অমনি ছুটিয়া আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। বড়বাবাজী মহাশয় একটু শ্লেষভরেই দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন — "পবিত্র গোরসে পাত্র পূর্ণ ক'রে এক ফোঁটা চোনা দিয়ে সব নষ্ট ক'রে দিলি? বিনা অনুমতিতে পোড়া পেটের

জন্যে আজ এরূপ স্বতন্ত্রতা দেখালি কেন? সেদিন সারা দিনরাত অনুমতি পাসনি বলে অধরামৃতও তুলে রেখে দিয়েছিলি, সে কথা কি মনে নেই ? যা, ঐ সব বৈষ্ণবসেবার পাত্র হ'তে কণিকা কণিকা তুলে যা হবে তাই খেয়ে জল খা গিয়ে?'

দিদির প্রতি এইভাবের শাসন যখন তখন চলিত। দিদিও বিনা প্রতিবাদে শাসনকে কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিব, আমরা কোথায়। শ্রীগুরুদেব আমাদের অন্যায় দেখিলে অন্য শাসন তো দূরের কথা, দুইটা কড়া কথা বলিলেও আমরা গুরুসেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে কুণ্ঠিত হই না, আবার বড় গলা করিয়া বলিয়া থাকি 'গুরুদবের এটা ভুল হইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।' হায়, হায়, কি দুর্দ্দৈব!

দিদির নবজীবন প্রাপ্তি

আজ ঝাঁজপিটা মঠে সকলেই ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু কাহারও মুখে হাসি নাই বা কোন কথা নাই। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যে যার কাজ করিয়া যাইতেছে মাত্র। বাহিরের ভক্তবৃন্দ যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও যেন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া মধ্যে মধ্যে 'হা নিতাই কি করিলে?' 'হা প্রভু' 'হা জগন্নাথ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। নগেনদাদা গোবিন্দদাদার কোলের উপর পড়িয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া "দাদা কি হ'ল! হায় হায় দাদা কি হ'ল" বলিয়া শিশুর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন। ধৈর্য্যশীল গোবিন্দদাদারও আজ চোখের কোনে জল দেখা দিয়াছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে বলি—

এক সময় ঝাঁজপিটা মঠে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব-সঙ্গে বড়বাবাজী মহাশয় অবস্থান করিতেছিলেন। নিতাইচাঁদের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, একই সময় আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই জ্বরে পড়িলেন। দয়ালদাদা, কুঞ্জদাদা ও মধুদাদা প্রভৃতি চার-পাঁচ মুর্ত্তি ছাড়া সকলেই বিশেষ অসুস্থ। ইহারা চার-পাঁচ জনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন বলিয়া ইঁহাদেরই উপর কোন রকমে ঠাকুরসেবা ও রোগীদের শুশ্রূর ভার দেওয়া হইয়াছে। বড়বাবাজী মহাশয়ের শরীরও বিশেষ ভাল নয়। তবে ললিতাদিদির অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। দশ-বার দিনের মধ্যে অন্যান্য অনেকেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু ললিতাদিদির অবস্থা দিন দিনই খারাপের দিকে চলিয়াছে। উত্থানশক্তিরহিত, কেহ ধরিয়া উঠাইলেও অমনি দাঁতি লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া যান, এত দুর্ব্বল।

মঠের পিছন দিকের দোতলা ঘরের নীচের তলায় দিদিকে রাখা হইয়াছে। সেবা-শুশ্রূষার জন্য মধুদাদাই অধিকাংশ সময় দিদির নিকট থাকেন। একদিকে রোগের উৎপীড়ন, অন্যদিকে দিদির মনে সর্ব্বদাই হা-হুতাশ ভাব। এ হা-হুতাশ রোগযন্ত্রণার জন্য নয় : সেবাগতপ্রাণ ললিতাদিদি সেবায় বঞ্চিত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার বড়বাবাজী মহাশয়ের অসুস্থ শরীর. তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন ঠিক ঠিক পাইতেছেন কি না এবং নিজের জন্য বৈষ্ণবগণ নানা প্রকারে কষ্ট পাইতেছেন, এই সকল কারণেই দিদির সর্ব্বদা হা-হুতাশ।

দিন দিন দিদির স্বাস্থ্যের অবস্থা অবনতির দিকেই যাইতেছে দেখিয়া কয়েক জন আশ্রমবাসী একদিন বড়বাবাজী মহাশয়কে গিয়া বলিলেন—"ললিতাদিদির অবস্থা ক্রমে ক্রমে যেরূপে দাঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয়। এ যাত্রা তিনি রক্ষা পান কি না। আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

বড়বাবাজী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দেখ যাদের সেবাগত প্রাণ, তারা সেবাসমূখে বঞ্চিত হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে চায় না, কাজেই সে অবস্থায় তাদের বাঁচা অপেক্ষা ম'রে যাওয়াই সুখকর। আমার মতে তোমরা সকলে ওকে আশীর্ব্বাদ কর, যাতে ওর এই কষ্টের জীবন পরিত্যাগ হয়ে যায়।"

ভক্ত—আপনি একটু কৃপা করুন, তা হ'লেই দিদি ভাল হয়ে যাবেন। আর একটা কথা—সেবা করবার এমন প্রবল বাসনা দিদির প্রাণে রয়েছে, যদি সে আশা অপূর্ণ থাকে, তবে যে চিরদিন পদে পদে আমাদের সে কথা স্মরণ হ'য়ে কষ্ট হবে। আপনি একটু কৃপা করুন।

এইভাবে অন্যান্য ভক্তগণও নিজ নিজ ভাবানুযায়ী দিদির আরোগ্য-কামনায় বাবাজী মহাশয়কে প্রার্থনা জানাইলেন। এদিকে দিদি ঘন ঘন অজ্ঞান হইয়া যাইতেছেন। এক-একবার এমন হয় যে, মনে হয় আর বুঝি জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু লীলাময়ের কি ইচ্ছা জানি না, আবার দিদি চৈতন্যলাভ করিয়া "জয় গুরু" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বাবাজী মহাশয় মধ্যে মধ্যে দূর হইতে এক-একবার দর্শন দিয়া যান মাত্র।

এইভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে। একদিন সকাল হইতে দিদি কাঁদিতেছেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছু, না বলিয়া কেবল ডান হাতটি কপালে ঠেকাইয়া চোখের জলে বুকে ভাসাইয়া কাঁদিতে থাকেন। মধুদাদা দিদির মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি! আজ অমনভাবে কাঁদছ কেন? শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে ?" দিদি মধুদাদার হাত দুইটি ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"ভাই! কি আর বলব? আমি এই সেবার অযোগ্য

দেহটাকে ছাড়তে যত চেষ্টা করছি, আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে ছাড়া অনুকূলে কেউই সাড়া দিচ্ছে না। মনে করেছিলাম নবদ্বীপদাদা বোধ হয় কৃপা ক'রে দাসীকে তাঁর কাছে টেনে নিবেন: কিন্তু অভাগীর ভাগ্যে তাও হ'ল না। এখন এই সেবায় বঞ্চিত ভাঙ্গা দেহভার আর কতদিন বইতে হবে কে জানে? এই কাঠের পুতুলটার জন্যে তোমরাই বা ভাই আর কত কষ্ট ভোগ করবে?'

মধুদাদা—কেন দিদি তুমি দুঃখ করছ? তোমার সেবা ক'রে সত্যি সত্যিই আমারা কোন কষ্ট অনুভব করি না। তবে আমাদের সুখ শান্তি তখনই হবে, যখন তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে। আচ্ছা দিদি! নবদ্বীপদাদার কথা কি বলছিলে?

দিদি—ভাই ! গতরাত্রে তোমরা চ'লে যাবার পর মনে মনে চিন্তা করছি যে, নবদ্বীপদাদা প্রকটকালে একটু কিছু হ'লে ছুটে এসে কত সান্ত্বনা দিতেন আর এখন এ অবস্থায় একবার ফিরেও চাইছেন না ? আমি তো শত সহস্র অপরাধে অপরাধিনী, কিন্তু তিনি কি স্বপ্নেও একবার এসে আমায় দেখা দিতে পারেন না? এইরূপে চিন্তা করতে করতে একটু তন্দ্রার মত এসেছে আর দেখি নবদ্বীপদাদা আমার মাথার কাছে বসে বুকের উপর হাত দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলছেন—"কি রে তোর হ'ল কি?" আমি তখন ঠিক প্রত্যক্ষের মত আবদার ক'রে বললাম—"দাদা! তুমি তো বেশ চ'লে গেলে, আমার যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল।"

দাদা সেইমত হাসতে হাসতেই বললেন—"সে কি রে, তোর যে এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। তোকে এখন কিছুদিন এই জগতে থেকে সেগুলো সেরে নিতে হবে। তারপর তোকে এখন নিয়ে গেলে দাদার (বড়বাবাজী মহাশয়ের) যে খুব কষ্ট হবে। তুই এখন কিছুদিন দাদার সেবা কর্ তারপর যা হয় হবে।"

আমি পূর্ব্বের মতই আবদার ক'রে বললাম—হ্যাঁ, আমি তো তোমার দাদার সেবা ক'রে উল্টে দিচ্ছি; আমি এখন নিজেই সকলকার কাছে সেবা গ্রহণ করছি। আমার দ্বারা তাঁর সুখ হওয়া দূরের কথা বরং প্রতিনিয়ত দুঃখই হচ্ছে। তুমি আমার কৃপা কর। আর এভাবে সকলের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে ইচ্ছে নেই। আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল। এইভাবে অনেক কিছু বললাম, কিন্তু কিছুতেই দাদা রাজী হলেন না। শেষে বললেন—'আচ্ছা, এখন তোর যা ইচ্ছে কর্, পরে দেখা যাবে।' এইভাবের কথা হ'তে হতেই আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। এখন ভাই তোমাদের সকলের কাছেই আমি বিদায় চাই। তোমরা আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যা কিছু অপরাধ করেছি সব ক্ষমা ক'রে আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে যোগ্য দেহ লাভ ক'রে তোমাদের প্রভুর সেবা করবার সৌভাগ্য পাই।

আজ আমার শেষ দিন, তোমরা শেষ সময় আমাকে একটু নাম শুনাও। আর একটি প্রার্থনা—কৃপাময় প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পাবার জন্য প্রাণ যেন কেমন ব্যাকুল হচ্ছে। তিনি কি শেষ সময় এই অদৃশ্যা অস্পৃশ্যা চণ্ডালিনীকে একবার দর্শন দিয়ে বাসনা পূর্ণ করবেন?

মধুদাদার কাছে দিদি এইভাবে সকল কথা বলিতেছেন আর অঝোরে কাঁদিতেছেন। মধুদাদাও কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবগদগদকণ্ঠে গাহিতেছেন—"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।"

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দিদির অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে। শরীর যেন ক্রমেই অবশ হইয়া আসিতেছে। এদিকে বাবাজী মহাশয় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া গলি-রাস্তায় একেবারে দিদি যে ঘরে আছেন সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মধুদাদা বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। দিদির উঠিবার বা স্পষ্ট করিয়া কিছু; বলিবার শক্তি নাই। মনে মনে কি বলিলেন তিনিই জানেন। বাহির হইতে দেখা গেল, দিদির দুইটি চক্ষু, দিয়া অবিরত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। বাবাজী মহাশয় কিছু সময় দিদির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া "আচ্ছা, নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" শুধু এই কয়টি কথা বলিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরের অলক্ষিতভাবে দিদির দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

বাবাজী মহাশয়ের কৃপাস্পর্শে দিদি অত্যন্ত সুখী হইয়াছেন, তাই মধুদাদাকে নিজ প্রার্থনানুযায়ী আশাপূর্ণজনিত আনন্দে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন-—'ভাই! প্রার্থনা করেছিলাম শেষ সময় একবার দর্শন পাবার, কিন্তু দয়াময় প্রভু আমাকে দর্শন ও স্পর্শন দুই দিলেন। আশার অতীত দান, এর চেয়ে দয়ার পরিচয় আর কি হতে পারে?" মধুদাদা "জয় নিতাই গৌর হরিবোল" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় ঠাকুরবাড়ীতে যাইয়া বলরামবাবু নগেনবাবু ও কুঞ্জদাদা প্রভৃতি চার-পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"ললিতার তো অন্তিম সময় উপস্থিত, এ অবস্থার আর ঘরের মধ্যে কেন? ওকে ধরাধরি ক'রে নাম করতে করতে ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে এস না?"

তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত সকলে নাম করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে দিদিকে উঠাইয়া দশ-পনের হাত যাইতেই দেখিলেন, দিদির দুইটি চক্ষুই নিস্পন্দ, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন দেহ অসাড়। দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে বলিলেন "ঠাকুরের সম্মুখে শুইয়ে দাও।'

আদেশানুসারে শয়ন করাইয়া দিয়া দিদির তখনকার অবস্থা দর্শনে সকলেই নানাপ্রকার শোকব্যঞ্জক আক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দিদির গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া মৃদুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আশ্রমের সেবাপূজার কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দূরের মৃদু ক্রন্দনধ্বনি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাবাজী মহাশয়ের কোন-দিকে ভ্রূপেক্ষ নাই, তিনি মধ্যে মধ্যে "জয় নিতাই, নিতাই" ধ্বনি করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব সেই সময় মঠে উপস্থিত ছিলেন। বড়বাবাজী মহাশয়ের বড় গুরুভাই মাধবদাস বাবাজী মহাশয়ও সেই সময় কিছুদিন যাবৎ ঝাঁজপিটায় অবস্থান করিতেছিলেন। বাবাজী মহাশয় সকলের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়া করযোড়ে বলিলেন—"আপনারা সকলেই অদোষদর্শী ভূবনপাপন বৈষ্ণব, ললিতার সর্ব্ববিধ অপরাধ ক্ষমা ক'রে ওকে আশীর্ব্বাদ করুন, ও যোগ্যদেহ লাভ ক'রে অভীষ্ট-সেবা প্রাপ্ত হোক্। আর কৃপা ক'রে আপনারা ওর মাথায় আপনাদের শ্রীচরণরজ প্রদান করুন।" এই সময় হঠাৎ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব সেখানে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া উহাদিগকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া দিদিকে দেখাইয়া করযোড়ে বলিলেন— "এ বড়ই সেবানিপুনা ছিল, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা এর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল, না জানি কোন্ দুর্দ্দৈব বশতঃ আজ এইভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছে, আপনারা এর পরকালের সম্বলের জন্য এর মস্তকে চরণ অর্পণ করুন। মহাত্মা তিনজন প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও বাবাজী মহাশরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রসন্নচিত্তেই দিদির মস্তকে শ্রীচরণরজ প্রদান করিলেন।

মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"যাদব! সকলেই চরণধূলি দিলেন, কই তুমি তো দিলে না ? আমার মনে হচ্ছে তোমার চরণস্পর্শ পেলেই ললিতা আরোগ্যলাভ করবে।" বাবাজী মহাশয় একটু, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এর বিশ্বাস হোক্ আর না হোক্ আপনাদের তো বিশ্বাস হয়েছে।" তাহাতে মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ওর এখন কি আছে, ও তো এখন মরা মানুষ। এখন আমাদের বিশ্বাসেই কাজ হবে। তুমি ওর মাথায় চরণ দাও।"

বাবাজী মহাশয় উঠিয়া দিদির শয্যার নিকটে গিয়া মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছু সময় চাহিয়া থাকিয়া ছলছল নেত্রে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন "এই শুকনো কাঠখানাকে বাঁচিয়ে নিতাইচাঁদের যে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে তিনিই জানেন।" এই বলিয়াই "জয় নিতাই জয় নিতাই" বলিতে বলিতে দক্ষিণ চরণখানি

ললিতাদিদির মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যপ্ত স্পর্শ করাইয়া একটি সেবককে বলিলেন—"শ্রীমন্দির হ'তে ঠাকুরের স্নানজল এনে ওর মুখে দিয়ে দাও।'

ভক্তটি বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত ঠাকুরের স্নানজল আনিয়া মুখে দিতেই দিদি চক্ষু মিলিয়া চাহিলেন। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই বাবাজী মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া স্খলিত বসন সামলাইয়া মাথায় ঘোমটা দিতে ব্যস্ত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে "নিতাই গৌর হরিবোল" ধ্বনি উত্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় তখন দিদির কাছে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ললিতা! তোমার ভাগ্যের সীমা নেই। শ্রীবৃন্দাবনবাসী মহাত্মাগণের শ্রীচরণরজ পেয়ে তাঁদের কৃপায় এ যাত্রা পুনর্জ্জীবন পেলে। বেশ ভক্তি ক'রে এঁদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। যেন আজীবন মনে থাকে যে, বৈষ্ণবকৃপায় এ জীবন লাভ হয়েছে। যতদিন বৈষ্ণবে প্রীতি রাখতে পারবে ততদিন কোনই ভয় নেই। করুণাময় বৈষ্ণবগণ সকল বিপদ হ'তেই তোমাকে রক্ষা করবেন।"

আগন্তুক বৈষ্ণব তিনমূর্ত্তি বিস্মিতভাবে একবার বাবাজী মহাশয়ের দিকে আবার ললিতাদিদির দিকে চাহিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে সকলেই লক্ষ্য করিল যেন দিদি কি বলিতেছেন। যদিও স্বর অস্পষ্ট, কিন্তু ওষ্ঠাধরকম্পন বেশ লক্ষ্য হইতেছে। ভক্তমণ্ডলীর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি আবার নিস্তব্ধ হইল।

বড় বাবাজী মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তোমরা গোলমাল না ক'রে সকলে মিলে নাম কর।" সঙ্গে সঙ্গে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামের ধ্বনি উঠল। খোল করতাল সহযোগে ভক্তগণ কিছু, সময় কীর্ত্তন করিবার পর বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে দিদিকে বলিতে লাগিলেন "দেখ ললিতা! ঠাকুরের কাছে তোমার অপরাধ হয়েছে। তুমি বুঝতে পার আর নাই পার, ঠাকুর কৃপাময়, তিনি কৃপা ক'রে এইভাবে আজ তোমাকে রক্ষা করলেন। তাঁর কাছে নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর ভবিষ্যতে যাতে ওরূপ অপরাধ না হয়, তার জন্যও শক্তি প্রার্থনা কর।"

দিদি অতি ক্ষীণস্বরে কি বলিলেন ভাল শোনা গেল না। কথা বলিতে যে দিদির কষ্ট হইতেছে তাহাও উপস্থিত সকলে লক্ষ্য করিলেন। মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বড়বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন "আমার মনে হয়, এখন আর ওকে এভাবে প্রশ্নাদি ক'রে ব্যস্ত করা উচিৎ না। একটু সুস্থ হ'লে ধীরে ধীরে যা কিছু, বলবার থাকে বল্‌লে ভাল হয়।

বাবাজী মহাশয় তখন ভক্তবৃন্দও শুনিতে পায় এইভাবে দিদিকে বলিলেন—"ললিতা! শুনে রাখ যে, ঠাকুরের ভোগের দ্রব্য অপ্রসাদী অবস্থাতে আমাদের

দিয়েই এইভাবে রোগে ভুগছিলে। সাবধান, আর যেন কখনও এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়।" সেবকগণকে বলিলেন—"আজ থেকে ললিতার অন্য ঔষধপথ্য বন্ধ, ওকে কেবল চরণামৃত ও প্রসাদ সেবা করতে দেবে। কোনরূপে অপ্রসাদী জিনিস যেন ওকে দেওয়া না হয়।"

বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত থাকিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই দিদি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তবে দেহের দুর্ব্বলতা ছিল। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের যে কি মনোভাব তাহা বোঝা যায় না। প্রথম যেদিন দিদি সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সেইদিনই পঞ্চাশ-ষাট মূর্ত্তি বৈষ্ণবের সেবার মত রন্ধন দিদিকে দিয়া করাইলেন। গোবিন্দদাদা, নগেনদাদা, মধুদাদা প্রভৃতি দিদির কষ্ট হইবে বলিয়া আপত্তি করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"আজ্ঞে, ও যে মরা মানুষে, এখনও ওর ভাল ক'রে চলবার শক্তি হয় নি, ও কিভাবে এত লোকের রান্না করবে?"

বাবাজী মহাশয় আপত্তি শুনিলেন না। তিনি উহাদিগকে বলিলেন "অপরাধ যেমন গুরুতর হয়, তার খণ্ডনও তেমনি গুরুতরভাবেই হওয়া দরকার। আর যে শক্তির কথা তোমরা বলছ, সে শক্তি কি গাছের ফল যে কেউ এনে দিবে, বা বৃষ্টির জল যে আকাশ থেকে পড়বে? সেবা না করলে শক্তি আসবে কোত্থেকে ? সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লেই যাঁর সেবা তিনি ক্রমে ক্রমে শক্তিসঞ্চার করবেন। যাও, তাকে আদেশমত কাজ করতে বল।"

আর কেহ কিছু, বলিতে সাহস করিল না। বলাবাহুল্য, বাবাজী মহাশয়ের আদেশমত দিদি সমস্ত কার্য্যই অতি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইভাবে পরদিবস রাত্রেও প্রায় এক মণ দুগ্ধের সুজির পায়স ও অন্যান্য বহু প্রকার ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া জগন্নাথদেবের ভোগ দিয়া প্রায় আড়াই শত মূর্ত্তি বৈষ্ণব ও দঃখী কাঙ্গালী সেবা করাইলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এদিনও রন্ধন এবং পরিবেশনের কার্য্য ললিতাদিদিকে দিয়াই করাইয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ের এই সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহার কৃপাশক্তির জয় দিতে লাগিলেন।

বড়বাবাজী মহাশয়ের গুরু-তত্ত্ব উপদেশ

এই ঘটনার দুই-তিন দিন পরে মঠের নির্দ্দিষ্ট সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া ললিতাদিদি নগেনদাদাকে সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়া দেখেন মধুদাদা বাবাজী মহাশয়কে বাতাস করিতেছেন। আর কুঞ্জদাদা কি প্রশ্ন করিয়াছেন, বাবাজী মহাশয় তাহার উত্তরে কি বলিতেছেন। কথা-প্রসঙ্গে দিদি বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন—"সেদিন ঠাকুরের নিকট আমার অপরাধ হয়েছে বললেন,

কিন্তু আমি তো কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না যে, কখন, কোথায়, কি অপরাধ করেছি। দয়া করে আপনি আমাকে ব'লে দিন।"

বাবাজী—আমি আর কি বলব, ঠাকুরের নিয়মিত ভোগ ছাড়া আমাদের উপলক্ষ্য ক'রে মঠে অনেক কিছু প্রস্তুত হয়, কিন্তু তুমি সেসব ঠাকুরকে নিবেদন না ক'রেই অপ্রসাদী আমাদের দাও। ঠিক কি না বল দেখি?

ললিত—আছে হ্যাঁ, তা কখন কখন হয় বটে। তবে তাতে তো ঠাকুরের কাছে অপরাধ হ'ল না, অপরাধ হ'ল আপনার কাছে।

বাবাজী—না, তা হয় না ললিতা, ঠাকুরের নিকটই অপরাধ হয়। কারণ, এ সংসার ঠাকুরের সংসার, কতবার তোমাদের বলেছি। ঠাকুরকে উপলক্ষ্য ক'রেই এখানে যা কিছু আসে, তোমরা যদি সে সব তাঁকে অর্পণ না ক'রে নিজেরা গ্রহণ কর তাহ'লে চুরি করা হয় না কি ? এই চৌর্য্যজনিত অপরাধের দণ্ড কে নিবে?

ললিতা—আচ্ছা, যাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে যে দ্রব্য আসে, তাঁকে সেই দ্রব্য দিলেও কি চুরিজনিত অপরাধ হয়?

বাবাজী—হয় বই কি! ভগবৎসংসারবাসী যে কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য ক'রেই যা কিছ, আসুক না কেন, সবই ভগবানের আনীত এবং অধিকৃত ব'লে বুঝতে হবে। আমরা যে তাঁর দাস।

ললিতা—এ কথায় আমার মনে গোটা কয়েক সন্দেহ জাগছে, দয়া ক'রে সন্দেহভঞ্জন ক'রে দিন।

বাবাজী—বেশ তো, অকপটে বল কি সন্দেহ?

ললিতা—শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বচন দেখা যায়, তাতে গুরু-কৃষ্ণ এক বস্তু এই কথাই প্রমাণ হয়। গুরুগীতায় বলেছেন—"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।" এই সব বাক্যে গুরুসেবাই যদি সর্ব্বোপরি হ'ল, তবে গুরুকে অপ্রসাদী দিতে আপত্তি কি? সর্ব্বাগ্রে যখন গুরুপূজা ও প্রণাম বন্দনাদির ব্যবস্থা রয়েছে, তখন আমার মনে হয় গুরুকে অপ্রসাদী দেওয়াই উচিত বরং প্রসাদী দিলে অপরাধ হবে।

বাবাজী—এ কথাটি একটি বড় কথা ললিতা। প্রসঙ্গ তুলে ভালই করেছ। একটু আলোচনা করা যাক। উপাসনার মধ্যে যত কিছু গোলমাল, যত কিছু, মতদ্বৈধ, যত ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন পথে ধর্ম্মজগতে সম্প্রদায়-বিভেদ হয়েছে বা হচ্ছে তার মূলে অনুসন্ধান করলে দেখবে একমাত্র এই গুরুতত্ত্বই তার মূলে। ঠিক ঠিক ভাবে গুরুতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হ'লে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বেশ নিবিষ্ট চিত্তে শোন।

'তত্ত্ব এবং লীলা দুইটি পৃথক। তত্ত্বতঃ গুরু কৃষ্ণ এক হ'লেও লীলাগত পার্থক্য আছে। তোমাদেরই শাস্ত্রে বলে—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" নিজে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ব'লেই স্ত্রীর একটি নাম জায়া। এই তত্ত্বগত পিতা পুত্র এক হ'লেও লীলাগত পার্থক্য না রাখিলে ঘোর অপরাধ হয়। "যশোদা নন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই।" ইত্যাদি প্রমাণে কৃষ্ণ এবং গৌর তত্ত্বতঃ এক. কিন্তু লীলাগত বা স্বরূপগত পার্থক্য না থাকলে পৃথক পৃথক পূজা বা পৃথক পৃথক ধ্যান-প্রণামাদির অপলাপ হয়ে পড়ে। এই তত্ত্ব এবং লীলাকে এক ক'রে নিয়েই একশ্রেণীর লোক মহাপ্রভুর পৃথক ধ্যান-মন্ত্রাদি স্বীকার করেন না। এইরূপে দ্বারকানাথ, মথুরানাথ এবং রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ এক, কিন্তু লীলাগত পার্থক্য থাকার বিষয় বিশেষভাবেই সর্ব্বত কীর্ত্তিত হয়েছে।

অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও এইরূপে তত্ত্বতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন। কারণ, জীব অণু, আর ব্রহ্মপূর্ণ। জীব অংশ, তিনি অংশী। তারপর যদি তুমি লীলাগত পার্থক্য মানতে না চাও, তা হ'লে তো কৃষ্ণসেবা করলেই গুরুসেবা করা হ'ল, কৃষ্ণকে ভোগ দিলেই গুরুর ভোগ হ'ল, আর পৃথকভাবে গুরুসেবার আবশ্যক কি ? শাস্ত্রসমূহ তত্ত্বগত যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেছেন, সেই সমস্ত বাক্যকে লীলাগত ধ'রে নিয়েই তো এই সমস্ত মতবিভ্রাট ঘটেছে।

তারপর শাস্ত্র ছেড়ে যদি শুধুমাত্র যুক্তির দিকে ধর, তা হ'লেও তোমার মত টিকে না। কেন না সেবা শব্দে সেব্যকে সুখী করা বুঝায়। গুরুদেব যাতে সুখী হন, সেইরূপে আচরণ করাই কি শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে উচিত নয়? "আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া।' গুরুদেব যেটি আদেশ করবেন, শিষ্যের সেইটিই অবশ্যপালনীয়। গুরুর আজ্ঞায় কোনরূপে বিচার চলে না। তুমি হয়তো তোমার নিজের জেদ বজায় রাখতে শাস্ত্রবাক্যের একাংশ গ্রহণ ক'রে অথবা নিজ সুখের জন্য গুরুকে অপ্রসাদী বস্তু প্রদান করলে, তিনিও হয়তো শাস্ত্রযুক্তিতে তোমার কাছে পরাস্ত হ'য়ে অগত্যা সেই বস্তু গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন; কিন্তু যে সুখের জন্য তাঁকে দেওয়া সে সুখ তো তাঁর হ'ল না। আচ্ছা, বল দেখি এভাবের সেবায় সেবকের কি লাভ হ'ল?'

এইভাবের বহু আলোচনা দ্বারা ললিতাদিদির প্রতিটি প্রশ্ন বাবাজী মহাশয় খণ্ডন করিয়া দিলেন। দিদি তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি না যে, কি ভাবে, কার কাছে, কখন কোন্ অপরাধ করেছি। সকলের কাছেই আমার এই প্রার্থনা—আমার দ্বারা যেন কখনও কারও কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য সাধন না হয়। সকলে আমাকে এই ভিক্ষা

দিন। আর আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত সকল প্রকার অপরাধ ক্ষমা করুন।”

এই প্রসঙ্গটি ‘চরিত-সুধা’ গ্রন্থে “ললিতাদাসীর পুনর্জ্জন্ম” নামে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উহার অংশবিশেষ পাঠকগণকে উপহার দিলাম মাত্র। তবে পূজনীয় মধুদাদার নিকট যেভাবে শুনিয়াছি, তাহাতে স্থানে স্থানে কথাবার্ত্তার একটু ভিন্নরূপ হইয়াছে; অবশ্য মূল ঘটনার কোনরূপে পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রিয়জনবিয়োগে দিদির পত্র

সখীবেশ ধারণের পূর্ব্বে পিতৃদেবের সৎকার সময় কালীঘাট শ্মশানে বসিয়া দুই ভাইয়ের আলোচনা পূর্ব্বশ্রম কাহিনীতে আলোচিত হইয়াছে। আজ দিদির নিজহস্তলিখিত একখানি পত্রে তাঁহার কোন প্রিয়জনবিয়োগে তাঁহার আত্মীয়ের নিকট যে সান্ত্বনাবাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। অন্যান্য কথার পর দিদি লিখিয়াছেন—

“...আশা করি মঙ্গলময় প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদে প্রাণে প্রবোধ পাইয়াছ। আমি যখনই কলম ধরিতে যাইব মনে করি, তখনই সেই দেবপ্রতিম সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষটির মুখখানি মনে পড়িয়া হৃদয়টাকে কেমন যেন উদ্বেলিত করিয়া তোলে। এখন এই অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। গোপালকে এবং অভাগিনী ইন্দুকে কাছে বসাইয়া বুঝাইবে, ‘এ কর্ম্মভূমি, যতদিন যে অবস্থার যাহাকে যেখানে থাকার নিয়ম বিধাতা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যদি বল দেহের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তবে দেহ তো তোমাদের কাছেই ছিল, তোমরা ফেলিয়া দিলে কেন? আর যদি বল ঐ দেহের মধ্যে যিনি ছিলেন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ; তবে তো তিনি নিত্যই রহিয়াছেন। তাঁহার তো মৃত্যু নাই, তবে দুঃখ কেন ? এ দুঃখ আমি বলিব স্বার্থের জন্য। তিনি এই দেহে তোমাদের কাছে থাকিয়া তোমাদের অনেক কাজকর্ম্ম করিতেন এবং তাহা দ্বারা তোমাদের অনেক স্বার্থসিদ্ধি হইত। আজ সেই স্বার্থসুখের অভাবেই তোমরা কাঁদিতেছ। এ কান্না মায়ার কান্না, প্রকৃত ভালবাসার কান্না নহে। যদি প্রকৃত তাঁহাকে ভালবাস, তবে এই কর্ম্মভূমি হইতে তাঁহার নিজ কর্ম্মফলে যে স্থানে তাঁহার সূক্ষ্মদেহ বাস করিতেছে, ঐ দেহে অবস্থিত তাঁহার অভিমানী জীবাত্মার ঊর্দ্ধতমলোক এবং সুখময় অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। নিজ নিজ ইষ্টনাম করিয়া কাতর প্রাণে তাঁহার জন্য কাঁদ, শান্তি পাইবে।

ভাবিয়া দেখ, তোমাদের সংসারে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গ বা প্রসঙ্গে তিনি

কত না তাপ, কত না অশান্তি, কত না ব্যথা—উদ্বেগ পাইতেন। কত না বিরলে চোখের জল ফেলিতেন। আজ সেই ত্রিতাপজ্বালার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া কেমন আনন্দময় রাজ্যে পরমানন্দে বাস করিতেছেন। কেমন সুখময় অবস্থা ভোগ করিতে করিতে পরম শান্তি লাভ করিতেছেন। কিন্তু তোমরা তাঁহার ঐ সুখ-শান্তির কথা মনে আনিয়া কোথায় আনন্দ করিবে, তোমাদের সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের ছায়া তাঁহার মনে পড়িয়া আরও আনন্দ হইবে, আরও আশীর্ব্বাদপূর্ণ কৃপা তোমাদের উপর আসিবে। তাহা না করিয়া তোমরা যতই স্বার্থসুখের জন্য দুঃখ করিবে, কান্না করিবে, সেই ছায়া যেমন তাঁহার চোখে পড়িবে, বল দেখি তিনি কত দুঃখ পাইবেন ? তাঁহার সেই বিমল শান্তির কত ব্যাঘাত করা হইবে? তাই আমাদের শাস্ত্রে মৃতব্যক্তির জন্য চোখের জল ফেলা নিষেধ।

পত্রে আর কি লিখিব, সকলকে সান্ত্বনা দিও—"মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।" কথাটি ইন্দুকে ও গোপালকে বুঝাইয়া দিও। মায়ের কথা আর কি বলিব ? মাকে বলিও, প্রভুর ইচ্ছা, কি করিবেন, ভোগ করিতেই হইবে। দুঃখ করিয়া চিন্তা করিয়া মাথা খারাপ করিয়া লাভ নাই। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া গোপালের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করুন, উহাকে সান্ত্বনা দিয়া যাহাতে পিতার পারলৌকিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারে, সেই ভাবে যেন উপদেশ দেন।

অবকাশমত "মনশিক্ষা" "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" পাঠ করিয়া উহাদিগহে শুনাইও। ইতি—

শ্রীগুরুপদাশ্রিতা
তোমার দিদি

২১শে বৈশাখ
১৩৪৬

পত্রে উপদেশ

একবার একজন ভক্ত দিদির নিকট পত্রে অন্যান্য কথা লিখিয়া শেষে লিখিয়াছিলেন—"আমরা বড়ই অশান্তিতে আছি, নিয়মিতভাবে নাম করিতেও পারিতেছি না। মধ্যে মধ্যে অবিশ্বাস আসিয়া নামসাধনে বাধা দিতেছে। কিসে এর শান্তি হয় লিখিবেন।" ইত্যাদি

দিদি তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—... "তোমাদের শারীরিক ও মানসিক অশান্তির কথা শুনিলাম। কি করিবে? প্রভুকে জানাও তিনি মঙ্গলময় শান্তিদাতা, মঙ্গল বিধান করিবেন। মনুষ্যের কোনই হাত নাই, আপন কর্ম্মফল অনুসারে যদিও জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে সত্য, কিন্তু ইচ্ছাময় ইচ্ছা করিলে উহার মধ্য

দিয়াই পরমশান্তি দান করিয়া জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন।

সর্ব্বদা নাম কর। বিপদে, সম্পদে, সুখে দুঃখে শান্তির আধার প্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা করিও। ভাল না লাগিলেও ঔষধ খাইবার ন্যায় জোর করিয়া তাঁহাকে ডাক, সকল বাধা বিপত্তি কাটিয়া গিয়া প্রাণে আনন্দ আসিবে সন্দেহ নাই।

প্রহ্লাদের মাতা কয়াধু, ধ্রুবের জননী সুনীতি, দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতির ধৈর্য্যের কথা মনে মনে স্মরণ করিও। তাঁহাদের ন্যায় শক্তিশালিনী হইতে না পারিলেও অনেকটা শান্তি আসিবে। শ্রীশ্রীরাধারাণী কত না লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে থাকিয়াও কৃষ্ণচিন্তা করিয়া পরম আনন্দে কালযাপন করিয়াছেন। ভয় কি? প্রভুকে ডাক, তাঁহার কৃপায় সব মঙ্গল হইবে। সকলকে আমার "জয় গুরু' জানাইবে। ইতি

শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্রিতা

তোমাদের দিদি

দিদির মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা পত্রাদিতে যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার মধ্যে ভজন-তত্ত্ব যেন একটু বেশী বেশী প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট হইতে এ-জাতীয় বহু পত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, প্রসঙ্গক্রমে আলোচনার চেষ্টা করিব। অত্যন্ত অন্তরঙ্গগণ-সঙ্গে লীলাতত্ত্বাদি আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সকল অমূল্য বাক্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। অনেক সময় সে সকল কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে নিষেধও করিয়াছেন। সঙ্গীদের বলিতেন—"ঠিক সমপথযাত্রী না হ'লে অনেক সময় এক কথারই ভিন্নার্থ" গ্রহণ ক'রে বিভ্রাট ঘটায়। ইষ্টগোষ্ঠী আর ধর্ম্ম উপদেশ বা আলোচনা এক কথা নয়।" ইত্যাদি।

দিদির নিকট কোন প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে কেহ কিছু লিখিতেছেন দেখিলে তিনি বলিতেন—"ও সব আবার পল্লবিত হ'য়ে যেন বাজারে প্রচার না হয়।" নিজেকে গোপন রাখার স্বভাব যে দিদির বাল্যকাল হইতেই ছিল, তাহার কিছু কিছু, পরিচয় পূর্ব্বাশ্রম কাহিনীতে পাঠকগণ পাইয়াছেন। সখীবেশ ধারণের পরও অবিচ্ছিন্ন ধারার কঠোর ভজন করিয়াছেন, কিন্তু কোনদিন কোনভাবে কাহাকেও জানিতে দিতেন না যে, কোথায় কি ভাবে কি করিয়াছেন বা কি করিতেছেন।

স্মরণমননকালে কোনদিন কোন লীলানুভব হইয়া কিছু, স্ফূর্ত্তি পাইলে পদের আকারে তাহা লিখিয়া অন্তরঙ্গদের নিকট বলিতেন—"দেখ দেখ, তোমাদের রঙ্গিয়া ঠাকুরটির রঙ্গ দেখ, কি ভাবে কেমন রঙ্গভরে লীলা করছেন।" অনেক চেষ্টায় আমরা এ-জাতীয় কয়েকটি পত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টাকারে উহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

ফণীদাদার সংশয় ভঞ্জন

শ্রীধাম নবদ্বীপে বাগানবাড়ীর সন্নিকটেই গোবিন্দদাদা থাকেন। তাঁহার একটি সেবক বিকলাঙ্গ হেতু তাহাকে দেখিলেই ছেলেরা নানা প্রকার উক্তি করে। যখনকার কথা আমি বলিতেছি তখন সেবকটির বয়স বেশী নয়। কাজেই দু'চার বার তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু, বলিলেই সে ক্রুদ্ধ হয়। শ্রীগুরুদেবের আদেশে কাহাকেও কিছু, বলে না সত্য, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় অন্তরে বেশ ক্রোধ হইয়াছে।

একদিন ফণীদাদা বাগানবাড়ীর সম্মুখের গেটে বসিয়া আছেন। আমি ও আমার এক বন্ধু, তাঁহার কাছেই আছি। এমন সময় সেই সেবকটি একটি ফুলের সাজী হাতে করিয়া মঠে আসিতেছে। ফণীদাদা খুবই রসিকতা করিতে ভালবাসিতেন, তখন তাঁহারও বয়েস বেশী নয়। সেবকটিকে দেখিয়াই ফণীদাদা বলিলেন— "দীনেশ, বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনে শুনেছি 'চলায় নাচন কথায় গান' আজ সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। আহা হা, কি চলনভঙ্গী!"

সেবকটি একবার ফণীদাদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি ফণীদাদাকে বলিলাম—"দাদা! বৈষ্ণবকে অমন ক'রে বললে নিন্দা হয় না? পণ্ডিত মশাইদের মুখে শুনেছি—"মনুষ্যানাং স্বরূপকথনং নিন্দা দেবানাং স্বরূপকথনং স্তুতি।" ফণীদাদা কেবল হুঁ-হুঁ করিয়া আমার কথার কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই বৈকালে দিদি রান্নাবাড়ীর রকে বসিয়া আছেন, এমন সময় ফণীদাদা গিয়া তাঁহাকে বলিলেন— "দিদি! বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী হ'লে কিভাবে তা থেকে উদ্ধার হওয়া যায়? আর অপরাধই বা কি কি ভাবে হয়?'

দিদি—তোমার দিদি কি টোলের পণ্ডিত যে, তোমার কথার উত্তর দিবে? কেন, কি হয়েছে ?

ফণীদাদা—কি জানি কেন সময় সময় রসিকতা করতে গিয়েও অনেক রূঢ় কথা অনেককে ব'লে ফেলি, তাতে কি আমার অপরাধ হয় না ?

দিদি—তা বলা যায় না কিসে কি হয়। তবে যার কাছে অপরাধ হয়েছে মনে হবে অকপটে কাতর প্রাণে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই শান্তি হবে। পরমদয়াল, অদোষদরশী, ভুবনপাবন, উদারচেতা বৈষ্ণবগণ অপরাধ গ্রহণ না করলেও তাঁদের ক্রিয়ামুদ্রা নিয়ে সমালোচনা বা তাতে দোষ দৃষ্টি করলেই অনর্থের চরম হয়, জীব তাতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। অকপট দান

ব্যবহারে কোনরূপে তাঁদের কৃপালাভ করতে পারলেই সকল দুর্দ্দৈব দূর হয়ে অফুরন্ত শান্তিলাভে ধন্য হওয়া যায়।;

ফণী—কৃপালাভ করতে হ'লে যে জাতীয় সাধন দরকার, আমার যে তার কিছুই নেই দিদি। আমার কি হবে ?

দিদি—আরে পাগলা, কৃপা কি সাধন ক'রে পাওয়া যায়। কৃপা যে অহৈতুকী। এমন কোন সাধন নেই, যা কৃপালাভের প্রতিকারণ হতে পারে?

ফণী—তা হ'লে তো সকলকার উপরই কৃপালাভ হতে পারে?

দিদি—হয়ও তো তাই। তবে আধারবিশেষে থাকে বা ক্রিয়ার তারতম্য দৃষ্ট হয়। একটা সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি। মেঘ সর্ব্বত্রই এই বর্ষণ করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে জল দাঁড়ায় না বা বালুকাময় ভূমিতে জলের কোন ক্লিয়া দৃষ্ট হয় না, তা ব'লে কি বলতে চাও সেখানে বর্ষণ হয় নি ?

ফণী—আচ্ছা, কৃপাস্রোত চলবার কি কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ আছে ?

দিদি—না, তাও বলতে পার না। কেন না কৃপা-কৃপাই। ও একেবারে স্বতন্ত্র। কখনও কোন কারণে কারও অধীন নয়। কৃপার প্রতিকারণ কৃপা ছাড়া আর কিছুই বলতে পার না। তবে এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে যে, স্রোত সর্ব্বদাই নিম্নগামী। অভিমান মঞ্চ থেকে একটু না নেমে দাঁড়ালে, একটু না নীচু হ'লে কৃপাশক্তির ক্রিয়া উপলব্ধি হবে না।

ফণীদাদা বোধহয় আরও কিছু, জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু সেই সময় গোবিন্দদাদা আসিয়া ফণীদাদাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দিদি সেখানে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"একেবারে বালক-স্বভাব, ওর যে আজ এ সব প্রশ্ন কেন মনে জাগল বুঝতে পাচ্ছি না।"

মদন—আজ দুপুরবেলা নাটমন্দিরে ব'সে কলকাতার একটি বাবুর সঙ্গে ফণীকাকার খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। শেষে ফণীকাকা বললেন—"আচ্ছা, আমি এ কথা দিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে তোমাকে বলব।" বোধহয় সেই জনাই আজ এ সব কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

দিদি একটু হাসিয়া বলিলেন—"জয় গুরু জয় গুরু! দিদিকে কি তোরা টোলের অধ্যাপক পেয়েছিস নাকি যে, তোদের তর্কের মীমাংসা ক'রে দেবে?'

এইভাবের আলোচনা যখন তখন যার তার সঙ্গে দিদি করিতেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যে এগুলির এত প্রয়োজন হইবে আমরাও ভাবিতে পারি নাই, তিনিও সংগ্রহ করিয়া রাখাকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না বলিয়া সকল সময় সকল কথা লিখিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। হতভাগা দীন লেখকের বাল্যকাল হইতেই একটা অভ্যাস ছিল, কোথাও কোন ভাল কথা বা কোনও দৃষ্টান্তসূচক গল্পাদি

শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা নোট করিয়া রাখা। সেই স্বভাবের বশে যদি ক... কিছু, লিখিতে গিয়াছি, অমনি দিদি বাধা দিয়া বলিতেন, "ও আবার কি ব... আপনাদের কৃপায় অনেক সময় এক কথা দশ কথা হ'য়ে প্রচার ... অভাগিনীকে আর তার ভেতর ফেলবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ তাঁহার মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া নিশ্চয়ই অপরাধী হইতেছি, কিন্তু এই সকল অমূল্য উপদেশ অপ্রকাশিত রাখিতে কিছুতেই মন চাহিতেছে না, তাই শেষ সময় যেখানে যাহা কিছু সংগ্রহ করা ছিল, কোন রকমে পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইবারও অবসর হইল না। এখন পাঠকগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী গ্রহণ করিয়া আমাকে রুপা করুন।

জীবনী লেখা কেন

"কলি ঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম রহু দূর।" বৈষ্ণব কবির এই দুইটি ছত্রে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব সময়ের চিত্রটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধন করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে কতটা সম্ভব তাহা বিজ্ঞজনবিবেচ্য। কবি উপরোক্ত পয়ায়ের পরেই বলিয়াছেন—" অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।'

বিধি অনুকূলে না হইলে ত্রিতাপতাপিত মাদৃশ পাষণ্ড পতিতগণের গতি যে কি হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাবসিদ্ধ মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের আদর্শে নিজ নিজ জীবন চালিত করিবার সুযোগ-সুবিধা দানের জন্যই মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহারা আবির্ভূত হয়েন এবং আচারে ব্যবহারে উপদেশামৃতদানে জীবকে কৃতার্থ করেন। মানবের চিরতৃষিত শুষ্ককণ্ঠে দুর্লভ প্রেমামৃতধারা ঢালিয়া দিয়া অনাদিকালের অশান্ত প্রাণে শান্তিদান করাই হয় তাঁহাদের জীবনের ব্রত।

জাতীয় জীবনের কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য সমস্তই তাঁহারা নিজ নিজ চিন্তা-তরঙ্গের সহিত মিশাইয়া মোহান্ধ জীবসমূহের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই সকল রসিক ভাবসিদ্ধ মহাত্মাগণকে লাভ করিয়াই ভারত চিরকাল গর্ব্বানুভব করিয়া আসিতেছে। আমরাও এই জাতীয় একজন ভাবসিদ্ধ সাধকের দর্শন স্পর্শন লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। ইনি আর কেহ নন, ইনিই আমাদের ললিতা দিদি। এই ললিতা দিদিকে পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেককিছু, সন্ধান জানিতে পারিয়া অনেক ভাগ্যবান কৃতকতার্থ হইয়াছেন। জীবনের সমগ্র ঘটনা প্রকাশের সৌভাগ্য না হইলেও যতটুকু গ্রন্থমধ্যে দিবার

সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতেই আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

শ্রীভগবানের লীলাগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা জীব অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, এইটি সাধারণ নির্দ্দেশ। প্রেমলাভ ভক্তিলাভ ইহার পরের কথা। যাহা হউক, শাস্ত্রের এই নিদেশ শ্রবণ করিয়া জীব অগ্রসর হইতে থাকে, কিন্তু পথিমধ্যে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন পাইয়া অনেক সময় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থার অবসান ঘটাইতেই যেন বিধি ললিতা দিদিকে পাঠাইয়া তাঁহার দ্বারা আচরণ করাইয়া মৌখিক উপদেশ দেওয়াইয়া কখন কখন প্রত্যক্ষ করাইয়া কত শত শত পথহারা পথিককে যে সুপথের সন্ধান দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

যাঁহারা তাঁহার মধুময় সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তাঁহারা তো জানেনেই; যাঁহারা যে কোন কারণেই হউক সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অবগতির জন্যই মহামহীয়ান এই চরিত্র-গাথা বর্ণনের সামান্যমাত্র চেষ্টা করিয়াছি। ধারাবাহিক জীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্যও নয়, আর তাদৃশ মহান কার্য্য মাদৃশ অযোগ্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব নয়।

সখীবেশ ধারণ কি অশাস্ত্রীয়?

দিদির সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার আলোচনা করেন। আমিও এই সম্বন্ধে কিছু জানি না বা বুঝি না, তবুও অনেকে এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি করজোড়ে নিজ অযোগ্যতা জানাইয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়াছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে নিজের মনের মধ্যেও যে এ-জাতীয় প্রশ্ন একেবারে উদয় হয় নাই, এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। একদিনের একটি ঘটনা শুনুন।

একদিন বৈকালে নবদ্বীপ বাগানবাড়ীর স্কুলঘরের পশ্চিমদিগের ঘরে বসিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বরূপ গোস্বামীর সম্মুখে হারমোনিয়াম। মধ্যে মধ্যে গানের সুরটি বাজাইয়া স্বামীজীকে শোনান হইতেছে। আমি কাগজ পেন্সিল লইয়া উহাদের নির্দ্দেশমত লিখিতেছি। হঠাৎ ঘরের বন্ধ দরজা খুলিয়া গেল। স্বামীজী ও বিশ্বরূপ ধূমপান করিতেছিলেন, দরজার দিকে চাহিয়া সংযত হইয়া বসিলেন।

ও সচকিতে চাহিয়া দেখি দরজার সম্মুখে ললিতা দিদি।

অপ্রত্যাশিতভাবে দিদির আগমনে আমরা সকলেই একটু স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশ্বরূপ সেই ভাব ভঙ্গ করিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কি! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আমাদের গুপ্ত-মন্ত্রণাগারে আবির্ভাব কেন?"

এখানে পাঠকগণকে একটু বলিয়া রাখি যে, বিশ্বরূপ দিদির সঙ্গে এইভাবের

রহস্যালাপ প্রায়ই করিতেন। দিদি তাহাতে কোনরূপ বাধা না দিয়া যথাযথ উত্তরদানে বরং তাহার রসপুষ্টির আনুকূল্যই করিতেন।

দিদি—নিভৃতে নির্জ্জনে নিবিষ্টচিত্তে তিন প্রভু একঠাঁই ব'সে ব'সে কিসের পরামর্শ হচ্ছে জানতে ইচ্ছা হয় না কি? তাই একবার এলাম। জীবের মঙ্গলের অনুকূল বিষয় যদি হয় হউক কোন আপত্তি নেই, কিন্তু প্রতিকূল হ'লে দাসীর ঘোর আপত্তি আছে।

বিশ্বরূপ—(রহস্য করিয়া) বর্ত্তমানে বাগানবাড়ীর কর্ত্তৃত্ব হস্তান্তরিত করার পরামর্শই চলছে জেনে রাখ দিদি। তোমার কর্ত্তৃত্ব আর চলবে না।

দিদি—(হাসিতে হাসিতে) আমার উপর কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হ'ল কবে যে, এখন কেড়ে নেওয়া হবে?

বিশ্বরূপ—তুমি স্বেচ্ছায় সখীবেশ ধারণ ক'রে এখানে ব'সে ব'সে ইচ্ছামত কাজ করবে, আর আমরা বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী তা কোন মতেই বরদাস্ত করব না। আজ বলতে হবে তোমরা এভাবে থাকার শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ কি আছে?

স্বামিজী—(বিশ্বরূপকে বাধা দিয়া) আঃ, কি হচ্ছে গোঁসাইজী। (দিদির দিকে চাহিয়া) যাও দিদি, তুমি তোমার কাজে যাও, এ ক্ষ্যাপা গোঁসাই আজ গান ঠিক করতে না পেরে ক্ষেপে গেছে।

দিদি—কি জানি প্রভুদের লীলা-খেলা। আচ্ছা এখন আমি যাই, আপনাদের কাজ আপনারা করুন, সময়ান্তরে দাসীর বিচার হবে।

দিদি একটা দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামিজী বিশ্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি কাণ্ড! না জানি কি জরুরী কথা বলতে দিদি এসেছিলেন আর তুমি তাকে এমনি ক'রে তাড়িয়ে দিলে?"

বিশ্বরূপ—এখন আমাদের যে কাজ হচ্ছে এর কাছে দুনিয়ার কোন কিছুই বেশী জরুরী নয়। নিন, আপনি পদটা ঠিকমত সুরে ফেলুন দেখি, তারপর ও সব শোনা যাবে।

পুনরায় গানের আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটু অবসর বুঝিয়া আমি বলিলাম— 'চরিতসুধা'য় বর্ণিত আছে বড় বাবাজী মহাশয় এই সখীবেশ ধারণ সম্বন্ধে নানা প্রকারের সমালোচনা শ্রবণ ক'রে তাঁর শ্রীগুরুদেবকে নাকি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আমি এদের কাছে রাখব, না তাড়িয়ে দেব?' উত্তরে তিনি অনেক কিছু ব'লে শেষে বলেছিলেন—'নিতাইচাঁদের সংসারে কাকেও অবজ্ঞা ক'র না। তুমি সকলকে আদর যত্ন করতে পার, কিন্তু বিদায় করবার অধিকার তোমার নেই।' বেশধারণ সম্বন্ধে বললেন— 'গোস্বামিপাদগণের শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম বিশেষ প্রণিধান ক'রে দেখলে বুঝতে পারা

যাবে যে, ভাবকে স্থায়ী করতে হ'লে স্বভাবে পরিণত করা প্রয়োজন। আবার স্বভাবে পরিণত হ'লে দেহে তদ্‌জাতীয় বেশভূযাদি ধারণ করা, বাক্যে তদ্‌জাতীয় আলাপ ব্যবহার ও লীলাগুণাদি কীর্ত্তন করা, মনে তদ্‌ভাবাঢ্য নিত্য পরিকরগণের আনুগত্যে লীলাদি স্মরণ, মনন, নির্দিধ্যাসনাদি আচরণ করা বিশেষ আবশ্যক। যদি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় কখনও কারও সেরূপ সৌভাগ্য ঘটে, তবে তাঁকে আদর্শস্থানীয় মনে করবে।"

বড়বাবাজী মহাশয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পুত্র বিমলাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 'চরিতসুধা' ৫ম খণ্ড হইতে পাঠ করিয়া আমি বিশ্বরূপকে শুনাইলাম। স্বামী সচ্চিদানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'চরিসুধা'য় আছে—

"বিমলা—আচ্ছা, শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বেশের কিছু আবশ্যকতা দেখাইতে পারেন নি? অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্বমহাজনগণ কেহ ঐরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন দেখাইতে পারেন কি?

বাবাজী—বাবা! আমি শাস্ত্রসিদ্ধন্তাদি কিছুই জানি না, তবে সাধারণ যুক্তি অনুসারে দেখিতেছি যে, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। একে একে দুই-চারিটি আপনাকে দেখাইতেছি।

যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক ও সাধনের সহায়। এইরূপ সন্ন্যাসীর ত্রিপুণ্ড্র গৈরিক বসন, দণ্ডীর ত্রিদণ্ড, শৈবের রুদ্রাক্ষ, বিভূতি ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বৈষ্ণবগণের তিলক, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ শাস্ত্রসম্মত নহে কি? সধবা রমণীর শঙ্খ সিন্দুর স্বামীর স্মারক বা উদ্দীপক অথবা অস্তিত্বে পরিচায়ক নয় কি? আপনি যে সখীভাবের কথা বলিতেছেন, এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব? 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মাধ্যমের অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদটি আলোচনা করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর।।
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার।।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।।
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি।।
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।।

অন্যত্র—

সেই গোপীভাবামৃতে লোভ হয়। বেদধর্ম্ম ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয়।।
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন। সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

স্থানান্তরে—
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার।।
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাঙ্গ্রি সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।। ইত্যাদি।

আবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—
"সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্। আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎরূপালঙ্কার- ভূষিতাম্।।"

সনৎকুমার তন্ত্রে—
"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।।

ইত্যাদি বহু বহু স্থানে সখীভাব স্থায়ী করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা ভাবনা করিবার কথা বলিয়াছেন। আবার—
"সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।"

ইত্যাদি বাক্যে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের টীকা—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতা-ভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন।" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগিদেহেন। তদ্ভাবঃ স্বপ্রেষ্ঠকৃষ্ণ-বিষয়কঃ স্বসমীহিত কৃষ্ণজনাশ্রয়কশ্চ যো ভাব উজ্জ্বলাখ্যস্তং লব্ধমিচ্ছতাসেবামনসৈবোপস্থাপিতৈঃ সাক্ষাদপ্যুপস্থাপিতৈশ্চ সমুচিতদ্রব্যাদিভিঃ পরিচর্য্যা কার্য্যা। অত্র প্রকারমাহ—ব্রজলোকানুসারতঃ সাধক-রূপেণানুগম্যমানা যে ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপগোস্বাম্যাদয়ো যে চ সিদ্ধরূপেণানুগম্যমানা ব্রজলোকাঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদয়স্তদনুসারতঃ।।" ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের বাক্যের সহিত ইঁহাদের আচরণের কোনওরূপ বৈপরীত্য দেখা যায় কি?

বিমলা-বৈপরীত্যের মধ্যে এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, অন্তর্নিশ্চিত ভাবযোগ্য দেহকে বাহিরে প্রকাশ করা।

বাবাজী—কেন? এরূপ যোগ্যদেহ তো অনেকেই ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের আবেশে তো যোগ্য বেশভূষা ধারণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীয় পরিকরগণ প্রায় সকলেই সখ্যভাবাবিষ্ট হইয়া গোপবেশ ধারণ করিতেন। দাস গদাধর রাধিকার ভাবাবেশে গোপীবেশ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত নানা লীলাদি আচরণ করিয়াছিলেন। অভিরাম ঠাকুর সখ্যভাবাবেশে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। আবার লোচনানন্দ দাস ঠাকুর, খণ্ডবাসী নরহরিঠাকুর প্রভৃতি কখনও নদীয়া-নাগরীবেশে, গৌরের সহিত মিলন করিলেন, আবার কখনও বা ব্রজগোপীর বেশে কক্ষে গাগরী লইয়া দধিদুগ্ধবিক্রয়ীরভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আচ্ছা, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রে কোথাও ভাবযোগ্য বেশভূষা বাহিরে ধারণ

করিবার নিষেধ করিয়াছেন পাওয়া যায় নি? বা ভাবটি স্বভাবে পরিণত করিবার চেষ্টা করাটাকে কেহ অসঙ্গত মনে করিয়াছেন কি?

ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্ব আলোচনার পর বিমলাবাবু চলিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ও নিজ কৃত্যকৃত্যাদি করিতে গমন করিলেন।"

এই পর্য্যন্ত পাঠের পর স্বামীজী বলিলেন—"খুঁজো! আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক, আমরাও এখন নিজ নিজ কার্য্যে যাই চল। গোসাঞিজী কি বলেন—"

বিশ্বরূপ—হুঁ, সবই তো বড়বাবাজী মশাই ব'লে গেছেন, মাঝখান থেকে সখীজীকে দুটো কথা ব'লে অপরাধী হলুম আমি।

স্বামীজী—আচ্ছা, সন্ধ্যের পর দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে দুখানা গান শুনিয়ে অপরাধ ক্ষালন ক'রে নেওয়া যাবে। জয় গৌরহরি। উঠে পড়।

শুধু মুখের কথায় হয় না, নির্ভরতা চাই

প্রেমিকের স্বভাব বা আচরণ এবং কার্য্যকলাপ সাধারণ বিচারের মাপকাঠিতে পরিমাণ করিতে গেলে ভুল করা হইবে। নিজ নিজ গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যিনি আপন জীবনকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি গৃহস্থই হউন অথবা উদাসীনই হউন সর্ব্বথা জগৎপূজ্য। তাঁহার সঙ্গপ্রভাবে অতি কলুষিতচিত্ত পাষণ্ডও ধন্য হইয়া যায়।

প্রাণে প্রকৃত ভাবের সঞ্চার হইয়া যে ভাবের প্রকোষ্ঠে সাধককে প্রবেশ করায়, অকপটে তাহা স্থায়ী করিবার চেষ্টা করা উচিত। কোনরূপ কপটতা থাকিলে সমধিক অনিষ্ট হয়। অপরের দেখাদেখি কোন আচরণ করা উচিত নয়। মনপ্রাণকে সর্ব্বদা অবরোধের মধ্যে রাখিতে না পারিলে ভাব নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

বড়বাবাজী মহাশয় বলিতেন—"শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাবের বিকাশ হইয়াছে, সর্ব্বদা সেই ভাবকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্চারী নানারূপ ভাবের বশতাপন্ন হইলে ভাবনিষ্ঠ বা রসনিষ্ঠা থাকে না, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।"

ভক্তগণের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে দিদি একদিন বলিতেছেন—"শুধু মুখে বললে হবে না ভাই, মুখে বললে হবে না; কাজে দেখানো চাই। অনেকে আছেন অপরের দুঃখে মুখে একটু সহানুভূতি দেখিয়েই মনে করেন যথেষ্ট করলাম। ভাই! তাতে কি দুঃখীর দুঃখ যায়? একজন না খেতে পেয়ে ম'রে যাচ্ছে আর তুমি চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় দিয়ে উদর পূর্ত্তি ক'রে আরাম-কেদারায় শুয়ে পান চিবুতে চিবুতে দু-একবার 'আহা' 'উহু' ক'রে মনে করলে অনশনক্লিষ্টের জন্য

কতই না করলাম! এতে কি কিছু করা হ'ল? সত্যি সত্যিই যদি ক্ষুধিতের জন্য তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে, তাহ'লে কখনই তুমি নিশ্চিন্ত মনে ভাল ভাল ভোজ্যদ্রব্য মুখে তুলতে পারবে না। দুঃখীর দুঃখ অনুভব করতে প্রাণ যখন তখনই তুমি কোনদিকে না চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্মহারা ভাবে তাদের মধ্যে।"

"সক্ষম হৃদয়বাণ ব্যক্তি নিজে চুপ ক'রে থেকে অপরকে কিছু করবার জন্য প্রথমেই অনুরোধ করেন না। সর্ব্বাগ্রে নিজের যতটুকু সামর্থ্য ততটুকু ক'রে প্রয়োজন হ'লে শেষে অপরের উপর ভার দিয়ে থাকেন। আর একটা কথা—ত্যাগে অভ্যস্ত না হ'লে কৃপার মর্য্যাদা বুঝা যায় না। আজ আমি একটা বিপদে প'ড়ে তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানালাম, তিনি বিপদ হ'তে আমাকে উদ্ধার করলেন। এইটাকেই যদি ভগবৎকৃপার পরাকাষ্ঠা মনে করি, তাহ'লে মস্ত বড় ভুল করা হবে। এমন সময়ও আসতে পারে যখন প্রার্থনা ক'রেও বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পেলাম না, তখন কি আমার মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে না? ভাই! রাগ ক'র না, যথার্থ যে ভক্ত হবে সে সুখে দুঃখে সমানভাবেই তাঁর কৃপা অনুভব ক'রে ধন্য হবে। শ্রীগুরুদেব বলতেন তাঁর কৃপা দুই রকমে আসে—'এক রকম অনুকূলে, আর এক রকম প্রতিকূলে।' এক এক সময় আকস্মিক এমন বিপদ এসে উপস্থিত হয় যে, ধৈর্য্য ধ'রে তা সহ্য করা অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত নির্ভরশীল ভক্ত ধৈর্য্য হারায় না। সে বলে, এও আমার প্রভুর দান।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ" গীতার এই বাণীর যথার্থ ভক্তেই দেখতে পাওয়া যায়। বিপদের উপর বিপদ; সারা জীবনে একটুও বিপদ-বাত্যার বিরাম হ'ল না, তথাপি ভক্ত অনুমাত্র বিলচিত বা তাঁর করুণায় কোনরূপ সন্ধিহান হলেন না।"

ললিতাদিদিকে আমরা দেখিয়াছি সর্ব্বদাই হাসি মুখে বলিতেন—"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, তাঁর যা ইচ্ছে হবে তিনি করবেন, আমার তাতে বলবার বা আপত্তি করবার কি আছে? আমি তো তাঁর হাতের পুতুল, তিনি যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব।"

নিজ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জনৈক ভক্ত দিদির নিকট আসিয়া নিজের অবস্থা জানাইয়া দিদিকে বলিলেন—"দিদি! জীবনে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করব এ তো স্বপ্নেও ভাবি নি। জন্মজন্মান্তরের না জানি কত দুষ্কৃতিই আমার আছে! তাঁরনাম নিয়ে প'ড়ে আছি, তিনি কি মুখ তুলে চাইবেন না।"

দিদি—ভাই! তুমি কেন তাঁর উপর দোষ চাপাচ্ছ? সাধুদের মুখে শুনেছি, যার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তার জন্মজন্মান্তরের সকল কর্ম্ম দগ্ধ হ'য়ে যায়। যদি তাইই হয়, তবে তার কর্ম্মানুরূপ ফল আসবে কোথা হ'তে।

আর ভগবান দুঃখ দিচ্ছেন এ সন্দেহ তোমার মনে হওয়া উচিত হয়। কারণ, প্রয়োজন ব্যতীত কেউ কিছু করে না, তোমাকে দুঃখ দেওয়ার মধ্যে ভগবানের কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় কি? তবে যে ভক্তের কাছে দুঃখের প্রকাশ ওটা ভক্তেরই কল্যাণের জন্য জানবে।

আলো এবং অন্ধকার দুটি না থাকলে যেমন দর্শনকার্য্য চলে না, সেইরূপ সুখ ও দুঃখ এই দুইটির ভিতর দিকে তাঁকে অনুভব করতে না পারলে পরিপূর্ণরূপে তাঁর দর্শন সার্থক হয় না। তিনি যেমন আনন্দস্বরূপ, তেমনিই তিনি "ভীষণং ভীষণানাং।" কাজেই সুখস্বরূপও যেমন তিনি, দুঃখের মূর্ত্তিটিও যে তাঁর, এটি না বুঝলে চলবে কেন?

ভক্তের দুঃখেও বিদ্বেষ নেই, সুখেও অত্যধিক লোলুপতা নেই। ভক্ত প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারে যে, সুখ দুঃখ দুটি শ্রীভগবানেরই দুটি হাত, তাই কোনটিকেই সে বাদ দিতে পারে না। ভক্ত ভগবানকে ডেকেছে বা এখনও ডাকছে, তা ব'লে যারা ডাকে নি বা ডাকছে না তাদের সঙ্গে সুখদুঃখভোগের কোন তফাৎ হবে মনে ক'র না। তবে অন্যে দুঃখে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়ে, আর ভক্ত ধৈর্য্য হারায় না, এইটিই ভক্তের বিশেষত্ব।

ভক্ত—এটি কেমন ক'রে হয় দিদি?

দিদি—এটি ভক্তের আরাধ্য দেবের শ্রীচরণসেবার ফল জানবে। ভগবান ভক্তকে যে মধুরাদপি মধুর ভক্তিরসের আস্বাদ দিয়েছেন, তাতেই সে বিভোর থাকে, অন্য কিছুতেই তার মন যায় না।

ভক্তটি দিদির এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দিদি! আর হাহুতাশ করব না। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' এই মহাজন-বাক্য বুকে ধ'রে নাম করতে থাকি।" এই বলিয়া বিদায় লইলেন।

তাঁর সুখই প্রার্থনীয়

দিদি মধ্যে মধ্যে মঠের ছেলেদের শাসন করিয়া বলিতেন—"যাঁর মুখ চেয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছ তাঁর কিসে সুখ হয় দেখবে না?" বড়বাবাজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"উনি হলেন মঠের মালিক, আমরা সকলেই ওঁর সেবক-সেবিকা। আমাদের উচিত কিসে মালিকের সুখ হয়, কিসে উনি আনন্দ পান, সর্ব্বদা তার চেষ্টা করা।"

ভক্ত ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা করেন নি না। এই প্রশ্নের উত্তরে দিদি একদিন বলিয়াছিলেন— "প্রার্থনা করবে না কেন? তবে ভক্ত তোমার আমার মত টাকাকড়ি ঘরবাড়ী বিষয়ভোগ সুখ চায় না। প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা

করিয়াছিলেন—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেম্বচলা ভক্তিরচ্যুতেহস্তু সদা ত্বয়ি।।

আমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, যেন তোমাকে আমার অচলা বিশ্বাস ভক্তি থাকে। ভক্ত বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে না। কেউ যদি বলেও তথাপি ভক্ত বলে 'আমার প্রতিটি মুহূর্ত্তের অবস্থিতির জন্য তিনি কত রকমে যত্ন নিচ্ছেন, আমি কোন প্রতি দান তার দিতে পারি না।' এই কথা স্মরণ হ'লেই আমি লজ্জিত হই, আবার 'এ দাও ও দাও' ব'লে প্রার্থনা করব কোন্ মুখে? ভাবুক কবি রজনীকান্ত সেন কি সুন্দর কথা বলেছেন—

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।।
আমি না ডাকিতে তুমি হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।।
চির আদয়ের বিনিময়ে সখা চির অনাদর পেয়েছ।
আমি দূরে চ'লে যেতে দু'হাত পসারি ধ'রে কোলে টেনে নিয়েছ।।
'ও-পথে যেও না ফিরে এস' ব'লে কানে কানে কতই বলেছ।
আমি তবু চ'লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।।
এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ।
আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে ক'রে তুমি রয়েছ।।"

যখনই দিদির কাছে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তখনই তিনি এইভাবের সহজ সরল উত্তর দিয়া তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। আবার কেহ যদি কোন শাস্ত্রর্থ জানিতে বা ভজনরাজ্যের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তদুপযোগী বাগ্মিতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছেন। শ্রীমৎ গৌরগোপাল গোস্বামী (গুরুগৌরবানন্দ স্বামী) মহাশয়, হরিবোলকুটীরের শ্রীমৎ হরিদাস বাবাজী প্রভৃতি বহু মনীষী দিদির নিকট হইতে অনেক দুরুহ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন। এ কথা তাঁহারা অকপটে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। হরিদাস বাবাজী মহাশয় তো অনেক গ্রন্থের টীকা-ব্যাখ্যা দিদির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই বলিয়া থাকেন।

—০—

[দিদির জীবনীর সহিত প্রকাশের জন্য বাবাজী মহাশয়ের কৃপাপ্রাপ্ত দুইজন ভক্ত (নাম প্রকাশে অনিচ্ছক) দুইটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। আমরা উহা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত করিলাম।]

অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্

চিরানুসৃত নীতির ব্যতিক্রম কদাচিৎ ও কুত্রচিৎ দৃষ্ট এবং সেই ব্যতিক্রমের মধ্যেই অসাধারণত্ব পরিস্ফুট ও তৎপ্রতি সাধারণের বিস্মিতদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পঙ্কে পদার্পণপূর্ব্বক পদপ্রক্ষালন অপেক্ষা দূরাপসরণই নীতিসম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা (প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্)। অতএব দূরাপসরণের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছায় পঙ্কে পদার্পণ জনসাধারণের বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া স্বাভাবিক।

তাদৃশ নীতি-ব্যতিক্রম দীন লেখকের ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে একবারও সহানুভূতিগম্য হয় নাই। যে শুভক্ষণে সেই ব্যতিক্রম অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইল, তাহাই বর্ত্তমান নিবন্ধের মূলসূত্র। মহানুভব পাঠকবর্গের নিকট বিনম্র অনুনয়—তাঁহারা স্বীয় অদোষদর্শিতা গুণে অজ্ঞ লেখকের অযোগ্য লেখনীর দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসান। ভার্সাই সন্ধির আলোচনা চলিতেছে। ইং ১৯১৮ খৃঃ বৈশাখের এক অপরাহ্নে ঊনত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক একটি যুবক শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ রাধারমণবাগের (সমাজবাড়ী) সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে বৃদ্ধা জননী পাগলিনীবেশে দণ্ডায়মানা। যুবকের পরিধানে ছিন্ন-মলিন চীরবসন, রুক্ষকেশ শীর্ণদেহ। জননীর অবস্থা ততোধিক করুণোদ্দীপক।

কিয়ৎকাল সোপানশ্রেণীর নিম্নে অবস্থানপূর্ব্বক যুবক ভয়বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে বাটীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিল। ফটক অতিক্রম করিলেই দক্ষিণে নাটমন্দির ও বামে পুষ্পোদ্যান। প্রথম দৃষ্টিপাতেই যুবকের ভয় ও বিস্ময় ঘনীভূত হইল। নিশ্চয়ই কোন জমিদার বা ধনী লোকের বাড়ী! কিন্তু দারোয়ান বা লোকজন দেখ যায় না কেন ? বলা বাহুল্য ইতঃপূর্ব্বে যুবকের শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। গ্রীষ্মকালে পাঁচটার পূর্ব্বে কোন ঠাকুরবাড়ীতে যে লোক-সমাগম হয় না—এরূপ অভিজ্ঞতা লাভও তাহার ভাগ্যে এই প্রথম।

নাটমন্দিরের পূর্ব্বপার্শস্থ অলিন্দে উপবিষ্ট জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবকের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই বিস্ময়বিহ্বল ভাবে অগ্রসর হইয়া উহার হস্তধারণপূর্ব্বক নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইলেন এবং সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার তদবস্থা প্রাপ্তির কারণ অবগত হইলেন। বলা বাহুলা চারি বৎসর পূর্ব্বে উভয়ে কলিকাতাস্থ কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

ইং ১৯১৪ সালে আগস্ট মাসের প্রারম্ভে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশের যোগদানের পর অল্পদিনের মধ্যেই জার্ম্মান সাবমেরিন আটলান্টিক তোলপাড় করিয়া ভূমধ্য ও লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া জনরব উঠিল এবং বঙ্গোপসাগরে

এমডেনের উৎপাত ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সেই অবস্থায় যুবক "যঃ পলায়তে স জীবতি" এই মহাজনানুমোদিত নীতির অনুসরণ করিল। শিক্ষকতা উপলক্ষে পূর্ণ চারি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে যাপনপূর্ব্বক যুদ্ধাবসানের পরই প্রত্যাগত, কিন্তু যুদ্ধ-সংক্রান্ত সম্ভাব্য বিপদাশঙ্কা অবগত হইলেও দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপর্য্যস্ত। যুবকের দুইটি কনিষ্ঠ সহোদর এক মাসের মধ্যেই ইহলীলা সংবরণ করার জননী পাগলিনীপ্রায় এবং নিজের অবস্থাও মর্ম্মন্তুদ। গ্রীষ্মাবকাশে হিতৈষী বন্ধু স্বজনগণের পরামর্শে জননীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাদানের জন্য শ্রীধামে আগমন। প্রথমেই শ্রীবাস অঙ্গন ঘাটে অবতরণ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ সমাজবাড়ীর সিংহদ্বারে উপস্থিত।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটি 'চরিতসুধা'র পাঠকবর্গে'র সুপরিচিত। নাম—(অধুনা নিত্যধামগত) শ্রীযুক্ত অপরা প্রসাদ পাল বি. এ.। তাঁহার অমায়িক সহৃদয়তা ও আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ উদার ব্যবহারে কয়েকদিনের মধ্যেই যুবক ও তাহার জননীর দুঃসহ হৃদয়যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে একদিন তিনি কৃপা করিয়া যুবককে সখীমার শ্রীচরণ দর্শন করাইলেন। চরণস্পর্শের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তিনি স্বীয় অদোষদর্শিতা ও পরমৌদার্য্যগুণে যুবককে সে সৌভাগ্যলাভে কৃতার্থ করিলেন এবং স্বীয় চরণতলে আশ্রয় প্রদানপূর্বক যুবকের ও তাহার জননীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের তাঁর যন্ত্রণা কারুণ্যামৃতনিষেকে প্রশমিত করিলেন।

কয়েকদিন পরে একদিন অপরাবাবু যুবকটিকে তাহার দীক্ষা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক জানাইল যে, যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে একটি ব্রাহ্ম-পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকার্য্যে ও কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টার পরিবারে তিনটি বালিকার গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকায় এবং ব্রাহ্মমন্দিরে গমন, উপাসনায় যোগদান, ব্রাহ্মসংসর্গহেতু ব্রাহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সে মন্ত্রদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নাই। এরূপ আকস্মিক আঘাত না পাইলে গ্রীষ্মাবকাশের পরই তাহার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভ্রাতৃবিয়োগের পর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক গোস্বামী প্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সান্ত্বনাপ্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন—

"যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার।
তখনে না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধু,
মিছামাত্র বহি দেহভার।।"

* * *

গোস্বামী প্রভুর বচনামৃতপানে যুবকের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। বিশেষতঃ প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাহার সন্দিগ্ধ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

তং শ্রীমং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্।।

বিষ্ণুশর্ম্মার মতে তথাকথিত নিকৃষ্ট জীবটির ছয়টি গুণের (জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ) মধ্যে একটি সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। প্রত্যুত প্রভুভক্তিগুণে উক্ত জীবটির শ্রেষ্ঠতাই বহুলাংশে প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং সে স্বীয় উদ্ধার বিষয়ে সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। এমন সময় শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনগণের সদুপদেশে শ্রীধাম দর্শন।

অপরাবাবু নিবিষ্টচিত্তে যুবকের মর্ম্মবেদনার কাহিনী শ্রবণ করিলেন এবং যথোচিত সান্ত্বনা প্রদান- পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন মহোৎসব উপলক্ষ্যে হুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নবগোপাল দে মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন। সেইখানেই অযাচিতকৃপাকারী অদোষদর্শী শ্রীগুরুদেব তাহাকে নিজগুণে শ্রীচরণের দাসানুদাস করিয়া লইলেন। তিন দিন পরে অপরাবাবু, কার্য্যস্থলে গমন করিলেন এবং যুবকটি শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় সখীমার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতীত হইল। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রে হতভাগ্য যুবকটি বিষম বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইল। এশিয়াটিক কলেরা—মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা। পরদিন অপরাহ্ন পর্য্যন্ত যুঝিয়া যুবকের প্রাণবায়ু শূন্যে মিশিয়া গেল। দেহযষ্ঠি নিস্পন্দ—অসাড়। এ পর্য্যন্ত সখী-মা যুবকের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও লেখকের পঞ্জর নিষ্পেষিত হইয়া যায়। তাহার বর্ণনায় লেখক আত্মসংবরণে অসমর্থ করুণ আর্ত্তনাদে তাহার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পাঠক পাঠিকাগণ, ক্ষমা করুন।

মুমূর্ষু অবস্থায় একবার যুবকটি সখীমার চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের বুকে হাত বুলাইল। সখীমা কারুণ্যরসপ্লাবনে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারবিমূঢ়ভাবে 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলিতে বলিতে রাতুল চরণ দইটি অস্পৃশ্য যুবকটির অশুচি বুকে তুলিয়া দিলেন। কারুণ্যামৃতনিষিক্ত ঔদার্য্য মাধুর্য্যরসের একাধারে আস্বাদন অনুভবী পাঠক-পাঠিকাগণের প্রাণস্পর্শী অনুভূতিসাপেক্ষ। লেখনীমুখে ভাবাদ্বারা তাহার পরিবেশনপ্রয়াস ঔদ্ধত্য বা ধৃষ্টতার নামান্তরমাত্র।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই হতভাগ্য যুবকের আয়ুসূর্য্য অস্তমিত—দেহযষ্টি নিস্পন্দ। সৎকারের পরিকল্পনা ও সাময়িক আয়োজন যথারীতি ধীরগম্ভীরভাবে চলিতে

লাগিল। সখীমা যুবকের শিয়রে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। তিনি যেন আজ এ জগতে নাই। হঠাৎ উঠিয়া গ্রহাবিষ্টবৎ ছুটিয়া শ্রীগুরুদেবের সমাধিমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক, তর্জ্জনসহকারে আবদার করিতে লাগিলেন—"দেখ, তোমার ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরসেবা, সবই প'ড়ে থাকবে। আমি তো স্বতন্ত্ররী আছিই—যে দিকে প্রাণ চায় চ'লে যাব। অকালে যমের কবলে ঠেলে দেবার জনাই কি অপগন্ডগুলোকে ধ'রে আনা তোমার কাজ? ভাল, তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাক। আমি তোমার কে? কেন তুমি আমার কথা শুনবে? আমি তোমার কোন্ কথাটা শুনেছি ? তবে তুমিই বা শুনবে কেন ? ......ইত্যাদি।"

তর্জ্জনমিশ্রিত আবদার। কোন্ রাজ্যের কথা? যাঁহার অনুভূতি আছে, তাঁহারই প্রাণ আন্দোলিত বিচলিত করিবে। নির্ম্মম লেখক কিন্তু অবিচলিত। পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ। সারমেয় কেমন করিয়া অমৃতের স্বাদ বুঝিবে?

পরমগুরুদের বড়বাবাজী মহারাজের শুভ জন্মোৎসব দিবস। অনুষ্ঠানের আয়োজন যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু এই শুভানুষ্ঠানের প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় যাঁহার প্রাণভরা প্রীতির অভিব্যক্তি পরিস্ফুট, শ্রীগুরু-সর্ব্বস্ব সেই সখীমার আজ তাঁর ঔদাসীন্য দর্শনে আশ্রমবাসীগণ ও উৎসব-দর্শনার্থীরা স্তব্ধ, নিরুৎসাহ, নিরানন্দ ও বিস্ময়বিহ্বল। কাহারও মুখে হাসি নাই—প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি কথাও কাহারও মুখে নাই। এহেন আনন্দের দিনে আশ্রমের রেণু-পরমাণুটি পর্য্যন্ত যেন নিবিড় নিরুৎসাহতার করাল ছায়াপাতে বীভৎসরূপ ধারণ করিয়াছে।

দিবাবসান। সান্ধ্য অন্ধকার আশ্রমের বিষাদান্ধকার নিবিড়তর করিয়া তুলিল। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর হইতে এ পর্য্যপ্ত সখীমা এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই নগণ্য যুবকটির সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই—এমন কি শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী ক্রিয়াগুলিও অন্তর্হিত। যুবকের জন্য এ পর্য্যন্ত যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা লিখিতে লেখকের অশুচি করস্পর্শে কলুষিত লেখনী সংস্কুচিত—কুণ্ঠিত। হায়! জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায়ও লেখকের মর্ম্মবেদনা প্রশমিত হইবে না। দীনাধম লেখক দীনেশের শ্রীচরণ শিরে ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা চায়। ঔদার্য্য ও অদোষদর্শিতার তার বহু নিদর্শন ও প্রমাণ আপনারা পাঠ ও শ্রবণ করিয়াছেন, লেখকও সে বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলেও নিত্যন্ত অজ্ঞ নয়। কিন্তু আজ সে প্রত্যক্ষভাবে যাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিল, প্রাকৃতজগতে তাহার তুলনা নাই—যাহার তুলনা তাহারই ঠাঁই।

মধ্যে মধ্যে এক-একটি সেবক আসিয়া অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু সখীমা ঔদাসীন্যপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছেন।

ক্ষণে ক্ষণে 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ এ পর্যন্ত তাঁহার মুখে শোনা যায় নাই।

ক্ষণকাল পরে সমাধিমন্দির হইতে বাহির হইয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে পুনরায় ছুটিয়া চলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী জনতার প্রতি দৃক্‌পাত নাই, আনুষ্ঠানিক আয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, উদ্ধর্দৃষ্টি, ওষ্ঠাধরের ঈষৎ স্পন্দন দ্বারা অনুমেয় অশ্রুত অস্পষ্ট স্বরে যেন কি বলিতেছেন। পুনরায় যথাস্থানে অর্থাৎ যুবকের শিয়রে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার তৎকালীন অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য প্রত্যক্ষদর্শী ও অনুভবী ভাবকে প্রাণে প্রাণে উপভোগ করুন। সে মাধুর্য্য পরিবেশনে অধম লেখকের অযোগ্য লেখনী মূক-মৌনী।

নীরব নিথর! প্রকৃতিদেবীও যেন আজ মৌনগাম্ভীর্য্যে আত্মহারা! মধ্যে মধ্যে মৃদুমন্দস্বরে 'জয় গুরু', 'জয় গুরু শব্দমাত্র সখীমার শ্রীমুখে উচ্চারিত ও শ্রুতিগোচর হইতেছে। অনুমান অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে যুবকের বক্ষে ঈষৎ স্পন্দন ও নাসিকায় শ্বাসবায়ুর সঞ্চার অনভূত হইল। পাঠকপাঠিকাগণ! দীনাতিদীন লেখক অবনতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। যাঁহার স্মরণে হৃদ্‌গ্রন্থি শতধাবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অবোধ লেখক কেমন করিয়া সেই কল্পনাতীত, ধারণাতীত, স্বপ্নাতীত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবে! কিভাবে মতৃদেহে জীবনসঞ্চার হইল, তাহা সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সঞ্চারকই জানেন।

যাঁহার পূতচরণস্পর্শে ধরিত্রীদেবীর বসুন্ধরা নাম অন্বর্থ, তাঁহার সুমধুর মাহাত্ম্যসুধা পরিবেশনস্পর্দ্ধী, ধরিত্রীর সর্ব্বংসহা নামের সার্থকতাসাধক যে নিকৃষ্ট যুবকটির করুণ কাহিনী অপরিহার্য্যরূপে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় "অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্" নীতির অনুসরণ করিতে হইল, সেই জঘন্য ঘৃণা জীবটি আকারে দ্বিপদ, কিন্তু আচারে চতুষ্পদবৎ অদ্যাপিও জীবজগতে বিচরণশীল; স্বতন্ত্রতাদোষে দোর্দ্দণ্ড কলির প্রচন্ড নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত-মর্ম্মগ্রন্থি, ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ, দুর্দ্দৈবকবলিত সেই জীবটির কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট, করুণাময় শ্রীগুরুদেবের 'মা ভৈঃ' বাণী স্বর্দুন্দুভিরবের ন্যায় অদ্যাপিও তাহার হৃদয়ে আশার শিহরণ জাগাইয়া দেয়।

ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও কারুণ্যের সেই মূর্ত্তপ্রতীক আজ প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও শান্তিসুধা বর্ষণে জীবরে পাপতাপ হরণ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত 'জয় গুরু' শব্দটি আমাদের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলুক। জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু!!

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতস্য
কস্যচিৎ

শ্রীগুরুস্বরূপ*

"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসূত হরি।
ভূবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি।।"
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।।"
"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।"

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে "শ্রীগুরুস্বরূপ" নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। তথাপি আমাদের প্রাণে শ্রীগুরুদের সম্বন্ধে অনন্ত সন্দেহ জাগে। সে সন্দেহ নিরসন মানসে কতজন নিতান্ত বিপন্নের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। কোথাও শুনিতে পান শ্রীগুরু, সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন। শ্রীভগবান আবার নিজ শ্রীমুখে নির্দ্দেশ দিয়াছেন "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং"—আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরু রূপে আমাকেই জানিবে। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"—প্রাকৃত বুদ্ধিতে কখন অবমাননা করিবে না। সন্দেহ তথাপি থাকিয়াই যাইতেছে। কি সে সন্দেহ ? সে সন্দেহ এই যে, শ্রীগুরুদেবকে যখনই শ্রীকৃষ্ণসেবার সম্ভার সজ্জিত করিয়া আরাধনা করিতে যাই, তখনই তাঁহার প্রসন্নতা লাভের পরিবর্তে অপ্রসন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে বড়ই দুঃখের উদ্ভব হয়। সেবা অর্থে সুখী করা। ঋষিবাক্যে এবং শ্রীভগবত্মুখের বাণী অনুসারে সেবা করিতে যাইয়া দেখি—সুখী হওয়া তো দূরের কথা, দারুণ দুঃখে তাঁহার হৃদয়খানি ভরিয়া উঠে। দুশ্চিন্তিত হইয়া ভাবি কি অন্যায় করিতেছি। শাস্ত্রবাক্য তো আমার শ্রীগুরুদেবের অবিদিত নহে। তবে কেন তদুচিত আচরণ করিতে যাইলে আমার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন? অযাচিত করুণার অভিসিঞ্চনে প্রাণে জাগে—ওঃ, অন্যায় তো বটেই, সমস্ত শাস্ত্রযুক্তিতে তিনি সাক্ষাৎ হরি বটে কিন্তু আরও কিছু, বিশেষত্ব আছে, তাহা হইতেছে—"প্রভোর্যঃ প্রিয়ঃ" মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর গুরুবরং" "ন তু মুকুন্দত্বে", ইহা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে নিষেধ হইতেছে। প্রভুর প্রিয়তম শ্রীগুরুমূর্ত্তি। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীগুরুস্বরূপ যদিও শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, তথাপি শ্রীগুরুস্বরূপে এমন অধিক কিছু আছে, যে কারণে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ অপেক্ষা শ্রীগুরুরূপে প্রিয়তা অধিকতর। সেই কারণটি এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

---

* যদিও লেখক খোলাখুলি ভাবে ললিতাদিদির নাম লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু দিদির উপদেশ ও মনোভাব লেখার মধ্যে পরিস্ফুটভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীগুরু শব্দের স্বাভাবিক অর্থ—কোন সময়ে কখনও তিনি লঘু নহেন। যদি কখন গুরু এবং কখন লঘু হয়েন, তাহা হইলে স্বরূপের নিত্যত্ব বিদ্যমান থাকে না। কিন্তু তিনি নিত্য বিদ্যমান। অতএব কখনও লঘু নহেন। লঘু নহেন— অর্থে গুরু ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপের নিবারক। শ্রীকৃষ্ণনাম যেমন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপের নির্দ্দেশিক নহেন, শ্রীগুরুনামও তেমনি শ্রীগুরুমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিনির্দ্দেশে আপত্তিকারী। হয়তো আমাদের ধারণা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীগুরুস্বরূপ তখন ইহাতে এমন কি গোলযোগের আশঙ্কা। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা কত বড় একটি মহৎ ভুল, তাহা নির্ণয় করা যাইবে।

প্রথমতঃ গুরুসেবা করা শ্রীগুরুপদাশ্রিত জনের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দেশে তাঁহার সেবা করিতে যাইলে প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। দেবতার সন্তোষলাভের জন্য তাঁহার পূজো, সন্তোষলাভ না হইলে সহজেই বুঝা উচিত যে, দেবতার উপযুক্ত পদ্ধতিতে পূজা হইতেছে না। সুতরাং প্রসন্নতা লাভ হইবে কিরূপে? তবে ত্রুটি কোন্‌খানে সেটা দেখা প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের আচরণ লক্ষ্য করিতে গেলে দেখা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অসীম রসমাধুরী আস্বাদনে নিরন্তর বিভোর। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপনার নাম, রূপ, গুণও লীলামাধুরী আস্বাদনলাভে যখন লোভী হইয়া উঠেন, সেই মহামাধুর্য্যময় স্বরূপই শ্রীগুরুনামে অভিহিত হন। শ্রীগুরুস্বরূপ রসস্বরূপকে অশেষ বিশেষে আস্বাদন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আস্বাদন করাইতেও সামর্থ্যবান। পরিপূর্ণ আস্বাদনেও আবার অভাব জাগে, সে অভাব পূর্ত্তির আশার বিতরণ বা আস্বাদন করানো।

"রসরত্নখনি তবু কাঙ্গাল রসের" এই অবস্থারই কথা। একদিন শ্রীবাবাজী মহাশয় (শ্রীপাদ রামদাস) শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সূচক কীর্ত্তনকালে বলিলেন— "নৈলে ভোগ পূর্ণ হয় না, না বিলালে জনা জনা।"

এখন একটি কথা আসিয়া পড়ে—শ্রীকৃষ্ণ নিজের অখিল-রসামৃতাস্বাদে আহ্লাদিত শ্রীরাধারস্বরূপ দেখিয়া যখন বুঝিলেন যে, বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছারহিত হইয়াও আমা অপেক্ষা শ্রীরাধা কোটীগুণ সুখী, তখন তাঁহার প্রাণে ক্ষোভের উদয় হইল। ক্ষোভ কেন? সুখভোগ ইচ্ছা কৃষ্ণের যেমন অসীম, ভোগের উপাদানও তেমনি অনন্ত,—ক্ষুধা যত, খাদ্যও তদুপযুক্ত। কিন্তু শ্রীরাধা যে-জাতীয় ক্ষুধার্ত্ত এবং যে-জাতীয় খাদ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেন—কৃষ্ণের তাহা একান্ত অভাব। যে সুখসম্পদে শ্রীরাধা সমৃদ্ধশালিনী, কৃষ্ণ তাহার একান্ত কাঙাল। শ্রীরাধার সম্পদে লুব্ধ-মানস শ্রীকৃষ্ণ কত চেষ্টাই করিলেন কিন্তু কোন প্রকারে

না পারিয়া অবশেষে বেদের প্রতিপাদ্য সর্বশক্তি-সমন্বিত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগতের একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—''ন পারয়েহহম্।'' শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি কাহাকেও গুরুত্বের আসন প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুত্ব অবিচারে সিদ্ধ। কারণ, সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই সকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারিত ও স্বীকৃত। সকলের বলিতে শুধু জীবগণ কর্তৃক বুঝিলে চলিবে না—ব্রহ্মা শিবাদি কর্ত্তৃকও নির্ধারিত এবং স্বীকৃত। ''শিববিরিঞ্চিনূতেম্।'

''কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' শ্রেষ্ঠ দেবতা বা পরদেবতা শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্বের আসন প্রদান করিলেন শ্রীরাধা ঠাকুরাণীকে। তাই তিনি পরাঠাকুরাণী, তাই না তিনি গরবিণী। ইহা অপেক্ষা গৌরবের আর অধিক কি হইতে পারে? শ্রীরাধার নিকট সুখভোগের কৌশল শিক্ষা করিবার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে গুরু স্বীকার করিয়া বলিলেন—

'রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।।''

তাহা হইলে মূল গুরুতত্ত্ব শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। কিন্তু আমরা যে মহাজনের বাক্যে শ্রবণ করি—শ্রীগুরুতত্ত্ব নিত্যানন্দস্বরূপ? অতএব পূর্ব্ববাক্যের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা হয়? তদুত্তরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সকল সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—

''নিতাই, রাধার সমান কৃষ্ণে করে মান
সতত থাকয়ে সঙ্গে।
নিশিদিশি নাই ফিরয়ে সদাই
কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে।।
বসি বামপাশে মৃদু মৃদু হাসে
প্রাণনাথ বলি ডাকে।
রাধার যেমন মনের বাসনা
তেমতি করিয়া থাকে।।''

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ এবং শ্রীরাধা ঠাকুরাণী মহাজনের বাক্যে অভিন্ন। অতএব শ্রীনিত্যানন্দ রাধা অভিন্নতায় গুরুতত্ত্বের মূলস্বরূপ। শ্রীগুরুলীলা সকল লীলার (ব্রজ এবং নদীয়া) আশ্রয় শ্রীগুরুস্বরূপ আচ্ছাদন-সুখে বিহার না করিলে লীলা রক্ষা হয় কি প্রকারে? আর লীলার নিত্যত্ব অনুযায়ী শ্রীগুরুস্বরূপও ত্রিকাল সত্য এবং নিত্য বলিয়া। স্বীকৃত।

অতএব শ্রীগুরুস্বরূপ আস্বাদনে বিভোর শ্রীকৃষ্ণরূপ। সর্ব্বেশ্বর প্রভু হইয়াও

একান্ত দাস-অভিমানে দীনহীন। সর্ব্বশক্তির আকর হইয়াও কেমন মুখাপেক্ষী। গৌরবের সকল সম্ভার সত্ত্বেও কেমন কাঙ্গাল—"তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত।" তাই দেখা যায় মাধুর্য্যের আস্বাদনশূন্য কিংবা বিন্দুমাত্রও বাধক এবং গৌরবের গন্ধে পূর্ণ কিংবা কিঞ্চিতমাত্রও স্পৃষ্ট, আরতি, সেবা, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি যাহাই কেন হউক না—তাঁহার প্রীতির কারণ না হইয়া অপ্রীতির কারণই হয়—যাহার যাহা খাদ্য, তাহা না পাইলে তৃপ্ত হয় না, আর তৃপ্তি না হইলে সন্তোষের জন্মই হয় না।

আর এক কথা, শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্যের এককণা উপভোগ করিবারও সাধ্য জীবের ক্ষমতায় কুলায় না। জীবের আধার এমন নাই যে, কৃষ্ণবিষয়ক কোন সম্পর্কে'র স্পর্শ সে করিতে পারে। শ্রীমুখে একদিন বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বড় বড় কথা ক'স্ নি। আমি যদি বেশ্যার কাঁধে হাত দিয়া চলি কেউ আমাকে গ্রহণ করতে পারে?" বাস্তবিকই দুর্ব্বল জীব আমরা, আমাদের কতটুকুই বা সামর্থ্য! শ্রীগুরুরূপে যদি কৃষ্ণস্বভাবের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরুনিষ্ঠা রক্ষা হওয়া একান্ত অসম্ভব। সেই কারণে নিজ ঐশ্বর্য্য সকল আচ্ছাদন করিয়া, জৈবস্বভাবে গ্রহণের অনুরূপ স্বভাব গ্রহণ করিয়া জীবজগতে অতি সাধারণ একজন জীবেরই মত বিচরণ করেন, ইহাই তাঁহার পরম করুণার নিদর্শন অথবা সর্বাধিক ঐশ্বর্য্য। নিজ শক্তিসমূহ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করা যে মহাশক্তিমত্তার প্রয়োজন, তাহাতেও গুরুতত্ত্বের গৌরব যে কতখানি তাহা অনুভবসাপেক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য নিজ বুদ্ধি এবং বিচারশক্তিতে ব্রহ্মা অনুভব করিতে পারেন নাই। পরীক্ষা করিতে গিয়া যে বিড়ম্বনায় পড়িয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে গো-বৎস-হরণ-লীলার সুস্পষ্ট। সেই কৃষ্ণেরও আবার শ্রীগুরুস্বরূপে দীনতামণ্ডিত লালসাযুত বিহার কত যে রহস্যাবৃত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এ সমস্ত বিষয় ভাবিতে হইলে সতত এই কথাই মনে জাগে যে, তাঁহার করুণাই তাঁহাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়।

দুর্গত কলিহত জীবসমূহকে নিজ আস্বাদ্য বা ভোগ্য সুখসম্ভারে সমৃদ্ধ করিতে যে শক্তি, যাহা কৃষ্ণের নাই—নাই বলিয়াই যে স্বরূপের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে স্বরূপ এত প্রিয় হইয়াছে। কারণ, কৃষ্ণের ইহা একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা যে, তাঁহার ভোগ্য সুখ জীবনিশ্চয় ভোগ করুক। তাহাতে তাঁহার মহাসুখে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে নিতাইকে বলিলেন, "আমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর, নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব ভর।" এত সাধে যে স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মধুর লীলা করিয়া জীবের সম্মুখে বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য পূজোপহার

প্রদানই প্রকৃত সেবা। যাহা কামনা করিতেছেন তদনুকূল ব্যবহার করাই কি প্রকৃত সুখ দেওয়া নয়? যদি সে শক্তি আমাদের না থাকে, তাহা হইলে কাতরে তাঁহার শ্রীচরণে কাঁদিয়া প্রার্থনা করিব অযোগ্যতার দুঃখে; কিন্তু আমি যোগ্য সেবা করিতেছি বলিয়া যদি অভিমানে মত্ত হই কিংবা আমার যোগাতার সংবাদ কাহাকেও দিতে যাই, তাহা কি প্রকৃত সেবকের ধর্ম্ম হইবে ? যত সহজে আমরা গ্রহণ করিতে পারি তিনি এমনই হইয়া আসিলেন, আর আমি যদি দূরে ঠেলিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাকে যথার্থ পূজো বলিতে চাই, তাহাতে কেন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন? মধুর দেবতার মধুর উৎসবে বিরুদ্ধ রসের স্পর্শ কেন করাইব?

শ্রীগুরুস্বরূপ স্বমাধুর্য্যে এমন উজ্জ্বল যে, ঐশ্বর্য্যের বা আড়ম্বরের বিন্দুমাত্র স্পর্শও সে স্বরূপকে মলিন করিয়া দেয়। অনাড়ম্বরই যাঁহার অমূল্য ভূষণ, তাহাতে সজ্জিত দেখিয়া সুখী হইতে পারি না, সুখী হইতে চাহি না। নানা ঐশ্বর্য্যে সাজাইতে সাধ হয় যে কেন? কি জানি। চিরহাস্য মধুরোজ্জ্বল স্বরূপকে বিষাদে মলিন করি। একবার ভাবিয়া দেখি না যে, শ্রীগুরুসুখ এবং আত্মসুখে কত পার্থক্য? আমার সুখ যাহাতে হইবে তাহার নাম গুরুসেবা হইবে কি? শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দিলেই মনে হয় আমারই কাম-প্রকৃতি যখন স্থূলভাবে প্রকাশ ছিল, তখন তাহাকে চেনা যাইতেছিল। এখন চতুরতা করিয়া এমন আত্মগোপন করিয়া ইস্ট হইয়াছে যে আর ধরা কঠিন। কাহার নয়নপথে না পড়িলেও একজন যিনি আমার একমাত্র হিতকারী, আমাকে অধিক দান করিয়া ধনী করিতে সদাই যাঁহার অভিলাষ, সেই পরম করুণার খনি ব্যথাভরা প্রাণে পূজা গ্রহণ করেন—আমার ব্যথা লাগিবে গ্রহণ না করিলে তাই; কিন্তু রুষ্ট হইয়া জানাইয়াও দেন যে, ইহা তাঁহার পূজো হইতেছে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই অবস্থারও তিনি আমাকে পালন করিতেছেন আমার সুখের সহায় হইয়া, কিন্তু আমার সেবায় নিজে সুখী হইয়া নহে।

"আত্মসুখ ইচ্ছা যাতে তারে বলি কাম।" আর ইহার বিপরীত, অর্থাৎ আত্মসুখরহিত অবস্থা প্রেম। আমার চিত্তকে কলুষিত করে যে কামনা, যাহা জগতে আমাকে কত প্রকারে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা করিতেছে, শ্রীগুরুদেব এমনই করুণাময় যে সেই কলুষতাও নিজে গ্রহণ করিয়া আমাকে আতরচন্দন ও গৌরবমাল্যে ভূষিত করিতেছেন। লোকে আদর করে। এই জন্য যে, আমি গুরুসেবক! হায় কামনা-তোমার এত কুহক। আর হা করুণাময় তোমার এত স্নেহ শ্রীগুরুসেবার নামে আত্মসেবা করিয়া জগতে কত লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করি; কিন্তু একবার চাহিয়া দেখিতেছি না—যাঁহার জন্য আমার আত্মগৌরব, তিনি আমার নিকট কিসের প্রত্যাশী।

প্রকৃত পথের সন্ধান না পাইয়া আমরা অন্ধের ন্যায় হইয়া পড়ি। শ্রীগুরুদেবের আচরণ সকল শুদ্ধভক্তি পথে চলিবার পরম সহায় বা অবলম্বন। তাহা গ্রহণ না করিলে তাঁরপথে চলা যাইবে না—লাভ পূজো প্রতিষ্ঠার দাস হইয়া দুঃখসাগরে ডুবিতে হইবে।

তিনি তাঁহার আচার্য্যকে যেভাবে সুখী করিয়াছেন তাহাই একমাত্র নির্ম্মল পথ, তদ্ভিন্ন আর যত কিছুই যুক্তিজাল শাস্ত্রসাহায্যে বিস্তার করিতে যাইব, ততই প্রকৃত পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইব। শাস্ত্র এমন রহস্যময় যে, তাহা সকল মতের পোষণ করিতে সাহায্য করে, কিন্তু প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া একেবারে সহজ নহে বলিয়া "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" বলা হইয়াছে। যে গুহার নিহিত, তাহা শ্রীগুরুস্বরূপের আচরণসমূহে। সে আচরণসমূহ স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিতে না পারিলে আলোকের সন্ধান পাওয়া বা প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আমার আত্মগৌরব আমাকে অন্ধ করিয়া দেয়, অভিমানে সব ভুলাইয়া দেয়, প্রকৃত পথ দেখিতে দেয় না। প্রকৃত পথ দেখিতে পাইলে, সে পথে চলিবার আনন্দ এমন লোভনীয় যে, আর অন্য কিছু, হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। সুবিমল পথের সন্ধান পাইতে না চাহিয়া কেবল যে অন্ধকারে ঘুরিয়া দুঃখ পাইব, ইহাতে সেই করুণাময় ব্যথা পাইতে থাকেন। তাঁহার করুণ স্বরূপের প্রতি আমার যথার্থ আচরণ তাঁহার যত প্রয়োজন, আমার প্রয়োজন তদপেক্ষা বহুগুণে বেশী। তাঁহাকে যথার্থ পূজা করিবে এমন ব্যক্তির অভাব নাই; আমার পূজা না পাইলে তিনি অভাবগ্রস্ত হইবে না, কিন্তু আমার জন্য তাঁহার এত প্রকার ব্যবহার, এত মধুর স্বভাবে বিহার!

আমি চাহি ঐশ্বর্য্য, অনাড়ম্বর আমার বুকে পূর্ণ আনন্দ দিতে পারে না। শ্রীগুরুস্বরূপে ঐশ্বর্য্যের বেশভূষা আচরণ করিলে তিনি যে কত দুঃখ পান তাহা কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন। সে কৃপা আমাকে সূক্ষ্মভাবে প্রতিক্ষণে জানাইতেছে যে, এই পথে আমারই দুর্ব্বলতা বা অযোগ্যতা প্রকাশ পাইতেছে। আমার শ্রীগুরুস্বরূপকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইতে যাই—আমার মনোবৃত্তির অনুরোধে, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাতে নহে। 'আমার শ্রীগুরু এত বড় মহান্ ব্যক্তি' এই কথা বলিতে এবং বলাইতে গৌরব বোধ করি, ইহাই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয় বা কাম্য কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকিবে সেই শ্রীমুখের প্রসন্নতার আর সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে নিজ হৃদয়ের প্রতি। সুখে ও আনন্দে বুক যে ভরিয়া উঠে, তাহা সাবধানে দেখিতে হইবে। সেবকের নিজের প্রতি দৃষ্টি একেবারেই থাকিবে না, সেব্যের সুখদুঃখই নিজ সুখদঃখ হইবে। কই, এ অবস্থা কি আমাদের হয়?

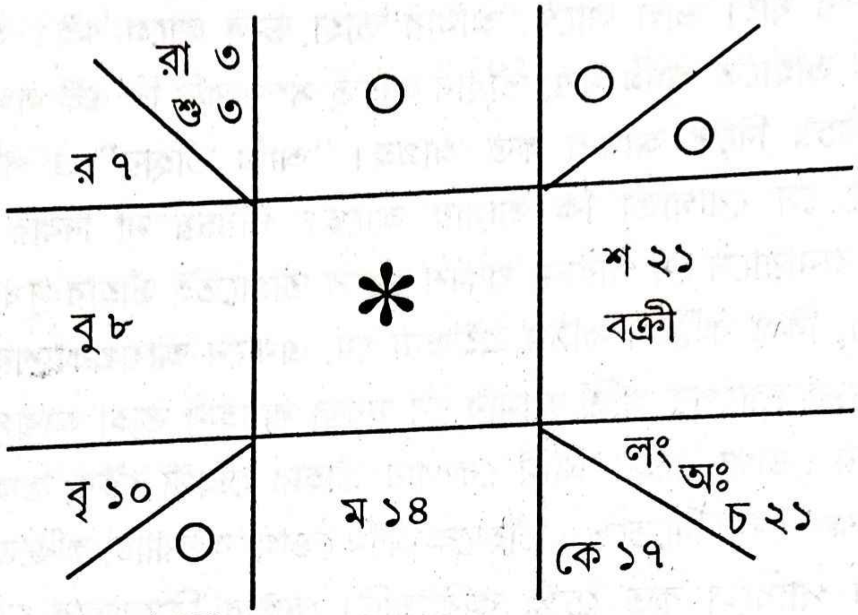
শ্রীগুরুদেবের যাহা ভাল লাগে, আমার তাহা ভাল লাগে কই? আমার যাহা ভাল লাগে তাহাতে আমি মত্ত, তাঁহার সহিত সম্পর্কের কি এই লক্ষণ ? অথচ তাঁহার পরিচয় দিতে আমার কত আগ্রহ। "আমি তাঁহার" এ পরিচয় আমি কেন দিব? সে যোগ্যতা কি আমার আছে? পরিচয় না দিবার শত চেষ্টা থাকিলেও অনায়াসে যে পরিচয় প্রকাশ হইবে তাহাতেই তাঁহার সুখ। এই পথই নির্ম্মল পথ, কিন্তু কঠিন। কঠিন এইজন্য যে, এখানে আত্মপ্রকাশের গন্ধ নাই। আমার শ্রীগুরুস্বরূপের প্রতি আমার যে সকল ব্যবহার তাহা আত্মসুখপূর্ণ, ইহা কিন্তু তাঁহার ভোগ্য নহে। আমি কোথায় তাঁহার ভোগ্য হইব, তাহা না হইয়া বিপরীত লক্ষণ দেখা দিতেছে—তাঁহাকে আমি ভোগ্য করিয়াছি, করিতে চাহিতেছি। করিতে না পারিলে কত চেষ্টা করিতেছি। চেষ্টার বিফলতার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যাই। তারপর বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশের পর যাহা হইবার তাহা হয়। কিন্তু সে করণে-দৃষ্টি বিনাশ হইতে দেয় না, জীবিত রাখিয়াই রোগের উপশম করেন, ইহাই তাঁহার অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য। একবার বলিয়াছিলেন—"কোন সভা-সমিতিতে তোমরা কেউ যাও, এ আমার ভাল লাগে না।" শুনিয়া মনে হইয়াছিল এ কথা কেন বলিলেন? কিন্তু আজিকার এই ঘোর অন্ধকারে সে কথার গুরুত্ব বেশ প্রকাশ পাইতেছে। একটু আনন্দের আশায় কোথাও ছুটিয়া যাই কিন্তু পরিবর্ত্তে বুকভরা দুঃখ লইয়া ফিরিয়া আসি। তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলি—ওগো, হাত ধর, অন্ধকারে পথহারা আমি, কিছু, যে আর দেখিতে পাইতেছি না। অন্ধকার—কেবলই অন্ধকার—কেবলই অন্ধকার, হাত ছাড়িও না, ধর—ধর। জয় শ্রীগুরু।

শ্রীগুরুসেবাভিখারী কাঙ্গাল

জন্ম-পত্রিকা

আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বির্বদ পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোপালকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া সংক্ষেপে যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার অবিকল নকল পাঠকগণের গোচরার্থে মুদ্রিত করিলাম।

জন্ম—বঙ্গাব্দ।। ১২৮০।। সাল ২৭শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা। শকাব্দ ১৭৯৫।২।২৬।২৯।১১।।



জাতহঃ

দিবা ৩৩।২১
৫।২০।২৭
১৫।২১।৫০
১৭।৬।৫৩
৪৪।১।২৭

পরাহঃ

৬।২১।১
১৬।১৮।৪৩
১২।৮।৫৮
৪৮।৩।২৮
বিং রবি ভোগ্য ৫।৩।৩৫

লগ্ন হইতে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান বিদ্যা জ্ঞানলাভ প্রভৃতি অনুমিত হয়। বন্ধুস্থানাধিপতি নবমে মিত্রক্ষেত্রে থাকায় রাজযোগের যোগী বন্ধু হইবে আর ঐ বন্ধুস্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি থাকায় বহু সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎলাভ এবং বহু কঠোর তপস্বী সাধুসঙ্গ যোগ আছে। লগ্নে চন্দ্র বৃহস্পতি দ্বারা পূর্ণদৃষ্টি এবং সুখস্থানে শনির পূর্ণদৃষ্টি হেতু গরীব দুঃখী প্রতিপালন, সন্ন্যাসী ফকিরের সেবা ও অতিথিসৎকারে বিশেষ মনোযোগী হইবার লক্ষণ সূচিত হইতেছে। আর নিজ অলৌকিক প্রতিভাগুণে অতি অল্পকাল মধ্যেই জাতক একজন মহাপণ্ডিত ও পরম ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জগতে পরিচিত হইবে।

জাতকের লগ্নে চন্দ্র থাকিয়া বৃহস্পতিদ্বারা পূর্ণদৃষ্টি পাইয়াছে এবং মঙ্গল দৃষ্ট শনি চতুর্থ স্থানে দৃষ্টি করার ফলে, জাতকে গৃহী হইয়া আসক্তিশূন্য বৈরাগ্যভাবের যোগ ঘটাইয়াছে। জাতক কর্ম্মপ্রিয় হইবে এবং কাজের ঝোঁকে কাজ করিয়া যাইবে, ফলপ্রাপ্তির দিকে দৃষ্টি থাকিবে না। গুরুদেবের কৃপায় কোনও স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধিলাভ করতঃ এক অভিনব ভাব প্রকাশের সুযোগ লাভ করিবে। এবং নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা আপামর সাধারণের মনকে সহজেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। সপ্তম স্থান পত্নীবোধক। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ রবির অবস্থান হেতু এবং পত্নীকারক শুক্র শত্রুভাবস্থ হওয়ার

ফলে চিরকুমার যোগ সূচিত হইতেছে

জাতকের ব্যয়াধীশ গ্রহ মঙ্গল একাদশ স্থানে বর্ত্তমান আর ঐ ব্যয়স্থান রাহু ও শুক্রের পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়াছে এবং বৃহস্পতির ত্রিপাপদৃষ্টির ফলে একজন প্রসিদ্ধ দানবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ যোগ পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণ যথা—"ব্যয়েশে তদ্রিপ্ফগতে তত্র দৃষ্টে শুভৈর্গ্রহেঃ। দানবীরো ভবেন্নিত্যং সাধুকর্ম্মসু মানবঃ।।"

সূর্য্য হইতে দ্বিতীয় দ্বাদশে গ্রহ থাকায় এবং অন্যান্য গ্রহের অবস্থান দেখা যায়, তাহাতে জাতকের সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন অনিবার্য্য। কিন্তু সন্ন্যাসী হইলেও বহু ভৃত্যের অধিপতি, ধনবান, বন্ধুবৎস এবং রাজতুল্য সম্মানের অধিকারী হইবার লক্ষণ বিশেষ ভাবেই দেখা যাইতেছে। প্রমাণ যথা—"সূর্য্যাদুভচরো বহুভৃত্যধনো বন্ধুনামাশ্রয়ঃ নৃপপূজ্যো ভূনক্তি ভোগানুর্ভর্চ্চ্যম্।"

পত্নীস্থানাধীশ বুধ অষ্টমে এবং শুক্র রাহুযুক্ত মঙ্গল দৃষ্ট হওয়ার জীবনে পত্নীসুখে বঞ্চিত এবং ব্যয়পতি মঙ্গল পুত্রস্থানকে দৃষ্টি দেওয়ায় পুত্রসুখে বঞ্চিত যোগ দেখা যায়, কিন্তু উক্ত পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকায় বহুজনকে পুত্রবৎ পালন যোগ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রে ইহাকে পালকপুত্র যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ত্রিকোণে মিত্রক্ষেত্রস্থ কেন্দ্রাধিপতি গুরু জাতকে বেদান্ত-বেদবিদ্ করিয়া থাকে। প্রমাণ ব্যথা—"বেদান্তপরিশীলঃ স্যাৎ কেন্দ্রকোণে গুরৌ যদি।"

ইহার এই যোগ বিশেষভাবে ঘটিয়াছে, কাজেই জাতক যে এককালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লগ্নে চন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতির দৃষ্টি হেতু জাতক কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, শুদ্ধাচারী, দাতা ও বহুজনপোষক, নৃপপূজ্য, সদাসুখী, দেবদ্বিজ আরাধনাতৎপর এবং ধনী হয়। প্রমাণ যথা—"কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী। দেবদ্বিজারাধনতৎপরো ধনী ভবেন্নরো দেবগুরৌ তনুস্থে।।"

জাতকের এই সকল যোগগুলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলাম।

রবিভোগ্য —	৫।৩।৫
চন্দ্র দশা —	১০।০।০
	১৫।৩।৫
মঙ্গল দশা—	৭।০।০
	২২।৩।৫
রাহুর দশা—	১৮।০।০
	৪০।৩।৫
বৃহস্পতির দশা—	১৬।০।০
	৫৬।৩।৫

শনির দশা— ১৯।০।০
৭৫।৩।৫

মঙ্গলের দশার শেষ হইতে পিতৃবিয়োগ, দেশত্যাগ, সদ্‌গুরু সঙ্গ লাভ, নানা দেশ ভ্রমণ এবং প্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ যোগ লক্ষিত হয়। স্থূল দশা শনি, ইহার সহিত বৃহস্পতি অন্তর্দ্দশায় জাতকের জীবনহানি যোগ দেখা যায়। ৭০ হইতে ৭২ বৎসরের মধ্যে রাহু অন্তর্দ্দশায় থাকিবে। এই সময় জাতক কোনরূপ গুহ্যব্যধিতে আক্রান্ত হইতে পারে। অলমিতি।

স্বাক্ষর—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

বংশতালিকা

প্রাচীনদের নিকট শুনিয়াছি আমরা ফেরধরার (ফেদরা) কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তীর সন্তান। তাহার পূর্ব্বের কিছু পাই নাই, তাই এই চক্রবর্ত্তী মহাশয় হইতেই তালিকা দিলাম।

কৃষ্ণদেব চক্রবর্ত্তী
|
রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী
|
রামদাস চক্রবর্ত্তী
|
রামগঙ্গা চক্রবর্ত্তী
(এই সময় হইতে ভট্টাচার্য্য পদবী লেখা হয়)
|
গোপীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
(রামগঙ্গা নিঃসন্তান হেতু ভ্রাতা কালীচরণের পুত্র গোপীকৃষ্ণকে পোষ্য গ্রহণ করেন)
|
কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
(পত্নী গৌরসুন্দরী দেবী)
|
জগদ্বন্ধু, সর্ব্বমঙ্গলা, দীনবন্ধু, গোপালকৃষ্ণ, পুত্র (২৬ দিনে মৃত্যু), চন্দ্রকলা, শশীকলা, দীনেশ।

সমাপ্ত